মা·দা·র



পার্ল·বাক্

মাদার

প্রথম সংস্করণ

অক্টোবর—১৯৫৩

প্রকাশক :

সুনীল দাশগুপ্ত
নব ভারতী
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :

শ্রীসুখলাল চ্যাটার্জি
লোক-সেবক প্রেস
৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা-১৪

প্রচ্ছদভূষণ : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ভারত প্রেস
২২।১।এ ডিকসন লেন,
কলিকাতা-১৪

দাম—তিন টাকা

পার্ল বাক্

অন্দর

অনুবাদঃ হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

কলিকাতা-১২

নব ভারতী

ভূমিকা

আজকের দিনে পার্ল বাক্ বাংলা দেশে একটি সুপরিচিত নাম। ইদানীং কালে কোনো দেশের কোনো মহিলা সাহিত্যিক এতখানি খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা-লাভ করেন নি। ওয়েস্ট্ ভার্জিনিয়ার মিশনারী ঘরের মেয়ে হলেও বাকের বাল্যজীবন কেটেছে ইয়াংসী নদীর ধারে সিনকিয়াং শহরে। নিঃসঙ্গ বাল্য-জীবনে কাছে ছিলেন চীনা নার্স, তাই মাতৃভাষায় কথা বলার আগেই পার্ল বাক্ চীনা ভাষা আয়ত্ত করলেন। উত্তরকালে সাহিত্য সাধনা করলেন বটে মাতৃভাষায়—কিন্তু বিষয়বস্তু চৈনিক। সেই বুড়ী নার্সের কাছে বাল্যে শুনতেন কত উপকথা আর উপাখ্যান, চীন দেশের যা নিজস্ব সম্পদ। বাপের কাছে শুনতেন দেশ-বিদেশের কথা আর মার কাছে শিখতেন সঙ্গীত। সতের বছর বয়সে তাঁর প্রথম সাহিত্য কর্ম প্রকাশিত হয় লিণ্ডবার্গের র‍্যান্ডলফ্-মেকন্ মেয়েদের কলেজের পত্রিকায়—তাতে কয়েকবার ছোট গল্পের প্রাইজটাও তিনিই পেয়ে যান।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আবার চীনে ফিরে এলেন পার্ল, তার তিন বছর পরে আমেরিকার মিশনারী যুবক জন বাকের সঙ্গে পার্লের বিবাহ হল। উত্তর চীনে স্বামী-স্ত্রী বসবাস করতে এলেন। মহামারী আর মন্বন্তর, দুর্গত মানুষের দুর্গতি, চুরি, ডাকাতি, দস্যু আক্রমণ সব কিছুই অতি কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেলেন পার্ল বাক্। ১৯২০তে পৃথিবীর সর্বত্র একটা অর্থ-নৈতিক চাপে সমাজ-জীবনের বাঁধা ধরা রাস্তায় ভাঙন লাগলো। পৃথিবীর সর্বত্র তখন বাণিজ্যিক ব্যবস্থা অচল হতে বসেছে,—চীনা কৃষক ওয়াংলাঙ্ মাটির মানুষ, মাটির টান তার কাছে অনেক বেশী। তার স্ত্রী পারিপার্শ্বিক

ঘূর্ণিপাকে বিজড়িত অথচ বিচলিত নয়—অবশেষে ওয়াংলাঙের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে—এই কাহিনী নিয়ে চীনের পটভূমিকায় রচিত পার্ল বাকের 'গুড আর্থ' এ যুগের একখানি সর্বশ্রেষ্ঠ বই। পলিট্জার প্রাইজ পায় বইটি ১৯৩২-এ, পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হল। এর পর আটখানি চীনা কাহিনী ভরা উপন্যাস রচনা করেন মিস্ পার্ল বাক্।

চীনা ও চৈনিক সমাজ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের গভীরতার প্রমাণ "সুই-হু-জুয়ান" (সবাই ভাই) নামক চৈনিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অনূদিত সংস্করণ পার্ল বাকের প্রতিষ্ঠা আরো বাড়িয়ে তুললো।

তাঁরই লেখনী-নিঃসৃত বিখ্যাত গ্রন্থ "মাদার"—অনুবাদ করেছেন হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত। দেশে দেশে সর্বকালে, শয়ন শিয়রে জেগে বসে আছেন জননী, অভয়া, অচলা। তাঁর স্নেহের স্পর্শ থেকে কেউ বঞ্চিত নয়, সকলের জন্যই করুণা, আর কোমলতায় ভরে আছে তাঁর মন। এই জননীর ছবি আমরা সকলেই জানি। গোর্কী লিখেছেন রুশজীবনের পটভূমিকায় "মাদার", সেলমা লাগেরলাফ, গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা এঁরাও লিখেছেন। বিষয়বস্তু এক, পটভূমি বিভিন্ন। কারণ মা যে সর্বত্রই সেই এক, অমৃতহাসিনী মধুর ভাষিনী।

চীনা কৃষকের ঘরে যে একদিন পুত্রবধূরূপে এসেছিল, সেই রমণীর জায়া থেকে জননীতে রূপান্তর, তারপর একদিন আসে যে দিন দেখা যায় কখন পাশ থেকে সরে গেছেন বুড়ি শাশুড়ী, তাঁর সেই শূণ্য আসনটি অধিকার করে বসেছেন বিগতকালের পুত্রবধূ। আবার আসে নতুন বৌ। নতুন বেশে, নতুন রূপে, যে ছিল বধূ তারও একদিন পরিণতি জননীত্বে। বৃদ্ধা রমণী নব-জাতককে সানন্দে কোলে তুলে নেয়।

মোটামুটি এই কাহিনী। কিন্তু এর ভিতর আছে নাটকীয় সংঘাত, স্বামী সুখের সন্ধানে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, সংসারের দায়িত্ব পড়ল তরুণী মার ওপর। অভাব আর অনটনের মধ্যে এলো প্রলোভন। মা জয় করতে পারলো না সেই প্রলোভন, তারপর সারা জীবন ধরে সাময়িক সেই পদস্খলনের তথাকথিত পাপের ভার বহন করে চলে। ছোট মেয়েটি অন্ধ হয়ে গেল, এই অন্ধ মেয়েটির কথাগুলির মধ্যে নিবিড় ব্যথা ও বেদনা মিশিয়ে দিয়েছেন পার্ল বাক্। তারপর যে দুঃখকর পরিস্থিতির মধ্যে মেয়েটির মৃত্যু ঘটে—মনে হয় যেন বাংলা দেশের

বুকেই ঘটনাটি ঘটছে।

মার দুঃখময় জীবনে দুঃখের শেষ নেই। ছোট ছেলেটি কি ডাকাতের দলে মিশল—কোথা যায়, কি করে? শোনা যায় বই পড়ে। লেখাপড়া শিখল কবে! সবাই অবাক হয়ে যায়। তারপর একদিন ছেলে আর ফিরল না, সংবাদ পাওয়া গেল নতুন ডাকাত কম্যুনিষ্টদের সংগে সে ধরা পড়েছে, তার ফাঁসি হবে। ফাঁসির মঞ্চে মার জন্য চঞ্চল হয়েছিল কি ছেলেটির মন? কিন্তু সেই মেয়েটি বলে উঠল—"কমরেড, আমাদের কেউ নেই, বাপ মা কেউ নেই। এগিয়ে চলো।"

বধ্যভূমিতে এক সংগে অনেক মূল্যবান প্রাণের বলিদান দেওয়া হ'ল।

অসহায় জননী স্বচক্ষে দেখলো অত্যাচারী শাসকের এই নির্মমতা! রাগে, দুঃখে, শোকে সে কি উন্মাদ হয়ে যাবে?

তার স্বামী নিরুদ্দেশ, নিরীহ অন্ধ মেয়েটির অপঘাতে মৃত্যু হ'ল, আর প্রিয়তম সন্তানের মাথা ভাড়াটিয়া ঘাতকের স্পর্শে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। জননীর দুঃখ রাত্রি কি প্রভাত হবে না?

পার্ল বাক অতি চমৎকার ভাবে কাহিনীটি শেষ করেছেন। তিনি দিয়েছেন একটা অপূর্ব ইঙ্গিত।

এই দুঃখ, এই মৃত্যুর পিছনে আছে একটা আশ্বাস, নব-জীবনের একটা ইঙ্গিত—নতুন দিনের আলোয় পূর্বাচল উদ্ভাসিত।

বড়ছেলে দৌড়ে এসে মাকে বলল—"মা তোমার নাতি হয়েছে।"

শোকতপ্ত জননীর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। আবার নতুন করে বাঁচতে হবে।

সাধারণ অনাড়ম্বর কাহিনী। সব দেশে, সব কালে, সব ঘরেই রয়েছেন এই জননী। তাঁকে ঘিরে চলেছে ছোট ছোট পরিবার। সেই জননীর বিচিত্র জীবন, তার ব্যথা, বেদনা, আশা ও আনন্দের আখ্যান পার্লবাকের এই 'মাদার'। অননুকরণীয় ভঙ্গীতে একটি চির-পরিচিত চরিত্র এঁকেছেন তিনি।

হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত পার্ল বাকের এই অপূর্ব উপন্যাসটির সংগে বাঙলার পাঠক সমাজকে পরিচিত করিয়ে দিলেন, তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

—ভবানী মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

সবুজ পাহাড়-ঘেরা মনোরম উপত্যকার মাঝখানে ছোট্ট একখানি খোলার গোলাবাড়ি। হেঁসেলে মাটির উনানের পেছনে নীচু একখানি বাঁশের বেঞ্চিতে বসে মা সুকৌশলে শুকনো ঘাস দিয়ে আঁচ ঠিক করছিল। উনানে একটি লোহার কড়াই চাপানো। আগুন সবেমাত্র ধরেছে। মা উনানে খড়-কুটো দিতে দিতে চারদিকে ছড়ানো শুকনো ডাল-পালাগুলো গুছিয়ে রাখছিল। হেঁসেলে উনানের কোণ ঘেঁসে বসেছিল কুঞ্চিত-মুখ, জরাজীর্ণ এক বৃদ্ধা। তার গায়ে তালি-দেওয়া একটি নীল কোট; তার নিচে উজ্জ্বল লাল কাপড়ের তুলো-ভরা পুরু কোর্টটির কোণা বেরিয়ে পড়েছে। দুরন্ত চক্ষুরোগে সে প্রায় অন্ধ। চোখের পাতা দুটি জড়ানো। তবু সেই সামান্য ফাঁকটুকু দিয়েও সে বেশ দেখতে পায়। বৃদ্ধা বসে দেখছিল মার বলিষ্ঠ নিপুণ হাতে জ্বালানো আগুনের শিখা কেমন লক্‌লক্‌ করে উঠছে।

বৃদ্ধার মুখ খুললো এবার। মুখে তার একটি দাঁতও নেই। বসে-যাওয়া মাড়ির ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এলো তার অস্পষ্ট কথাগুলো,—একটু বুঝে-সুঝে খড় জ্বালিও। সম্বল তো ঐ একটি মাত্র বোঝা—দু'টো নিচ্ছ নাকি? বসন্ত সবেমাত্র পড়েছে, ঘাস বড় হয়ে কাটাবার মত হতে এখনও ঢের দেরী। আমার অবস্থা তো ঠিক তেমনিই রয়েছে। আর কোনদিন খড়ের একটি টুকরোও কুড়িয়ে আনতে পারবো কি না সন্দেহ। অপদার্থ বুড়ী! আমার মরণই ছিল ভালো!

শেষের এই ক'টি কথা সে দিনের মধ্যে বহুবার উচ্চারণ করে, আর প্রতি-বারেই পুত্রবধূর মুখে এমনি করে শোনবার অপেক্ষায় থাকে—ছিঃ ছিঃ ও-কথা বলোনা মা। তুমি না থাকলে আমরা মাঠে গেলে ঘর-বাড়ি দেখবে কে, কে দেখবে ছেলেমেয়েরা পুকুরে ডুবলো কি না?

জোরে কাশলো বুড়ী-মা, হাই তুললো কাশতে কাশতে, তা ও-কাজটুকু আমি করি—যা দিনকাল পড়েছে—যেখানে সেখানে চোর ডাকাতের উপদ্রব, এখন ঘরদোর আগ্‌লাতেই হবে। জান, বৌমা, কেউ এখানে এলে আমি

এমন চেঁচান চেঁচাবো! আমার মনে আছে, আমাদের দিনে এমন ছিল না। তখন নিড়ানীটি রাতভোর বাইরে ফেলে রাখলেও পরের দিন সকালে সেটি তেমনই পড়ে থাকতো, আর গরমের দিনে আমরা গোরু-মোষ বাইরে আঁকড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখতাম, পরদিন দেখা যেতো সেটি ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। আর—

কর্তব্যের খাতিরে তরুণী মা স্মিতহাস্যে বললো, তাই করতেন নাকি মা? বৃদ্ধা সারাদিন এমনই অবিশ্রান্ত বকে, তাই আর তার কোনো কথায় সে কর্ণপাত করলো না। বৃদ্ধা অবিরাম ভাঙা গলায় বকে চলে, এদিকে তরুণী মা ভাবে বসন্তের শেষে কচি ডাল কেটে আনার বা খড়-কুটো কুড়োবার সময় না হওয়া পর্যন্ত এই খড় সত্যিই চলবে তো। তবে, রান্নাঘরের দরজার বাইরে, খামারের এক ধারে এখনও দু'তাড়া ধানের খড় রয়েছে—বাইরে শক্ত খড় দিয়ে বেশ মজবুত করে বাঁধা—যেন বৃষ্টি আর তুষারে ভিজে না যায়। কিন্তু ধানের খড় কি জ্বালিয়ে নষ্ট করা যায়? শহরের লোকেরাই তো এ খড় জ্বালায়। তার স্বামী কিংবা সে এগুলো বড় বড় আঁটি বেঁধে শহরে নিয়ে যায়। বেশ দু'পয়সা হয় তাদের। নাঃ—শহরের বাড়ি ছাড়া ধানের খড় জ্বালানো যায় না! সে একমনে ধীরে ধীরে উনানে ঘাস দিতে লাগলো। প্রশস্ত, কঠিন, তার মুখমণ্ডল আগুনের আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, ভুরুর নীচে সাজানো উজ্জ্বল দুটি কাল চোখ আলোয় জ্বল জ্বল করছিল, মেয়েটি সুশ্রী নয় তবু তার মুখখানি, কামনা ও কমণীয়তায় শ্রীময়ী। দেখলে মনে হয় একটু বদরাগী হলেও মেয়েটি জায়া ও জননী হিসাবে সার্থক। ঐ বৃদ্ধার প্রতি তার ব্যবহার করুণায় ভরা।

অনর্গল বকে যেতে লাগলো বৃদ্ধা। ছেলে ও বৌকে যখন একটানা মাঠে কাজ করতে হয় তখন ঐ শিশু দুটিকে নিয়ে সারাদিন সে একা থাকে। এখন মনে হয় আদরের বধূটিকে যেন কত কথাই না তার বলার আছে: উনানের ধোঁয়ায় কাশির বেগে তার সাঁ সাঁ শব্দ ও ভাঙা কণ্ঠস্বর থেকে থেকে বাধা পায়ঃ আমি তো কতবার বলেছি, লোকের যখন খিদে পায়—বিশেষ করে আমার ছেলের মতো জোয়ান ছোকরার—তখন একটি ডিম শুধু নেড়ে—

মা আগুন বাড়াবার জন্য ঘাড় নীচু করলো। মায়ের কাঁকে দুটি শিশু ঝুলছিল, ঘ্যান-ঘ্যানানি ছাড়িয়ে বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

মা স্থিরভাবে কাজ করে চলে। প্রশান্ত, স্থির তার মুখ। এই ছেলে ও মেয়ের আবদার আর বৃদ্ধার অশ্রান্ত প্রলাপ শুনতেই সে যেন পাচ্ছিল না; সে ভাবে আজ সত্যিই একটু দেরী হয়ে গেছে তার। এখন বসন্ত দিনে মাঠে অনেক কাজ। সীমের শেষ সারিটা ভাঙবার জন্য থাকতে হয়েছিল তাকেও। গরমের এই দিনগুলি আর শিশির-ভেজা রাত—এদের সদ্ব্যবহার করা উচিত; তাই সে শেষ সারিটা সেরে এলো। আজ রাতেই শুক্‌নো সীমগুলিতে প্রাণ-স্পন্দন জেগে উঠবে। এই চিন্তা তাকে তৃপ্তি দিল। সিক্ত মাটির উষ্ণ স্পর্শে এই রাতে জীবনরসের ধারায় সমগ্র ক্ষেতটি সংগোপনে প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠবে। তার স্বামী এখনও কাজ করছে, খালি পায়ের চাপে শক্ত করে দিচ্ছে বাঁধগুলো। মাঠের মধ্যেও ছেলেমেয়েদের ডাক শোনা যাচ্ছিল। তাই স্বামীকে রেখে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছে সে। ফিরে এসে দেখলো, ক্ষুধিত ছেলেমেয়ে হেঁসেলের দরজায় দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করছে। ছেলেটি কাঁদছিল একটু কম, তার চোখে জল ছিল না এক বিন্দু, ছোট্ট মেয়েটি গোঁ-গোঁ করতে করতে হাতের মুঠো চিবোচ্ছিল। বৃদ্ধা গম্ভীরভাবে বসে তাদের অনুযোগ শুনছিল। এতক্ষণ সে তাদের ভুলিয়ে রেখেছিল। কিন্তু আর সামলানো যায় না তাদের। মা তাদের কোন কথা না বলে তাড়াতাড়ি উনানের ধারে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে একতাড়া কাঠ নিয়ে সেখানেই বসল। এই ইঙ্গিতই যথেষ্ট। ছেলেটা কান্না থামিয়ে তার পাঁচ বছর বয়সের সমগ্র শক্তি নিয়ে মার দিকে ছুটলো—সাড়ে তিন-বছরের মেয়েটিও এলো যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে। কড়াইয়ের ভেতর আহার্য সিদ্ধ হচ্ছে; কাঠের ঢাকনির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে সুগন্ধ বাষ্প। বৃদ্ধা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো, একবার তার দন্তহীন মাড়ি দুটো চিবালো। কড়াইয়ের নিচে আগুনের শিখা লোহার আবরণ ভেদ করে ওপরের দিকে ওঠবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ঘন ধোঁয়ায় পর্যবসিত হলো আবার। ঘরময় ধোঁয়া হলো। মা মেয়েটিকে নিয়ে একটু পিছিয়ে এলো। তীব্র ধোঁয়া এরই মধ্যে মেয়েটির চোখে লেগে গেছে। চোখ মিট্‌-মিট্‌ করে মেয়েটি তার হাতের মুঠি দিয়ে চোখ

দ্যটো ঘসে কান্না স্যরু করল। তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে হে'সেলের বাইরে এনে বসিয়ে দিয়ে মা বললো, এখানে বসে থাকো তুমি। রোজই তোমার চোখে ধোঁয়া লাগে, তব্য ঠিক তেমনি সেখানে মাথা ঢ্যকিয়ে দেবে।

প্যত্রবধ্যর কথা রোজ যেমন শোনে তেমনি শ্যনলো বৃদ্ধা। তার কথা বলার একটি নতুন উপলক্ষ হলো। বললো, আমি তো সব সময়েই বলি এতকাল যদি আমায় হে'সেল ঠেলতে না হোত, তা'হলে আজ আমি এমন আধ-কানা হয়ে পড়তাম না। ধোঁয়াই আমার চোখ খেয়েছে, আর ধোঁয়া—

মা বৃদ্ধার কথায় কান দিল না। সে শ্যনতে লাগলো সেই মেয়েটির কান্না। সে মাটির ওপর বসে ঘষে ঘষে চোখ খোলবার চেষ্টা করছিল। সত্যিই, মেয়েটির চোখ দ্যটি সর্বদাই লাল আর ক্ষত হয়ে আছে। তব্য কেউ যদি মাকে জিগ্যেস করে, তোমার মেয়েটির চোখের কোন অস্যখ আছে নাকি? তখনই সে বলে, খড় কুটো দিয়ে জ্বাল দেবার সময় ও ধোঁয়ায় যায় কি না!

মেয়েটির কান্নায় মা আর আগের মতো বিচলিত হয় না। সে এখন খ্যব ব্যস্ত। এ দ্য'টি ছেলেমেয়ে জন্মেছে খ্যব তাড়াতাড়ি, প্রথম ছেলেটির জন্মের পর সে তার কান্না একেবারেই সইতে পারতো না। ভাবতো—কাঁদলেই শিশ্যকে যে-কোন উপায়ে শান্ত করাই জননীর কর্তব্য। তাই কাঁদলেই সব কাজ ছেড়ে তাকে স্তন দিতে বসতো। হাতের কাজ বন্ধ করে ছেলেকে স্তন দিতে দেখে তার স্বামী রাগ করে বলতো, তুমি কি শ্যধ্য এই করবে আর সব কাজ আমারই ঘাড়ে চাপাবে? এই তো সবে স্যরু হয়েছে। এর পর কুড়ি বছর ধরে তুমি একটি না একটি বাচ্চাকে স্তন দেবে, আর আমাকে তাই সইতে হবে? তুমি তো বড়লোকের বউ নও যে স্যধ্য বাচ্চাদের স্তন দিয়ে কাটাবে আর পয়সা দিয়ে লোক খাটাবে!

উভয়েই তরুণ, দ্যজনের মেজাজই সমান চড়া। তাই সেও বলতো ঝাঁঝালো কণ্ঠে, আমার কষ্টের জন্য আমার কি কিছ্যই পাওনা নেই? আমার মতো ভরা-পেট নিয়ে মাসের পর মাস কাজ কর তুমি? প্রসবের কষ্টটা কি সইতে হয় তোমার? ঘরে এসে তুমি বিশ্রাম কর না? কিন্তু ঘরে ফিরে রান্না করা, ছেলেমেয়েদের দেখা, ব্যড়ি শ্বাশ্যড়িকে শান্ত করা, আরও কত কি করতে হয় আমাকে—

এইভাবে দুজনে কিছুকাল কলহ করতো, হারজিত নেই কারো। কেউ কারো চেয়ে কম নয়। এই কলহ বেশিদিন কিন্তু রইলো না, শুকিয়ে গেল স্তনের দুধ। সুস্থ, সবল পশুর মতো আবার সন্তান সম্ভাবনা হল মার। গত গ্রীষ্মে লাংগলের মুখে হোঁচট খেয়ে পড়ে একবার গর্ভপাত হয়ে গেছে। তবু আবার দুধ শুকালো।

পালন করা দরকার ছেলেদের। তবু, যদি তারা কাঁদে, কাঁদুক। এখন আর দৌড়ে গিয়ে স্তন দিতে পারে না, তাদের অপেক্ষা করে থাকতে হয়। সে মুখে একথা বললেও আসল কথার চেয়ে কোমল তার অন্তর। ছেলেমেয়েদের ডাকে সে তাই এখনও ছুটে আসে তাড়াতাড়ি।

খানিকক্ষণ সেদ্ধ হবার পর ধোঁয়ার সংগে চালের সুগন্ধ মিশলো। তখন সে একটি রেকাবী নিয়ে এসে পাত্রটি পূর্ণ করে বৃদ্ধার জন্যে খাবার বাড়ে। সেটি তাদের বড় ঘরে টেবিলের উপর রেখে বৃদ্ধার অস্পষ্ট আড়ষ্ট কথায় কর্ণপাত না করে তাকে সেখানে নিয়ে এলো। বৃদ্ধা বললো—আর যদি এর সংগে কিছু কড়াই শুঁটি মিশিয়ে নাও তো কী চমৎকারই না হবে খেতে!

বৃদ্ধা বসলো। তার শুকনো শীতল দুহাতে রেকাবীটি চেপে ধরে নীরব হলো, খাবার লোভে সে কেঁপে উঠলো হঠাৎ। তার কোঁচকানো মুখের কোণ থেকে জল বেরিয়ে এলো। অস্পষ্ট অস্ফুট স্বরে সে বললো আমার চামচটা গেল কোথায়—ওটা পাচ্ছি না যে।

বৃদ্ধার কম্পিত হাতখানির ভিতর চীনেমাটির চামচটি গুঁজে দিয়ে মা বেরিয়ে গেল। দুটো টিনের বাসন ভর্তি করে খাবার আর দু জোড়া বাঁশের কাঠি নিয়ে ফিরে এলো আবার। মেয়েটি তখনও চোখ ঘষতে ঘষতে কাঁদছিল। তাই, আগে মেয়েটির কাছেই খাবার নিয়ে গেল। খামার-ঘরের ধুলোর উপর সে বসেছিল। চোখের জলে আর কাদায় ভরে গিয়েছিল তার মুখখানি। মা মেয়েটিকে দাঁড় করিয়ে শক্ত হাতের তালু দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিল, তারপর তুলো-ভরা কোটটির কোণা তুলে চোখ মোছালো। মেয়েটি খুব শান্ত। তার চোখ দুটি রক্তাভ আর নরম, চোখের কোণগুলি বেরিয়ে পড়েছিল। অস্থিরভাবে গোঙাতে গোঙাতে যন্ত্রণায় মাথা ঝাড়ছিল

সে। শিশুর কষ্টে মার মনেও দুঃখ জাগলো। বাইরে শক্ত রঙহীন টেবিলের উপর রেকাবীটি রেখে করুণ কণ্ঠে বলল, এসো—খাও!

মেয়েটি অধীর-পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। সন্ধ্যাসূর্যের দীপ্ত সোনালি রশ্মিতে তার লালচে দুটি চোখ অর্ধ-নিমীলিত। রেকাবীটির দিকে সে হাত বাড়ায়। মা বলল, দেখো, এখনো গরম রয়েছে। একটু ইতস্ততঃ করে মেয়েটি ফুঁ দিয়ে খাবার ঠান্ডা করতে লাগলো। মা তখনও চিন্তাকুল হয়ে চেয়েছিল তার দিকে। মনে মনে বলল, ও যখন এবার ধানের আঁটি নিয়ে শহরে যাবে, তখন বলবো—যেন কোন ওষুধের দোকান থেকে চোখের ঘায়ের একটা মলম নিয়ে আসে।

ওদিকে, তার রেকাবীটি টেবিলে এনে রাখা হয়নি বলে ছেলেটি চেঁচামেচি করছিল। মা তার খাবার টেবিলের উপর এনে রাখলো। কিছু-ক্ষণের জন্য সব শান্ত।

গভীর শ্রান্তি অনুভব করলো মা। খাবার ইচ্ছে হলো না। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছোট বাঁশের বেঞ্চিটা বাইরে এনে সে বসে পড়লো তার ওপর। ঘন ঘন নিশ্বাস ছেড়ে তার রৌদ্র-পিঙ্গল, রুক্ষ চুলের উপর হাত বুলিয়ে একবার দেখলো চারদিকে। পান্ডুর আকাশের তলে উপত্যকা-বেষ্টিত নীচু পাহাড়টি ধীরে ধীরে কালো হয়ে আসছে। উপত্যকার বুকে ছোট্ট পল্লীখানিতে সান্ধ্য-ভোজনের জন্য আগুন জ্বালানো হয়েছে, বায়ুহীন শূন্যে তার ধোঁয়া উঠছে অবসন্নভাবে। এ দৃশ্য দেখে মার মনে তৃপ্তি জাগলো। অতর্কিতে মনে হলো—ছোট্ট পল্লীটির ছ'সাতখানি পরিবারে এমন একটি পরিবারও নেই যেখানে কোনো মা সন্তানের জন্য তার চেয়ে বেশী কিছু করে। পাড়ায় তার চেয়েও কটি ধনী পরিবার রয়েছে। ঐ হোটেলওয়ালার স্ত্রীর নিশ্চয় কিছু উদ্বৃত্ত টাকা ছিল। তার হাতে দুটো রুপোর আংটি, কানে একজোড়া দুল। ঠিক তেমনি একজোড়া দুল পরবার সাধ তার ছেলেবেলায় হয়েছিল, আজো সেই সাধ অপূর্ণ রয়েছে। ছেলেমেয়েকে পেটপুরে খাইয়ে তাদের হাড়গুলোকে মাংসে রূপান্তরিত করবার মতো টাকাও তার নেই। লোকে বলে, খাবার পর খদ্দেররা যা উচ্ছিষ্ট ফেলে যায়, হোটেলওয়ালা তার ছেলেমেয়েদের সেই মাংস খাওয়ায়।

কিন্তু সে তার সন্তানদের খাওয়ায় তারই জমি থেকে পাওয়া ভাল চালের ভাত। মেয়েটির চোখ দুটি যদি ভালো থাকতো, তাহ'লে কোন অভিযোগ থাকতো না তার। সুস্থ সুগঠিত তাদের দেহ, ছেলেটির গঠন সাত-আট বছরের ছেলের মতো। হ্যাঁ, তার সন্তানেরা বেশ স্বাস্থ্যবানই হয়। এর আগের সন্তানটি যদি এত তাড়াতাড়ি এসে একবার নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই মারা না যেতো, তাহলে সেও সুন্দর হতো। এতদিনে হাঁটবার মতো হতো। আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো মা। দু'-এক মাসের মধ্যেই আসছে আবার নতুন সন্তান। এই ভাবনাও কম নয়। তবু সে সুখী। যখন তার গর্ভে সন্তান থাকে তখনই সে থাকে পরিপূর্ণ, সজীব—সবচেয়ে বেশি প্রফুল্ল।

পল্লীপথের ঘর থেকে কে যেন বেরিয়ে এলো। ধোঁয়ায় ভরা দরজা দিয়ে দেখলো—তার বড়জা। সে বলল, তুমি এখনও রান্না করছ বুঝি! আমার এই শেষ হ'ল।

সে উত্তর দিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি বলছিলাম তোমার রান্না নিশ্চয় শেষ হয়ে গেছে এরই মধ্যে। সত্যি তুমি খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে পার।

উচ্চকণ্ঠে সবিনয়ে মা বলল, না—না, আমার বাচ্চাদের ঠিক সময়ে ক্ষিদে পায় কিনা!

বড়জা আবার বলল, তুমি সত্যি চট্‌পটে। তারপর সে ঘাস নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লো আবার। এরই জন্যে এসেছিল সে। গোধূলির আলোয় মা ক্ষণকাল বসে রইলো অর্ধস্মিত মুখে। সে তার নিজের সামর্থে সন্তানদের আর স্বামীর গর্ব করতে পারে। কিন্তু বেশিক্ষণ শান্তিতে থাকতে পারলো না সে। ছেলেটি সামনে এসে রেকাবীটি ফেলে বলল, মা, আর একটু দাও!

রেকাবীটি ভর্তি করে আনবার জন্য সে উঠলো। দরজার বাইরে এসে দেখলো-- যে-মাঠে সে এতক্ষণ কাজ করছিল তারই প্রান্তে পাহাড়ের মাঝখানে রয়েছে সূর্য। হয়তো একটু বিশ্রামসুখ উপভোগ করছে সে। বৃহৎ একটি সোনার টুক্‌রোর মতো কিছুক্ষণ স্থির থাকার পর ধীরে ধীরে ডুবতে ডুবতে সূর্য চোখের আড়ালে নেমে গেল।

মা দেখলো—সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে সরু পথ বেয়ে কাঁধের কোদালটি এক হাতে চেপে ধরে কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে ফিরে আসছে তার স্বামী। বিড়ালের মত ধীরে অলস-পদক্ষেপে অগ্রসর হ'তে হ'তে হঠাৎ গান ধরলো সে।

সংগীত তার প্রিয়, কণ্ঠস্বরও বেশ জোরালো, কম্প্রমান, স্পষ্ট। অনেকগুলো গান সে জানে। বিশ্রামের দিনে প্রায়ই চা'র দোকানের আসরে গাইতে ডাকে তাকে। সময়টা বেশ কেটে যায়। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই সে সুর নামালো। উঠানে পৌছেও গলা কাঁপিয়ে দ্রুত তালে সে গান গাইছিল। দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে সে কোদালটি রাখলো। তার কণ্ঠস্বর শুনে দিবানিদ্রা কাটিয়ে বৃদ্ধা বলল, বলেছিই তো—আমার ছেলে ভাতের সঙ্গে মটর শুঁটি মিশিয়ে খেতে ভালবাসে—আর এমনি মিষ্টি—

সহজ, অলস হাসি হেসে লোকটি ঘরে ঢুকলো। সুমধুর-কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ মা, আমি তাই ভালবাসি।

দরজার বাইরে মেয়েটি তার রেকাবীটি খালি করে চুপটি করে বসে ছিল। ক্ষিদে তার তৃপ্তি হয়নি এখনও। সূর্য গেছে অস্তাচলে। তাই, চোখ দুটো একটু সহজভাবে বিনা কষ্টে মেলে দেখছিল তার চারিদিকে। মা হেঁসেলে ঢুকলো আবার। স্বামীর জন্য এক রেকাবী গরম ভাত নিয়ে এলো। নীল আর শাদায় মেশানো বড় রেকাবীটি কানায় কানায় পূর্ণ। তার ওপর তাদেরই পোষা মুরগীর একটি ডিম ভেঙে দিয়েছিল মা। ডিমের শাদাটি একটু শক্ত হয়ে উঠেছিল। কঠোর পরিশ্রম করে তার স্বামী। মাংস কি একটি ডিম খাওয়া তার একান্ত প্রয়োজন। তারা দুজনে কোঁদল করে বটে, তবু স্বামী পেট পুরে খেয়েছে দেখে মা আনন্দ পায়। ভাবে—এ কলহ শুধু বাহ্যিক। বিনা কারণে তার সঙ্গে ঝগড়া বাধালেও সে স্বামীকে আহার-রত দেখতে ভালবাসে। সে বলল বৃদ্ধাকে, তোমার ছেলের ভাতে একটি টাটকা ডিম আর খানিকটা কপিও দিয়েছি।

বৃদ্ধা তক্ষুণি বলে উঠলো, হ্যাঁ, তাজা ডিম! আমি তো সব সময়েই বলি তাজা ডিম জোয়ানদের পক্ষে খুবই উপযোগী। তাতে গায়ে জোর হয়। কিন্তু কর্ণপাত করলো না কেউ তার কথায়।

খুব বেশি ক্ষিদে পেয়েছিল তার, তাই, লোকটি গোগ্রাসে খাবারটা শেষ

করে টেবিল চাপড়ে স্ত্রীকে ডেকে আরও খাবার চাইলো। স্বামীর রেকাবীটি আবার পূর্ণ করে দিয়ে মা তার নিজের খাবার নিয়ে এলো। কিন্তু স্বামীর পাশে বসলো না সে। উঠানে ছোট একটি বেঞ্চির উপর বসে সে তৃপ্তিভরে খেতে লাগল। খাবার সে ভালবাসে—স্বাস্থ্যবান্ পশু যেমন ভালবাসে ঠিক তেমনি। এক একবার উঠে গিয়ে স্বামীর পাত থেকে কপির টুকরো নিচ্ছিল সে। খেতে খেতে দুই পাহাড়ের মাঝে রক্তবর্ণ আকাশের দিকে চাইছিল।

ছেলেমেয়ে দুজনেই এসে তার গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে মুখ বাড়াচ্ছিল আর সে কাঠির সাহায্যে তাদের মুখে খাবার তুলে দিচ্ছিল। তারা পেট ভরে খেয়েছে, ক্ষিদের উপশম হয়েছে তাদের। তাছাড়া এ জিনিসটাই তারা খেয়েছে; তবু, মার খাবারটাকেই তারা ভালো মনে করছিল। খামারের সেই হলদে কুকুরটিও মনে দৃঢ় আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। উদ্‌গ্রীব হয়ে সে বসেছিল টেবিলের নিচে, কিন্তু তার স্বামী তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই সে বেরিয়ে এসেছে। মা দু' একবার তাকে কিছু খাবার ছুঁড়ে দেয়, কুকুরটাও তাড়াতাড়ি তা মুখে তুলে নেয়।

তিন তিনবার উঠে মা স্বামীর রেকাবী পূর্ণ করে দিল আর সে নিজেও খেলো তৃপ্তির সঙ্গে। সে ঢেকুর তুললো খাওয়ার পর, খালি রেকাবীটিতে ফোটানো জল ঢেলে চুমুক দিয়ে পান করলো। তারপর উঠে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কুলকুচি করলো। কাজ শেষ হয়ে গেলে মা রেকাবীটি সেখান থেকে তুলে নিল। স্বামী মুহূর্তেক দাঁড়িয়ে দেখলো রাতের পল্লী। আকাশের ছোট স্বচ্ছ তারা দলের মাঝখানে জেগে ছিল বসন্তের তরুণ নিষ্প্রভ চাঁদ। সেদিকে ফিরে দাঁড়িয়ে সে গান ধরলো জড়িতকণ্ঠে।

পল্লীর আর আর বাড়িতে তখন লোকজন আনাগোনা করছিল, সরাই-খানায় খেলার আসর সম্বন্ধে ডাকাডাকি করে আলোচনা করছিল, কেউবা নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হাই তুলছিল। অতর্কিতে গান বন্ধ করে তরুণ গৃহস্বামী নিবিষ্টভাবে রাস্তার পানে চাইলো। আর সবাই যখন বিশ্রাম করে তখনও সুধু একটি পরিবারে একটি লোক কাজ করতে থাকে। সে হচ্ছে তার ভাসুর—বড়জার স্বামী। সেই লোকটি রাত্রিতেও কাজ করে। ঐখানে

ঘরের দরজায় বসে ঘাড় নিচু করে সে উইলো গাছের পাতায় কাণ্ড দিয়ে একটি বাস্কেট বুনছে। কোনো কোনো লোক অমন হয়ে থাকে। কিন্তু সে— সামান্য একটু খেলা—! ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখলো স্ত্রীর দিকে। স্ত্রীর তীব্র দৃষ্টি চোখে পড়লো তার। সে তাকে নীরবে অভিসম্পাত দেয়। সারাদিন খেটেছে সে। রাত্রিতেও কি একটু খেলতে পারবে না? সারাজীবন সে-কি সুধু কাজ করেই কাটিয়ে দেবে? তবু, স্ত্রীর কটাক্ষের সামনে দাঁড়াতে পারলো না সে। শিশুশুলভ প্রগল্‌ভতার সংগে গা নেড়ে বলল, সারাদিন এমনি খাটনির পরে—যাই, ঘুমোইগে তাহ'লে। আজ আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—খেলতে পারবো না।

ঘরে ঢুকে গা এলিয়ে দিয়ে বিছানায় পড়ে হাই তুললো সে। নিষ্প্রদীপ ঘরের অন্ধকারে কিছু না দেখে বৃদ্ধা মা ডেকে জিগ্যেস করলো, ছেলে কি শুয়ে পড়েছে,

রুষ্টভাবে সে উত্তর দিল, হ্যাঁ মা, এখানে এইটুকু ঘরে কি আর করবার আছে? কাজ কর আর ঘুমোও—কাজ আর ঘুম!!

তার স্বরে ক্রোধের কোন লক্ষণ না পেয়ে বৃদ্ধা তৃপ্তির সংগে বলল, হ্যাঁ-হ্যাঁ—কাজ আর ঘুমই তো! বৃদ্ধা গাত্রোত্থান করে পথ হাতড়ে অগ্রসর হতে লাগলো—তারই জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় যেখানে নীল কাপড়ের মশারির নীচে শয্যা বিছানো রয়েছে। ছেলে এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তার নিশ্বাসের শব্দ শুনে মা উঠলো। মার কোর্তাটি আঁকড়ে ধরে সংগে চলল তার ছেলে আর মেয়ে। সে হেঁসেলের দরজায় রাখা কলসীটি থেকে একটু ঠাণ্ডা জল দিয়ে রেকাবীগুলো ধুয়ে নিলো। তারপর মাটির দেয়ালের তাকে সেগুলো সাজিয়ে রাখলো। এবার ঘরের পেছনে গিয়ে চাঁদের ক্ষীণ আলোকে ফাঁকা কুয়াটির ভিতর কাঠের বালতি ডুবিয়ে জল তুলে কলসীটি ভর্তি করে রেখে এলো। খামারের একটি উইলো গাছের সংগে মোষটির বাঁধন খুলে দিতে আর একবার বাইরে গেল সে। মোষটিকে খাওয়ালো কিছু খড় আর খোল। খাওয়া শেষ হলে টেনে এনে তার স্বামী যে খাটে শুয়েছিল তারই একটি খুঁটির সংগে বেঁধে রাখলো। মুরগীগুলো ঘুমোচ্ছিল খাটের নিচে। তাকে দেখে তন্দ্রাভরে তারা একবার ডেকে উঠে

আবার নীরব হলো।

আবার বাইরে এসে মা ডাক দিল। ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো একটি শূকর ছানা। দুপুরবেলা সে তাকে খাইয়েছে, এখন আর তাকে খাওয়ালো না। গা ধরে ঠেলতে ঠেলতে সে তাকে ঘরে নিয়ে গেল। বাইরে রেখে এলো সুধু সেই হলদে কুকুরটাকে। কুকুরটা দরজায় শুয়ে থাকবে।

ছেলে আর মেয়েটি এতক্ষণ ধরে তার পেছনেই ঘুরছে, যদিও সে তাদের জন্যে অপেক্ষা না করে ছুটোছুটি করছিলো। এবার তারা তার পাজামাটি আঁকড়ে ধরে কান্না সুরু করলো। সে নীচু হয়ে ছোটটিকে কোলে তুলে নিয়ে বড়টির হাত ধরে ঘরে ঢুকে জোরে আগল এঁটে দিল। বিছানায় গিয়ে স্বামীর পায়ের দিকটায় ছেলে আর মেয়েকে শুইয়ে তাদের গায়ের জামাগুলো খুলে দিল, নিজেও জামাটি ছাড়লো। তারপর স্বামী আর ছেলেমেয়ের মাঝখানে শুয়ে সে লেপটি টেনে দিল সকলের গায়ের ওপর। সুস্থ অবসাদে সে স্থিরভাবে পড়ে রইলো। এমনই অন্ধকারে শুয়ে থাকলেই কামলতায় ভরে ওঠে তার মনখানি। দিনে সে যতই অধীর হোক না কেন, হঠাৎ যতই রুষ্ট হোক, রাত্রিতে সে স্নেহশীলা। স্বামীর দিকে সে যখন ফেরে তার দেহেরে প্রয়োজনে, তখন সে হয় প্রশান্ত, মমতাময়ী। অসহায় ঘুমন্ত শিশুদের প্রতি সে করুণাময়ী। বৃদ্ধা যদি রাত্রিতে কাশে, সে নিজে উঠে গিয়ে জল এনে দিয়ে তার প্রতি স্নেহ দেখায়। এমন কি, পশুগুলোর একটির নাড়াচাড়ায় আর একটি ভয় পেলে, সে তাদের উদ্দেশ্যে স্নেহভরে ডেকে বলে, শান্ত হয়ে ঘুমো। ভোর হবার এখনও ঢের বাকী। কর্কশ দয়ার্দ্র কণ্ঠস্বর শুনে ওরা আবার শান্ত হয়ে ঘুমোয়।

অন্ধকারে নাক ঘষতে ঘষতে ছেলেটি তার স্তন হাতড়াচ্ছিল। উষ্ণ বিভোর তন্দ্রাভরে সে তাকে স্তন দেয়। শুকনো কিন্তু নরম বুক ছেলেটিকে তৃপ্তি দেয়। শিগ্‌গিরই তার বুক ভরে উঠবে আবার। ছেলেটার অদূরে শুয়েছিল মেয়েটি। বন্ধ চোখ দুটো জোরে চেপে ধরে সে ঘুমের মধ্যে চুলকানির জন্য অবিশ্রান্তভাবে ঘষছিল। ঘুমোবার পরও সে অজ্ঞাতে চোখ দু'টো আঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলে।

অলপক্ষণের মধ্যেই তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। সকলেই গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন। রাত্রিতে কুকুরের ডাক শুনেও মা ছাড়া আর কেউ জাগে না। ভাবে ওটা রাত্রির সুর। মা সুধু জেগে উঠে শোনে, ওঠবার প্রয়োজন না হলে ঘুমোয় আবার।

॥ দুই ॥

মার কাছে সব দিনই সমান। সকালেই মার ঘুম ভাঙলো। ভোর হবার আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে এলো। আর সবাই তখনও ঘুমোচ্ছিল। দরজা খুলে সে মুরগীগুলো আর শুয়োরের বাচ্চাটিকে ছেড়ে দিল, মোষটিকে উঠানে নিয়ে এলো, তখনও জাগেনি কেউ। সে হেঁসেলে ঢুকে আগুন ধরালো, স্বামী আর বৃদ্ধার জন্য জল গরম করলো। মেয়েটির চোখ ধোয়ার জন্য খানিকটা জল একটি পাত্রে ঢেলে জুড়োতে দিল।

রোজ সকালে মেয়েটির চোখ দু'টি একেবারে আঁটা থাকে, ধুয়ে না দিলে কিছুই দেখতে পায় না। মেয়েটি আগে ভয় পেতো, মা-ও আতঙ্কিত হতো। কিন্তু, বৃদ্ধা ঠাকুমা বাঁশি বাজিয়ে উঠতো, আমারও ছেলেবেলায় অমন হোত, তা'বলে আমি তো আর মরে যাইনি!

এখন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে তারা। জানে—এমন হয়ে থাকে শিশুদের, আর এ মারাত্মক নয়। মা সবেমাত্র জলটা ঢেলেছে, এমন সময় শিশুরা উঠে এলো। ছেলেটি মেয়েটি হাত ধরে পথ দেখিয়ে আনছিল। তারা নীরবে চলে এসেছে—যেন তাদের বাবা জেগে উঠে রাগ না করে। অন্য সময়ে খুসী থাকলেও ঘুম ভাঙবার আগে জাগালে সে প্রচন্ড রাগে তা'দের ভীষণ মার দেয়। দু'জনেই দরজায় দাঁড়িয়ে রইলো নীরবে। ছেলেটি ঘুমের ঘোরে চোখ রগড়াচ্ছিলো আর মার দিকে চেয়ে হাই তুলছিল। ছোট মেয়েটি ধীরভাবে দাঁড়িয়েছিল। তার দু'টি চোখ বন্ধ।

মা তাড়াতাড়ি উঠে দেয়ালের খোঁটায় ঝুলোনো ধূসর গামছাটি নিল। তারপর গামছাটির একটি কোণা জলে চুবিয়ে নিয়ে সন্তর্পণে মেয়েটির চোখ মুছিয়ে দিতে লাগলো। মেয়েটি ঘন নিশ্বাস ফেলছিল, আর যন্ত্রণায় নিঃশব্দে ঘাড়

নাড়ছিল। আর-আর সকালের মত মা ভাবলো, এবার মেয়েটির জন্যে একটা চোখের মলম আনতে হবেই—আজ না হোক, কাল। ধানের খড়গুলি বিক্রী করতে যখন যাবে তখন মনে থাকলে আমি তাকে বলবো কোন একটি ওষুধের দোকানে যেতে। সেই সরু রাস্তাটির মাথায়—গেটের কাছেও তো একটি দোকান আছে।

সেই মুহূর্তে, গায়ের জামা খুলতে খুলতে হাই তুলে মাথা চুলকোতে চুলকোতে এগিয়ে এলো তার স্বামী। মা তার মনের কথাটি প্রকাশ করলো, এবার যখন খড় বিক্রী করতে যাবে তখন ওয়াটার গেট-এর কাছে সেই ওষুধের দোকান থেকে চোখের একটা মলম কিংবা অন্য কোন ওষুধ নিয়ে এসো।

তার ঘুমের নেশা তখনও কাটেনি। বিরক্তিভরে উত্তর দিল, এ অসুখে যখন প্রাণের ভয় নেই তখন অনর্থক টাকা খরচ করে কি হবে? ছেলেবেলায় আমারও এমনি অসুখ ছিল। এজন্যে আমি তাঁর একমাত্র ছেলে হ'লেও বাবা তো কোনদিন পয়সা খরচ করেন নি।

এখন প্রতিবাদের সময় নয় বুঝে মা কোন কথা বললো না। ঘরে ঢুকে স্বামীর জন্যে জল নিয়ে এলো। তার মনে রাগ হয়েছিল; তাই সে জলটা টেবিলের উপর রাখলো যেন জলের জন্য স্বামীকে সেখানে হেঁটে যেতে হয়। তবু, মা কোন কথা না বলে এ প্রসঙ্গ স্থগিত রাখলো। হ্যাঁ, অনেক শিশুরই চোখের ক্ষত থাকে। শৈশব কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যখন তাদের স্বাস্থ্য ভাল হয়, তখন সেরে যায় এ রোগ। তা'ছাড়া তার স্বামীরও-তো এ রোগ ছিল। এখনও লক্ষ্য করলে চোখের পাতার নিচের আঁচড়গুলো চোখে পড়ে। যদিও সে পণ্ডিত নয়, জীবিকার্জনের জন্য বই পড়তে হয়না তার, তবু তেমন ভালো না হলেও সে বেশ দেখতে পায় এখন।

বৃদ্ধা শয্যায় পাশ ফিরে মৃদুকণ্ঠে ডাকলো। বিছানা ছেড়ে ওঠার আগে তাকে জলপান করাবার জন্য মা একটি পাত্রে গরম জল নিয়ে তার কাছে গেল। সে জলপান করলো, হাই তুলে খালি পেট থেকে ঢেঁকুর তুললো; বার্ধক্য-জনিত প্রাতর্দুর্বলতায় মৃদু আর্ত-ধ্বনি তুললো।

হেঁসেলে ফিরে গিয়ে মা সকালের খাবার তৈরী করতে লাগলো।

শিশুরা ভোরের ঠাণ্ডায় জড়সড় হয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে মাটিতে বসেছিল। যেখানে বসে মা আগুন ধরাচ্ছিল ছেলেটি উঠে গেল সেখানে। মেয়েটি একা বসে রইলো। সহসা পূবের পাহাড়ের উপর সূর্য দেখা দিল। তার উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি ছড়িয়ে পড়লো মাঠের উপর। মেয়েটির চোখে লাগলো এই আলো, তাই সে তার দুটি চোখ বন্ধ করলো। আগে সে চেঁচিয়ে উঠতো, কিন্তু এখন বয়স্ক লোকের মতো ঘন নিশ্বাস ফেলে সে স্থির হয়ে বসলো, চেপে ধরলো তার লাল চোখের দুটি পাতা। তার মা তার দিকে খাবারের রেকাবীটি বাড়িয়ে দিয়েছে অনুভব না করা পর্যন্ত সে চুপ করে রইলো। মায়ের কাছে দিনের বৈচিত্র্য নেই। তবু, দিনগুলো কখনও একঘেয়ে মনে হয় না তার। দিনের এই বিবর্তনে সে বেশ তৃপ্ত। কেউ জিগ্যেস করলে সে তার উজ্জ্বল কালো চোখ দুটি ডাগর করে মেলে বলে, বীজবপনের কাল থেকে ফসল কাটার সময় পর্যন্ত মাঠের পরিবর্তন হয়। আমাদের নিজের জমি থেকে ফসল কাটা হয়, জমিদারের প্রাপ্য ফসল দেওয়া হয়, উৎসব উপলক্ষে নববর্ষে আমরা বিশ্রামসুখ উপভোগ করি। শিশুদেরও পরিবর্তন হয়, তারা বড় হয়, আমি আবার সন্তান ধারণ করি। আমার মধ্যে পরিবর্তন ছাড়া কী আছে? বলতে পারি, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করার মধ্যেও অনেক নূতনত্ব রয়েছে।

অবসর পেলে সে দেখতে পারতো গাঁয়ের স্ত্রীলোকদের কার ছেলে হচ্ছে, কার বুকের ছেলে মারা গেছে, কে জুতোর ফুলের নতুন প্যাটার্ণ তুলছে কিংবা নতুন ফ্যাসানে কোট কাটছে। এমন দিন গেছে, যখন কিছু ধান বা শস্য কিংবা কপি নিয়ে শহরে যেতো দু'জনে একসঙ্গে। শহরে কত বিচিত্র দৃশ্য রয়েছে দেখবার, সময় থাকলে ভাববারও। আসলে এমনই স্ত্রীলোক যে তার স্বামী আর সন্তানদের নিয়ে অন্য কোন চিন্তা না করে সন্তুষ্ট থাকতে পারে। স্বামীর নিত্য দৈহিক উত্তেজনা সম্বন্ধে সচেতন থাকা, তার ঔরসে সন্তান ধারণ করা আর নিজের শরীরে জীবনের জন্ম-বৃদ্ধি ও নতুন মাংসের আকার ও গঠন অনুভব করা, সন্তানদের জন্ম দেওয়া, বুকে শিশুর ঠোঁটের স্পর্শ পাওয়া, ভোরে শয্যাত্যাগ করা, ঘরের লোকেদের খাওয়ানো, পশু পালন, বীজ-বপন ও শস্য আহরণ, কূপ থেকে পানীয় জল সংগ্রহ, পাহাড়ে বুনো ঘাস

কেটে দিন কাটানো, বৃষ্টি ও রোদ মাথায় নেওয়া—এই যথেষ্ট তার কাছে। জীবনকে উপভোগ করে সে। সন্তানের জন্মদান, মাঠে পরিশ্রম, খাওয়া-পরা, ঘুমানো, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাড়ির জিনিসপত্র গুছানো, গাঁয়ের স্ত্রীলোকদের মুখে সেলাই ও অন্যান্য কাজে তার নিজের প্রশংসা শোনা, এমন কি স্বামীর সঙ্গে কোন্দল করে দু'জনের দৈহিক উত্তেজনার খানিকটা লাঘব করাও বরং ভালো। তাই সে প্রতিদিনই উৎসাহের সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করে।

আজ খাওয়ার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিড়ানীটি নিয়ে অভ্যাস মতো ধীর পদক্ষেপে স্বামী মাঠে চলে গেল। মা পাত্রগুলো ধুয়ে রাখলো, বৃদ্ধাকে এনে রোদে বসালো, পুকুরের ধার দিয়ে না যেতে সতর্ক করে দিয়ে ছেলেমেয়েকে খেলতে পাঠালো। তারপর নিড়ানীখানি নিয়ে যাত্রা করলো নিজে। যেতে যেতে থেমে ফিরে ফিরে তাকালো দু'একবার। বৃদ্ধার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বাতাসে অস্পষ্ট ভেসে এলো। মৃদু হাস্যে অগ্রসর হতে লাগলো মা। ঘর পাহারা দেওয়াই বৃদ্ধার কাজ। এ কাজ সে সগৌরবে করে। বৃদ্ধা আঁধকানা হলেও অবাঞ্ছিত কেউ কাছে এলে সে দেখতে পাবে আর তক্ষুণি চেঁচাবে। এই বৃদ্ধাটি এক উপদ্রব বিশেষ। তাঁকে পালন করা শিশু-পালনের চেয়েও বিরক্তিকর। এখন অত্যন্ত জেদী হয়েছে সে। তাঁকে শিশুর মতো মার দেওয়া চলে না। খুড়তুতো ভাইয়ের স্ত্রী একদিন তাকে বলেছিল, এই অন্ধ বাতরোগী খিটখিটে হাভাতে বুড়িটা মারা গেলে তোর ভাল হবে। তখন সে সহজ শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, বাড়ীঘর পাহারা দেওয়া তো কম কাজ নয়। আশা করি, মেয়েটি বড় না হওয়া অবধি উনি বেঁচে থাকবেন অন্তত—

সত্যিই, বৃদ্ধার প্রতি এমন নিষ্ঠুর হবার কথা মা কোনদিন ভাবেনি। অনেক মেয়ের গর্বিত বাণী সে শুনেছে। তারা শ্বাশুড়ীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে, বয়োজ্যেষ্ঠাদের শাসন মানে না। কিন্তু এই তরুণ্য-মার কাজে বৃদ্ধা যেন আর একটি সন্তান—তারই নিজের সন্তানদের মতো সে বায়না ধরে তার কাছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি করে তাঁর ফরমাসি ওষুধ, গাছ-গাছড়া খুঁজে আনা রীতিমত পরিশ্রম মনে হয়। তবু, যখন সে'বার গরমের সময়ে এই ছোট্ট গ্রামখানিতে কলেরা লাগলো, দু'জন জোয়ান মরদ

মরলো, ক'জন স্ত্রীলোক আর ক'টি শিশু প্রাণ হারালো আর বৃদ্ধা মৃত্যু-শয্যায় পড়লো—অন্ততঃ মনে হলো তাই। তাদের সাধ্যমত অর্থব্যয়ে তার জন্য একটি কফিন তৈরী করে আনা হলো, তখনও বৃদ্ধা তার জীবনকে আরো কিছুদিন আঁকড়ে ধরে রইলো দেখে মা সত্যিই খুসী হলো। শক্ত এই বৃদ্ধাটি দু'খানি সমাধিবস্ত্র বেঁচে থেকেই পরেছে, তবু তার প্রাণ রক্ষা হওয়ায় মা আনন্দিত হলো। সারাটি পল্লীর মধ্যে এ এক বিস্ময়। বুড়ি এখনও কেমন করে বেঁচে রয়েছে। তরুণী মা বৃদ্ধাকে সমাহিত করার জন্য যে লাল কোটটি তৈরী করেছিল, একটি নীল কোটের নীচে সেটিই পরেছিল সে। সমাধি-বস্ত্রটি পরে ছিঁড়ে ফেলাই হচ্ছে এ অঞ্চলের রীতি। আবার ঘ্যান্ ঘ্যান্ করতে লাগলো বৃদ্ধা। আর একটি নতুন জামা তৈরী করে না দেওয়া পর্যন্ত সে সোয়াস্তি পেলো না। জামাটি পরে সে ছিল আনন্দে।

কেউ যদি তাকে জিগ্যেস করে, আপনি এখনও বেঁচে আছেন তাহ'লে? সে খুসী হয়ে বাঁশি বাঁজিয়ে ওঠে, হ্যাঁ, আমি আছি এখনও, আর এই দেখ সেই দামী জামাটা গায়ে রয়েছে। এগুলো পরে পরে ছিঁড়ে ফেলছি। জানি না এমনি করে আরও ক'টি ছিঁড়তে পারি।

আনন্দে বৃদ্ধার মনখানি দুলে ওঠে—সে এখনও বেঁচে আছে, মরতে পারেনি এখনও।

মা মুখখানি ফিরিয়ে হাসলো। শুনলো বৃদ্ধার কথা, বৌমা কোনো ভয় নেই,—ঘরে আমি রয়েছি, সব দেখব ঠিক।

সত্যি, বৃদ্ধার মৃত্যুতে তার অভাব বোধ করবে সে। তবু কী লাভ দুঃখ করে জীবন আসে, নির্দিষ্ট সময়ে চলে যায় আবার। এই বিধানের বিরুদ্ধে কিছু করা যায় না।

মা এখন তাই শান্তমনে পথ চলে।

॥ তিন ॥

ক্রমে যখন মাঠে সিমগাছগুলো ফুলে ফুলে ভরে উঠলো, বাতাসে ছড়াল সুমধুর গন্ধ। হলুদবরণ সরষে ফুলের রঙে সারা উপত্যকা প্লাবিত হল। এদিকে

মার কোলে চতুর্থ সন্তান এল। ছোট্ট সেই পল্লীটিতে শহর কিংবা বড় বড় গ্রামের মতো দাই নেই। মেয়েরাই প্রয়োজন হলে পরস্পরকে সাহায্য করে। কিছু খারাপ হলে, শিশুটি স্থানভ্রষ্ট হলে কিংবা প্রসবকালে কোন তরুণীর কাছে কোন কিছু অস্বাভাবিক বোধ হলে ঠাকুমারাই ইতিকর্তব্য-নির্দেশ দেয়। কিন্তু মার দেহের গঠন চমৎকার, বেশি বড়ও নয় ছোটও নয়, উরুর দিকটা একটু পুরু অথচ আলগা। তার বেলায় কোনদিন খারাপ হয়নি কিছুই। স্বাভাবিক সহজভাবেই সন্তান প্রসব করে সে। সন্তান নষ্ট হলেই সে দুঃখ বোধ করে মিছিমিছি কষ্ট পেল বলে। তাছাড়া, এ কষ্ট তার পক্ষে তেমন কিছুই নয়।

তার সময় উপস্থিত হলে সে ডাকে বড়-জাকে, আর জার প্রয়োজনের সময় সেও তাকে তেমনি সাহায্য করে।

বসন্তের স্নিগ্ধ বাতাসে মধুর দিনে সে বুঝলো তার সময় আসন্ন। সে মাঠ পেরিয়ে ঘরে ফিরে তার নিড়ানীটি রেখে দেয়। আসবার পথে খবর দিয়ে আসে বড়-জাকে। জামায় হাত দু'খানি মুছতে মুছতে ছুটে এলো বড়-জা। সে তখন পুকুরপাড়ে বসে কাপড় কাঁচছিল। সহৃদয়া, এই স্ত্রীলোকটি। মুখখানি গোলগাল—বাদামী রঙের; প্রশস্ত রক্তিম মুখমন্ডলের উপর ধারালো নাকটি। মুখরা স্ত্রীলোকটি সারা-দিন তার স্বামীর পাশে বসে বক্‌বক্‌ করে। চারদিক মাতিয়ে খিল খিল করে হাসতে হাসতে, ডাকাডাকি করে সে আসছিল, ওগো আমি তাই বলি—ভাগ্যিস্‌ আমাদের দু'জনের একই সময়ে হয় না। তোমার দিকে চেয়ে ভাবছিলাম কার আগে হবে—তোমার না আমার। কিন্তু এ বছর আমি বড় পিছিয়ে পড়েছি। তোমার প্রসবের সময় হলো, আর আমার সবে-মাত্র সুরু। স্বাভাবিক মোটা আর উঁচু গলায় সে কথাগুলো বললো। অন্য বাড়ি থেকে মেয়েরা শুনে খুসী হয়ে ডেকে জিগ্যেস করলো, সময় হলো তোমার বৌ! আশীর্বাদ করি একটি ছেলে হোক্‌। প্রগল্‌ভা একটি বিধবা দুঃখ করে বললো সোয়ামী যতদিন বেঁচে থাকে তার সদ্ব্যবহার করে নে। আমায় দেখনা, আমারও সন্তান-ধারণের ক্ষমতা ছিল ভালো, কিন্তু এখন আমার স্বামী নেই।

মা উত্তর দিল না কিছুই। তার ধূলিমলিন, স্বেদসিক্ত মুখখানি থেকে বেরিয়ে এলো ম্লান হাসি। ঘরে ঢুকলো সে। বৃদ্ধা বাজে বকতে বকতে উচ্চ হাস্যে তাকে অনুসরণ করলো। বললো, আমার যখন সময় হোত—আর তুমি তো জান বৌমা, ন'টি ছেলেমেয়ে হয়েছিল আমার; তারা সবাই মৃত্যু পর্যন্ত বেশ সুস্থ ছিল—আমি সর্বদাই বলতাম—

মা কর্ণপাত করলো না তার কথায়। ছোট একখানি বেঞ্চি নিয়ে সে নীরবে বসে রইলো। দু'হাতে মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিল রুক্ষ চুলগুলো। তার দু'খানি হাত ছিল ঘর্মাসিক্ত। এ স্বেদ মাঠে কাজ করার দরুণ নয়, এ হচ্ছে বেদনার অভিনব ঘর্ম। সে কোটের কোণাটি তুলে তার মুখখানি মুছলো, ঘন লম্বা চুলগুলো খুলে আবার নতুন করে বাঁধলো শক্তভাবে। বেদনা তীব্র হলো, নীরবে নুয়ে পড়ে অপেক্ষায় রইলো সে।

দরজায় বসে বৃদ্ধা অবিশ্রান্ত বকে যাচ্ছিল। বড়-জা ঠাট্টা করছিল তাকে। তাকে নুয়ে পড়তে দেখে সে দৌড়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দাঁড়ালো তার সাহায্যের জন্য। হঠাৎ দরজায় আঘাতের শব্দ হলো। সেই ছেলেটি! দিনের বেলা দরজা বন্ধ করা হয়েছে, আর তার মা ভিতরে রয়েছে দেখে ভয় পেয়ে সে কান্না শুরু করে দিয়েছে—দরজা খুলতেই হবে। মা বলল, ও ওখানেই থাক, একটু শান্তিতে কাজটা হয়ে যাক্। বড়-জা দরজার কাছে গিয়ে ফাঁকে মুখ রেখে বলল, তুমি ওখানে একটু দাঁড়াও, তোমার মা কাজ করছে। বৃদ্ধা প্রতিধ্বনি করলো, ওখানে থাক, লক্ষ্মী ভাইটি। তুমি যদি শান্ত হয়ে খেলতে থাক তোমায় বাদাম খেতে একটি পয়সা দেবো, আর একটু পরেই দেখবে তোমার মা তোমার জন্য কি আনবে।

দিনে ঘরের দরজা বন্ধ দেখে ভয় পেয়েছিল, ছেলেটি। সে তাই নিবৃত্ত হলো না। দাদাকে কাঁদতে দেখে মেয়েটিও গোঁঙাতে লাগলো। পথ হাতড়ে এসে সেও তার ছোট্ট মুঠি দিয়ে দরজায় আঘাত দিতে আরম্ভ করলো। যন্ত্রণায় রাগ হলো মার। যন্ত্রণার তীব্রতায় তার রাগ বাড়লো। তাই দরজা খুলে বেরিয়ে এসে মনের সুখে মারলো ছেলেটিকে। গর্জন করে বলল, তুই আমার জীবনটাকে ক্ষয় করে ফেলছিস্। কোন কথা শুনবি না তুই! আর ঠিক তোরই মতো আর একটা আসছে।

প্রহারের পর মুহূর্তেই কোমল হলো তার অন্তরখানি। রাগ পড়ে গেল। শান্তভাবে সে বলল, আসবি যদি একান্তই তো আয়, এখানে দেখবার কিছুই নেই। বড়-জাকে বলল, দরজাটি একটু খুলে রাখ। ওরা আমায় না দেখে থাকতে পারে না। এতে ওরা অভ্যস্ত নয় কিনা।

সে বসলো আবার, হাতের উপর মাথাটি রাখলো, বেদনার কাছে করলো আত্ম-সমর্পণ। ছেলেটি ভিতরে ঢুকে দর্শনীয় কিছু না দেখে, আর তার এ অন্যায়ের জন্য বড়-জা তার দিকে চোখ ডাগর করে চেয়ে আছে দেখে আবার বাইরে চলে গেল। ছোট্ট মেয়েটি কিন্তু মাটিতে বসে পড়লো মার পাশে; চোখের যন্ত্রণার উপশমের জন্য চোখ দু'টির ওপর মার হাত দু'খানি চেপে রাখলো।

এমনি করে ওরা রইলো অপেক্ষায়। মা বেদনায় নীরব, বৃদ্ধা ও বড়-জা পল্লীর নানা বিষয়ের আলোচনা করছিল। বলছিল, ঐ কোণার বাড়ির লোকটি কেমন করে তার সব কাজ ফেলে জুয়া খেলতে গেছে। ঘর থেকে কাণাকড়িটি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ায় সকালে স্বামী-স্ত্রীর তুমুল ঝগড়া হয়েছে। হতভাগিনী ঐ লোকটার উপযুক্ত নয়। স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর দরজায় বসে বিলাপ করে সে সকলকে জানিয়ে দিয়েছে তার দুঃখের কথা। বড়-জা বলল, ঐ লোকটি একদিনও একটি পয়সা ঘরে আনতে পারে না। বার বার সে হারে, আর তাইতো তার স্ত্রীর রাগ। একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মেঝে থুথু ফেলে বৃদ্ধা বলল, সুধু হেরে যাওয়াটা সত্যই দুঃখের। এক-একটা লোক এমন হয় যারা কোনদিন জেতে না। তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমাদের বাড়িতে কেউ এমন নয়। আমার ছেলে তো বরা-বর খেলায় জেতে।

তার কথা শেষ হবার আগেই মা চিৎকার করে উঠলো, মেয়েটির কাছ থেকে সরে গেল একটু দূরে, কোমরবন্ধটি ঢিলে করে দিয়ে বেঞ্চির উপর ঝুঁকে রইলো। বড়-জা দৌড়ে এলো, দু'হাতে ধরলো প্রতীক্ষিত শিশুটি।

এ শ্রান্তির পর মা বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগলো। মধুর এ বিশ্রাম।

অনেকক্ষণ ধরে সে নির্ভয়ে ঘুমালো। বড়-জা ছেলেটিকে ধুয়ে,

কাপড়ে জড়িয়ে রাখলো নিদ্রিতা প্রসূতির পাশে। শিশুর দুর্বল কান্না শুনে মা জেগে উঠলো না। বড়-জা বাড়ি ফিরে তার কাজে গেল। যাবার সময় বৃদ্ধাকে বলে গেল মার ঘুম ভাঙলে বড় ছেলেটিকে পাঠিয়ে তাকে যেন ডেকে আনা হয়।

ছেলেটি চিৎকার করতে করতে এলো, জান, আমাদের একটি ভাই হয়েছে? একটি পাত্রে খানিকটা "সুপ" ঢেলে নিয়ে ছেলেটিকে ঠাট্টা করে বড়-জা বলল, ছেলেটাকে আমিই তো আনলুম, আমি জানি না বুঝি?

একথায় একটু চিন্তিত হয়ে চাইলো ছেলেটি। বলল, তাহলে ওটা আমাদের নয় বুঝি? মেয়েরা সব হেসে উঠলো। বৃদ্ধা হাসলো উচ্চ হাসি—তার নাতিটি কেমন চালাক ভেবে। মা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে "সুপ" খেলো, মৃদুকণ্ঠে বড়-জাকে বলল, সত্যি দিদি, তোমার মনটি খুব ভালো। সে বলল, তুইও কি আমার জন্য এরকম করিস না?

দুজনে এমনি করে অনুভব করলো দু'জনের গভীরতর সৌহার্দ। এই সময়টা তাদের দু'জনেরই কাছে এমনই থাকবে—বার বার আসবে।

॥ চার ॥

কিন্তু তার স্বামী!

তার সময়ের পরিবর্তন নেই, নতুন আশা নেই—দিনের পর দিন। তার স্ত্রীর প্রিয় সন্তানদের আগমনও তার কাছে নতুন কিছু নয়। সে জানে—এরা জন্ম নিয়েছে একই ভাবে, এদের সকলকে খাওয়াতে-পরাতে হবে, বড় হলে একটির পর একটির বিয়ে দিতে হবে, আবার সন্তানের জন্ম হবে, প্রত্যেকটি দিনই কেটে যাবে এমনি বৈচিত্র্যহীনতায়।

এই ক্ষুদ্র পল্লীতে তারও জন্ম হয়েছিল অনুরূপ-ভাবেই। সুধু নদীর ধারে পাহাড়ের ঐ বাঁকের পিছনে ছোট্ট শহরটি ছাড়া নতুন কোন জিনিস সে জীবনে দেখেনি। সকালে ঘুম ভাঙলেই সে দেখে একই আকাশের তলে নীচু পাহাড়ের মণ্ডল। রাত্রি পর্যন্ত সে পরিশ্রম করে। রাত্রিতে পাহাড়-গুলো যখন আকাশের সঙ্গে একাকার হয়ে যায় তখন সে ফিরে যায় সেই

ঘরে যেখানে হয়েছে তার জন্ম। সে ঘুমোয় সেই বিছানায় যেখানে মা বাবার সঙ্গে সে ঘুমাতো যতদিন না তা দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে। তারপর তার শয্যা আলাদা করে দেওয়া হয়।

এখন সে তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে ঘুমায় সেই শয্যায়, আর তার বিছানার শোয় তার বৃদ্ধা মা। একই শয্যা, একই ঘর। ঘরে তার বিয়ের সময় কেনা দু'একটি ছোটখাটো আসবাব—একটি চায়ের বাটি, একখানি নতুন বিছানার চাদর, একটি নীল লেপ, নতুন মোমবাতিদানী ও দেয়ালে রাখা একটি কাগজের দেবমূর্তি ছাড়া নতুন বিশেষ কিছু নেই। মূর্তিটি ধনদেবতার—লাল নীল আর হলদে পোষাক পরা একটি প্রফুল্ল বৃদ্ধের প্রতিকৃতি। কিন্তু দেবতাটি এই গৃহে ঐশ্বর্য আনেনি। সে প্রায়ই তাকায় এই দেবতার দিকে, প্রায়ই তাকে মনে মনে অভিসম্পাত দেয়। মাটির দেয়ালের উপর থেকে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে চেয়ে আছেন চির-দৈন্য-ম্লান সেই কক্ষখানির দিকে।

মাঝে মাঝে ছুটির দিনে সে শহর ঘুরে আসে। বৃষ্টির দিনে ছোট্ট সরাই-খানায় গিয়ে নিষ্কর্মাদের সঙ্গে বসে খানিকক্ষণ জুয়া খেলবার পর বাড়িতে আসে তার সন্তানধারিণীর কাছে। তখন তার মনখানি আতঙ্কিত হয়। মার সন্তানদের খাওয়াবার জন্যই তাকে পরিশ্রম করতে হবে। আজীবন—সকালে উঠে শহরের প্রাচুর্যের মধ্যে পরিপুষ্ট এক জমিদারের কাছ থেকে খাজনা করা জমিতে যাওয়া, তার বাবারই মতো সারাদিন সেখানে ঠিক তেমনিভাবে দিন কাটানো, জমির সর্বোৎকৃষ্ট চালটা বিক্রীর জন্য তুলে রেখে বাড়ি ফিরে মোটা চালের ভাত খাওয়া, ঘুমানো, আবার পরের দিন শয্যাত্যাগ করা! এমন কি ঘরে-তোলা পাকা ফসলটাও তার নয়। জমিদারকে দিতে হবে এক-ভাগ আর একভাগ নেবে নিজে। তার উপর জমিদারের দালালের পাওনা দেওয়া চাই। তার গা জ্বালা করে জমিদারের দালালের কথা মনে হলেই। এই শহুরে লোকটি মিহি পশমের সুট পরে, মলিন হলেও সুন্দর তার গায়ের চামড়াটি। যে শহুরে লোকগুলো সামান্য কাজ করেও পেট পুরে খেতে পায়, ঠিক তাদেরই মতো ধীর, সুন্দর, তৈলাক্ত তার দৃষ্টি।

এসব চিন্তায় তার মন আকুল। বিমর্ষ হয়ে যায় সে। কোন অজুহাতে ভর্ৎসনা করা ছাড়া স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে না মোটেই; স্ত্রীর মেজাজ তার

উপর ক্ষিপ্ত হলে তার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে অনুভব করে এক হিংস্র আনন্দ। তাতে সে শান্ত হয় খানিকটা। তবে স্ত্রীরই হয় জিত। সন্তানের উপর যখন তার রাগ হয় সুধু তখন ছাড়া আর সর্বদাই মার রাগের মাত্রা স্বামীর চেয়ে বেশি। স্বামী কিন্তু তার মত বেশিক্ষণ রাগ করে বসে থাকতে পারে না, শ্রান্ত হয়ে অন্য কোন কাজ সুরু করে। ছেলে বা মেয়েকে মারলে বা ধমকালেই মা সবচেয়ে তাড়াতাড়ি রুষ্ট হয়। সে তা সইতে পারে না। ছেলেমেয়েকে উদ্ধার করবার জন্য দৌড়ে স্বামীর দিকে যায়। তার সন্তানের কোন দোষ নেই, দোষ স্বামীরই। স্ত্রীই ছেলেমেয়েকে তার সামনে এনে রেখেছে মনে করে স্বামীর রাগ হয় আরো বেশি। তখন তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়—ছুটির দিন, ভোজের দিন, আর শীতের কর্ম-হীন দিনগুলো যখন সে সুধু ঘুমিয়ে কিংবা আর ঘুমাতে না পেরে জুয়া খেলে কাটায়। ভাগ্যবান জুয়ারী সে। যা নেয় তার চেয়ে বেশি নিয়েই বাড়ি ফিরে। মনে হয়—সে যদি একা হোত আর কাউকে খাওয়াতে না হতো, তাহলে এই তো ছিল জীবন ধারণের সহজ উপায়। সে ভালবাসে জুয়ার সুযোগ, উত্তেজনা আর খেলার আনন্দ। খেলা দেখতে সবাই তার পাশে ভিড় করে আসে। সে এখনও তরুণ, বয়স মাত্র আটাশ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজ সে করে না। তার চপল আঙ্গুলগুলো লাঙ্গল ও নিড়ানীতেও শক্ত হয়ে যায়নি, ওর ভিতরেই লুকিয়ে আছে তার ভাগ্যদেবতা।

মা কখনও জানতে পারে নি তার সন্তানদের জন্মদাতার মনের লুকানো কথাটি। সে জানে—তার স্বমী খেলতে ভালবাসে। সে খেলায় সে হারে না, তাই তাতে মার কিছুই যায় আসেনা। সত্যিই? অপরাপর গৃহিনীরা অনুযোগ করে—তাদের স্বামীরা ফসল বিক্রীর সব কটি টাকা সরাইখানায় জুয়া খেলে হারিয়েছে। তখন তাকে অনুযোগ করতে হয়না। কেউ যদি তাকে ডেকে বলে, আমার হতভাগা মিন্‌সে যদি তোমার ওই চমৎকার লোকটির মতো হতো —আঙ্গুলগুলো হতো জাদু, আর জুয়োর টেবিলের টাকা ইচ্ছে করেই সেদিকে গড়িয়ে যেতো—সত্যি তোমার মতো সুখী আর কে আছে? তখন সে মৃদু হাসে মমতায়। দুজনের ঝগড়ার সময় ছাড়া কখনও সে তার স্বামীকে জুয়ো খেলবার জন্য খোঁটা দেয় না।

স্বামী তার মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থিরভাবে মাঠে কাজ করতে পারেনা। তবু, সে তার উপর দোষ আরোপ করেনা, উত্তেজনার মুহূর্তে কদাচিৎ তীক্ষ্ন রসনায় তাকে আক্রমণ করে। সে জানে—মেয়েদের মতো কাজ করতে পারেনা পুরুষেরা। শিশুর মতো চপল তাদের অন্তর। সে অচঞ্চল ভাবে কাজ করে যায়, আর তার স্বামী নিড়ানীটি রেখে দুই মাঠের মাঝখানে রাস্তার ঘাসের উপর শুয়ে দু'এক ঘণ্টা ঘুমোয়। স্বামীকে সে অন্তরে অন্তরে ভালবাসে। তবু কখনও স্বাভাবিক তিরস্কারের সুরে কোন কথা বললে স্বামী বলে, নিজের পেটের আন্দাজ কাজ করেছি, এখন আমি ঘুমোতে পারি বৈকি!

মা বলতে পারে, ছেলেপিলেরা তো রয়েছে! তাদের জন্যে আয় বাড়ানোর চেষ্টা দু'জনেরই যথাসাধ্য করা উচিত নয় কি? কিন্তু সে কথা বলে না। তার স্বামী সন্তানদের জন্য কিছুই করেনা। তাই তার মনে হয় ওরা সুধু তারই। তা'ছাড়া তার রসনা স্বামীর মতো তৎপর নয়।

সময় সময় তার তীব্র রাগ হয়। সাধারণ ভর্ৎসনার চেয়ে তিক্ত হয়ে তা আত্মপ্রকাশ করে। বছরে দু'একবার ঝগড়া তুমুল আকার ধারণ করে। মার রসনা অস্বাভাবিক কটু হয়ে ওঠে। স্বামী যখন বাজারে কপি আনতে গিয়ে সেই পয়সা দিয়ে বাজে জিনিস কিনে আনে, কিংবা উৎসবের দিন না হলেও মদ খায়, তখনই সে ক্রুদ্ধ হয়, ভুলে যায় এই লোকটিকে সে অন্তরে অন্তরে ভালবাসে। ভয়ংকর, তীব্র সেই ক্রোধ। ঘণ্টার পর ঘণ্টায়ও কিছুতেই রাগ পড়েনা। নিজের কাছে যা ভালো লাগেনা তা সহজে ভুলে যাওয়াই তার স্বামীর স্বভাব। তাই সে এরই মধ্যে ভুলে যায়—কি অন্যায় করেছে। কিন্তু এ ক্রোধ প্রতিরোধ করার শক্তি থাকেনা মার। তার রাগ ফেটে পড়ে।

শরতের এমন একটি দিনে আংগুলে একটি আঙটি পরে বাড়ি এসে সে বলল, আঙটিটি সোনার। দেখে মার রাগ হলো, চেঁচিয়ে উঠলো সে অদ্ভূতভাবে, জীবনের কোন দুঃখের ভাগী হবেনা, আর ঐ তোমার আংগুলে পরবার জন্য আঙটি কিনে সব টাকা নষ্ট করে আসবে। আমাদের মতো গরীব, কোন্ ভাল লোকটা আঙটি পরে? বড়লোকেরা পড়ুক, তাতে কেউ কিছু বলবেনা, কিন্তু গরীবের আঙটি পরার কি কোন মানে হয়? সোনা!

তামার পয়সা দিয়ে সোনার আঙটি কেনা যায়—একথা কেউ কোনদিন শুনেছে?

কথা শুনে শিশুর মতো বিদ্রোহী হয়ে উঠলো স্বামীর মুখখানি, ফুলে উঠলো তার লাল ঠোঁট দুটি। চিৎকার করে বলল, আমি বলছি, এ সোনার। যার কাছ থেকে এটা কিনেছি সে বলেছে আঙটিটি কোন বড়লোকের বাড়ি থেকে চুরি করে আনা। আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, সে তার কোটের ভেতর থেকে তুলে গোপনে আমায় আঙটিটি দেখাল।

নাক সিট্‌কে মা বলল, হুঁ, লোকটা টের পেয়েছিল এই গেঁয়ো ভূতটাকে সহজে ঠকানো যাবে। আর যদি সোনারও বা হয়, শহরে তোমার হাতে আঙটি দেখে লোকে তোমায় পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে জেলে পুরবে। তখন আমরা এমন সওদা-ই-বা কেমন করে করবো, জেলে তোমায় খাওয়াবোই বা কেমন করে—? দাও, আঙটিটি সোনা কিনা পরীক্ষা করে দেখি।

সে তার স্ত্রীকে আঙটি দিলনা। শিশুসুলভ গাম্ভীর্যের সঙ্গে ঘাড় নাড়তে লাগলো। তার এ ব্যবহার সহ্য হলোনা মার। সে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার সুন্দর মুখখানিতে আঁচড় কাটলো, তাকে মারলো মনের সুখে। হতবুদ্ধি হয়ে সে তার স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইলো। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অথচ একটু ভয়ে ভয়ে আঙটিটি খুলে নিয়ে বলল, এই নাও। আমার বুঝতে বাকী নেই তোমার জন্য না কিনে আমার জন্য আঙটি কিনেছি বলেই তোমার এত রাগ।

তাতে মার রাগ আরো বাড়লো। আশ্চর্য! তার স্বামী একেবারে তার মনের কথাটিই বলল কেমন করে? তার গোপন দুঃখ—অন্যান্য স্ত্রীলোকদের স্বামীর মতো তার স্বামী তার জন্য একজোড়া কানের দুল বা আঙটি আনেনি কোনদিন। এই আঙটিটি দেখে সে বেদনা উথলে উঠ্‌লো। সে স্বামীর দিকে চাইলো। নিজের ও মার এই কঠোর জীবনের জন্য বেদনায় রুদ্ধকণ্ঠে স্বামী বলল, আমার জন্য সামান্য একটি জিনিস নিলেও তোমার ঈর্ষা হয়। আমাদের সর্বস্ব তোমার ওই বাচ্চা পোষবার জন্যই খরচ করতে হবে। বিছানায় শুয়ে স্ত্রীকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে কাঁদতে লাগলো।

বৃদ্ধা মা তাদের তুমুল ঝগড়া শুনে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ছেলেকে

মিষ্ট কথায় তুষ্ট করতে লাগলো, উগ্র দৃষ্টিপাত করলো তার প্রিয়পাত্রী পুত্র-বধূর দিকে। বাবাকে কাঁদতে দেখে ছেলে ও মেয়েটা কান্না সুরু করলো। ভাবলো—তাদের মা বাবাকে ব্যথা দিয়েছে।

তবু, মা শান্ত হলোনা। আঙটিটি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেছিল তার স্বামী। সে সেটি তুলে নিয়ে দাঁতে চিবোতে লাগলো। স্বামীর কথা মতো যদি জিনিসটা সোনারই হয়, বিক্রি করে বেশ কিছু লাভ করা যাবে। চোরাই মাল সত্যিই সস্তায় বিক্রী হয়, তবে হয়তো তার স্বামী যেমন বলছে তেমন সস্তায় নয়! মার ভয়ে সে মিথ্যে বলছে। কিন্তু খানিকক্ষণ চিবোবার পরও জিনিসটা নরম হলোনা। তাই সে রাগে চেঁচিয়ে উঠলো, এই দেখ, সোনা হলে কি একটু নরমও হতোনা? এ পেতল—শক্ত! থু থু করে মুখের ভেতর থেকে সেই হলদে মেকী সোনাটি বার করে একবার বিস্ময়ে সে তাকিয়ে বলল, দেখ, এ সোনার জলে ডোবানোই হয়নি!

মা সহ্য করতে পারলোনা—তার স্বামী এমনিভাবে শিশুর মতো প্রতারিত হবে; মনটাকে শক্ত করে সে মাঠে কাজ করতে গেল বৃদ্ধা তখনও কম্পিতকণ্ঠে বলে চলেছে—আমার যখন যৌবন ছিল, তখন আমি আমার স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখতাম। স্ত্রীর কর্তব্য এমনি সব সামান্য ব্যাপারে নজর না দিয়ে স্বামীকে সন্তুষ্ট থাকতে দেওয়া।

নাঃ, মা তার এ রাগ কিছুতেই পড়তে দেবেনা। কিছুক্ষণ মাঠে কাজ করার পর শরতের স্নিগ্ধ সমীর তার রুষ্ট অন্তরখানি ছুঁয়ে বয়ে গেল, অজ্ঞাতে তাকে করে দিল শান্ত। শূন্যে ভাসমান পত্র আর গ্রীষ্মের হরিৎবর্ণহীন পিঙ্গল শৈলপার্শ্ব, ধূসর আকাশ, দক্ষিণাভিমুখী উড্ডীয়মান বন্য রাজহংসের কলকণ্ঠ, স্থির শস্যক্ষেত্রও মুমূর্ষু বৎসরের মৌন বেদনা সংগোপনে তার অন্তরে প্রবেশ করে, তাকে আবার মহিমাময়ী করে তুললো। নরম সুকর্ষিত ভূমিতে শীতের গম ছড়াতে ছড়াতে শান্ত হলো তার মনখানি। মনে পড়লো —সে তার স্বামীকে ভালবাসে। তার সহাস্য মুখখানি ভেসে উঠলো চোখের সামনে, সে হলো চঞ্চল। মনে মনে দুঃখ করে বলল, আজ তার জন্য ভাল খাবার তৈরী করবো, সামান্য ক'টি টাকা খরচ করেছে বলে আমার এমনি রাগ করা উচিত হয়নি। বাড়ি ফিরে রান্না চড়িয়ে দিয়ে স্বামীকে

তার এ পরিবর্তন দেখাবার জন্য সে তাড়াতাড়ি করতে লাগলো। ফিরে এসে দেখলো, স্বামী তখনও মুখখানি গুঁজে নীরবে বিছানায় পড়ে আছে। খাবার তৈরী করে স্বামীর তরকারীতে মিশাবার জন্য পুকুর থেকে ক'টা চিংড়ি মাছ ধরে এনে সে স্বামীকে ডাকলো, কিন্তু সে উঠলোনা। সে খাবেইনা। পীড়িতের মতো দুর্বলভাবে বলল, সত্যিই আমি খেতে পারছিনা, আমার আত্মাটিকে অভিসম্পাত দিয়ে শরীর থেকে বের করে দিয়েছ তুমি।

দ্বিরুক্তি না করে মা এক পাশে রেকাবীটি রাখলো, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে আবার নীরবে কাজ করতে লাগলা। বৃদ্ধা মা যখন তার ছেলেকে খেতে সাধাসাধি করলো তখন মা তার সঙ্গে গেলনা। সে তাকে সাধতে পারলোনা। রাগ বেড়ে গেল নতুন করে। তার পেছন পেছন এলো ক্ষুধার্ত কুকুরটি। সে হেঁসেলে ঢুকলো। সেখানেই ছিল তার স্বামীর খাবারের পাত্রটি। হাতখানি বার করে সে অস্পষ্টভাবে বলল, বেশ, কুকুরটাকেই দেব তা'হলে! কিন্তু পারলোনা। হাজার হোক, এ যে তার স্বামীর খাবার, এভাবে নষ্ট করা যায়না এটা। মা দেয়ালের "তাক"-এ তুলে রাখলো খাবারের "ডিস্"টা। দুটো ঠান্ডা ভাত তুলে নিয়ে কুকুরকে দিল। বুঝলো, তখনও রাগের উপশম হয়নি তার।

রাত্রিতে সে স্বামীর পাশে শয্যা গ্রহণ করলো। ছেলেরা অন্ধকারে জড়িয়ে রইলো তাকে। সে অনুভব করলো—ওপাশে রয়েছে তার স্বামী। তার রাগ ছেড়ে গেল সম্পূর্ণভাবে। মনে হলো এই লোকটিও শিশুদের মতো, পরিবারের আর সবার মতো তারই উপর নির্ভরশীল। ভোরে সে উঠলো শান্ত ধীরভাবে। স্বামীকে ছাড়া আর সকলকে খাইয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে খেতে অনুরোধ করলো। স্ত্রীর অনুনয়ে স্বামী রুগ্নের মতো শয্যা ছেড়ে খাবার মুখে নিল, তারপর আস্তে আস্তে সব খাবারটা নিঃশেষ করলো। বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে অর্থহীনভাবে বকতে বকতে তার খাওয়া দেখছিল।

সেদিন সে কাজে বেরলনা। মা মাঠে যাবার জন্য বেরিয়ে এলো। স্বামী এক-খানি বেঞ্চির উপর রোদে বসলো। দুর্বলভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, আজ শরীরটা বড় খারাপ হয়েছে, বুকটা ব্যথা করছে, আজ একটু বিশ্রাম করবো।

মা বুঝলো স্বামীকে এমনিভাবে অভিযুক্ত করে সে ভুল করেছে। নিজের কোপনতার জন্য দুঃখিত হয়ে স্বমীকে শান্ত করবারই উদ্দেশ্যে বলল, আজ তা'হলে বিশ্রাম কর।

মা কাজে চলে গেল। স্বামী অধৈর্য হয়ে উঠলো, শ্রান্ত হলো বৃদ্ধার প্যান্‌প্যানানিতে। ঘরে বসে বৃদ্ধা মার সেই একঘেয়ে কথা শোনা আর শিশুদের খেলা দেখা ছেলের পক্ষে ক্লান্তিকর হলেও ছেলে সারাদিন ঘরে থাকবে, আর তার সঙ্গে বসে বসে আলাপ করা যাবে ভেবে খুসী হয়েছিল বুড়ী।

লোকটি উঠলো। ভাবলে এক পেয়ালা গরম চা খেলেই ভালো হতো। তাই সে বাইরে এসে রাস্তার ধারে তার পিসতুতো ভায়ের সরাইখানায় গেল। সেখানে বসে ক'জন লোক চা খাচ্ছিল ও গল্প-গুজব করছিল। রাস্তার উপর যেদিক দিয়ে পথিকেরা চলে, সেদিকে একটি সামিয়ানার নিচে টেবিল সাজানো ছিল। সেখানে বসে ভ্রমণকারীরা বিচিত্র গল্প বলে, কখনও বা কেউ তার কাহিনী শোনায়, সরাইখানাটি আনন্দ কলরবে মুখর হয়ে ওঠে। তার পিসতুতো ভাই ধীর গম্ভীর প্রকৃতির লোক। পথে দেখা হলো তার সঙ্গে। সকাল থেকে একটানা কাজ করে সে তখন বাড়িতে খেতে যাচ্ছিল। সে তাকে জিগ্যেস করলো, কাজে না গিয়ে কোথায় চলেছ? ক্ষীণকণ্ঠে অনুযোগের সুরে সে বলল, একটি সামান্য ব্যাপারের জন্য, কেন জানিনা আমার স্ত্রী আমায় অভিসম্পাত দিল। তাকে সন্তুষ্ট করাই দায়। সে আমায় এমন অভিসম্পাত দিল যে রাত্তিরেই আমার সত্যি-সত্যিই অসুখ করেছে। ভয় পেয়ে ও নিজে থেকে আমায় বিশ্রাম করতে বলে গেছে, পেটটার আরামের জন্য আমি এক পেয়ালা চা খেতে যাচ্ছি।

সে থু-থু ফেলে চলে গেল বিনা বাক্য-ব্যয়ে। অপ্রয়োজনে বাক্যব্যয় না করে মনের কথা মনে রেখে দেওয়াই তার স্বভাব।

সে জীবনে অধীর হয়ে উঠেছে। মনে হলো—বার্ধক্য ও মৃত্যু পর্যন্ত নতুন কিছু হবেনা, এমনি করেই ঘুরবে দিনের চাকা—বছরের পর বছর। অসহ্য এ অবস্থা! এ জীবনে তার আরো কষ্টকর বোধ হলো যখন সেই রাস্তার ওপারে সরাইখানাটিতে যে-ক'জন ভ্রমণকারী এসেছিল তারা সবাই বলল—

পর্বতচক্রের ওপারে, অদূরপ্রবাহিত নদীর মোহনায় অদ্ভুত সব জিনিসের কথা। তারা বলল, সেখানে নদী মিশেছে সাগরের সঙ্গে সেখানে বিশাল একটি নগরী রয়েছে। সেখানে নানা-বর্ণের লোক বাস করে, টাকা মেলে সহজে, সেখানে জুয়াখেলার ঘর আছে—প্রত্যেক ঘরে আছে সুন্দরী গায়িকা, পাড়াগাঁয়ে কেউ তেমন মেয়ে দেখেনি, দেখবার কল্পনাও করতে পারেনা। সেই শহরে কত বিচিত্র দর্শনীয় স্থান—গোলাবাড়ির মেঝের মতো পালিশ করা রাস্তা, কত রকমের শকট, পাহাড়ের মতো উঁচু বাড়ি, সাগরপার থেকে জাহাজে বয়ে আনা পণ্যদ্রব্যে ভর্তি দোকান! দেখতে দেখতে একটি জীবন কেটে যাবে, তবু দেখা শেষ হবেনা। প্রচুর উপাদেয় খাবার রয়েছে সেখানে-- সাগরের মাছ, সাগরের জন্তুর মাংস। খাওয়া-দাওয়ার পর বিশাল প্রমোদ-গৃহে যাওয়া যায়। সেখানে কত রকমের খেলা, রকমারি চিত্র—কোনটি দেখে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়, আবার কোনটি ভীষণাকার, কোনটি বুঝতে বুদ্ধি খাটাতে হয়, কোনটি বা জঘন্য। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের জিনিস হচ্ছে—সেই বিরাট শহরের রাত্রি এক রকম প্রদীপের আলোয় দিনের মতো আলোকিত থাকে। হাত দিয়ে জ্বালানো হয়না সেই আলো, আগুন দিয়েও নয়। স্বর্গ থেকে ধরে আনা এক রকম আসল আলোয় সেই আলো জ্বলে। সময় সময় এমনি এক-একজন ভ্রমণকারীর সঙ্গে কিছুক্ষণ সে খেলে। খেলতে খেলতে ভ্রমণকারী ছোট্ট এই পল্লীতে এমন নিপুণ খেলোয়াড় দেখে বলে, সাবাস, তুমি সত্যিই শহুরেদের মতো খেল। শহরের যে-কোন প্রমোদ-গৃহে খেলতে পারবে তুমি।

সে হাসে একথা শুনে। সাগ্রহে জিগ্যেস করে, সত্যিই আমি খেলতে পারবো সেখানে? অহংকার ও আশায় মনে মনে ভাবে সত্যি, এই ছোট্ট জায়গাটিতে আমার সঙ্গে খেলতে সাহস করে এমন কোন লোক নেই। শহরেও আমার মতো খেলোয়াড়ের জিত হবেই।

ভবতেই সর্বাগ্রে জাগে এই নগণ্য মাঠে কাটানো জীবন ফেলে যাবার প্রবল ইচ্ছা। কোদাল যখন মাটির উপর পড়ে আর ওঠে, তখন সে নিজেকে বলে, এই আমি—তরুণ, রূপবান। আমার আঙ্গুলগুলোতে রয়েছে সৌভাগ্য। কুয়োর মাছের মতো এখানে পড়ে রয়েছি আমি। সুধু দেখি—মাথার

ওপরে এই গোলাকার আকাশ, সেই একই বৃষ্টি, একই রৌদ্র। বাড়িতে রয়েছে সেই একই স্ত্রী আর একটির পর একটি সন্তান—সবাই সমান কাঁদুনে, প্যান্‌পিনে। সবাই চায় খেতে। তাদের খাওয়াবার জন্য আমার এই সুগঠিত দেহ কেন আমি অস্থিচর্মসার করবো, এ জীবনে সন্ধান করবোনা নিজের সুখের।

সে জানে—এজন্য তার স্ত্রীর দোষ না দিয়ে বরং প্রশংসাই করতে হয় তাকে। সে বলতে পারতো—যদি সে বন্ধ্যা হোত, দোষ দিতে পারতো—যদি প্রতি বছর যথাসময়ে সন্তান, আর বেশির ভাগই পুত্রসন্তান না হোত তার। তবু, শেষের সন্তানটি হবার পরে এত সহজে, এত তাড়াতাড়ি তার গর্ভসঞ্চার হলো। তাই সে বিমর্ষ হলো, তার রাগ হলো স্ত্রীর উপর।

সত্যিই, এ তার অন্যায়। কিন্তু এখন আর সে ন্যায়ের ধার ধারেনা। ধরতে গেলে এখনও সে শিশু, স্ত্রীর চেয়ে বয়সে দু'বছরের ছোট। তবে, এ অঞ্চলের রীতি এই। স্ত্রীর চেয়ে স্বামীর বয়স কম হওয়াটাই এখানে উপযুক্ত বিবেচিত হয়। তার অন্তর তেতে ওঠলো। সে সন্তানের পিতা। তাতে কি যায় আসে? বহু দূরে নগরীর বিচিত্র দৃশ্য ও অলস আনন্দ উপভোগের মদির স্বপ্নে সে বিভোর হয়ে ওঠে।

জীবনের তৃপ্তি সুধা-পানের জন্যই বিধাতা সৃষ্টি করেছেন তাকে। সুন্দর গঠন তার। লম্বা নয়, কিন্তু বেশ শক্ত অথচ কমনীয়। অস্থিগুলো সরু ও সুদৃশ্য। মুখখানিও অপূর্ব-শ্রীমন্ডিত, চোখ দুটি উজ্জ্বল নিকষ কালো। কোন কারণে বিমর্ষ না হলে সে হাসে অফুরন্ত হাসি, উপযুক্ত সঙ্গী পেলে সর্বদা একটা-না-একটা নতুন ধরণের গান গাইতে পারে। জোরালো, রসাল তার কণ্ঠস্বর। তুচ্ছ একটি কাহিনীকে সে গ্রামবাসীদের মনোমত হাস্যকর করে বলতে পারে। সংগীত ও হাস্যকৌতুকে সমবেত জনতাকে যুগপৎ হাসাতে পারে। স্ত্রী-পুরুষ সবাই বেশ ভালবাসে তাকে। তাদের হাসি শুনে নিজের অসাধারণ শক্তির কথা ভেবে পুলকে দুলে ওঠে তার অন্তর। বাড়ি ফিরে আবার তার স্ত্রীর গম্ভীর মুখ ও বলিষ্ঠ দেহখানি দেখে মনে হয়—একমাত্র সে-ই জানেনা সে কেমন চমৎকার লোক। সুধু সে-ই কোনদিন তার প্রশংসা করেনা। তবে, সে বাড়িতে কোন

কৌতুক-রসিকতা করেনা। নিজের সন্তানদের কাছে-ও প্রফুল্ল ভাব দেখায়না। সে যেন বাইরের লোকেদের জন্য। যারা তার নিজের নয় তাদের জন্যই সে সঞ্চিত করে রেখেছে তার সব রসিকতা, পুলকভরা মধুর দৃষ্টি। তার স্ত্রী তা জানে। অপর স্ত্রীলোকেরা যখন তাকে বলে, তোমার স্বামীর কণ্ঠস্বর ঠিক অভিনয়ের মতো সুন্দর, আর তার সেই ক্ষিপ্র, আনন্দ-দৃষ্টি—তখন তার মনখানি ক্রোধে ও বেদনায় ভরে ওঠে। শান্তভাবে উত্তর দেয়, হ্যাঁ, ও সত্যিই খুব আমুদে! মনের ব্যথা লুকোবার জন্য প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তাকেই যে সে ভালবাসে অন্তরের অন্তরে। সে জানে—তার স্বামী যখন তার কাছে থাকে তখন সে প্রফুল্ল থাকেনা।

সেবার নতুন গ্রীষ্মে মা যখন চতুর্থ সন্তান ধারণ করলো তখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক অপ্রত্যাশিত তুমুল ঝগড়া হলো। এর আগে কোনদিন এমন হয়নি।

বছরের ষষ্ঠ মাস। গ্রীষ্মের নতুন দিন। যে—কোন লোকের মন নবীন আনন্দ-স্বপ্নে বিভোর হয় এমনি দিনে, আর সারাটি সকালে সে বসে বসে স্বপ্ন দেখে। বাতাস ছিল ক্লান্ত, ঈষদুষ্ণ, তৃণপত্র নব হরিৎ-বর্ণরঞ্জিত, আকাশ উজ্জ্বল ঘন নীল। স্বামী কোন কাজ করতে পারলোনা, ঘুমোতেও পারলোনা। এমন সজীব দিনে কি ঘুমোনো যায়? প্রচণ্ড গ্রীষ্ম আসেনি তখনও। বিহগকুল অবিশ্রান্ত কলবর কুজন করছিল। সুমধুর বাতাস থেকে পাহাড়ের উপর থেকে বিকশিত হলদে রঙের লিলি ও বুনো ফুলের মিশ্রিত গন্ধ বয়ে আনছিল।

আকাশের বুকেও বাতাস বইলো, সঞ্চালিত হলো বরফের মতো শাদা পুঞ্জীত মেঘগুলো, মেঘের দল গেল ভেসে, পাহাড়-উপত্যকা আলোকে-আঁধারে হলো অভূতপূর্ব সুস্পষ্ট।—ক্ষণিক আলো, ক্ষণিক ছায়া—সারাদিন অবিশ্রান্ত। চিত্ত মাত্রেরই চমৎকারী এমন মধুর দিন কাজের উপযুক্ত নয়। এমনি উজ্জ্বল দিনের মধ্যাহ্নে গ্রামাঞ্চলে গরমের কাপড় বিক্রি করতে এলো এক ফিরিওলা। তার কাঁধে নানা রঙের কাপড়—কোনটি বা ফুলকাটা। যেতে যেতে সে হাঁকছিল—কাপড়—ভাল কাপড় চাই!

উইলো গাছের ছায়াতে বসে স্বামী-স্ত্রী, বৃদ্ধা মা ও শিশুরা মধ্যাহ্ন-ভোজনে

রত ছিল। লোকটি সেখানে এসে দাঁড়ালো। জিগ্যেস করলো, কাপড় দেখাবো, মা? মা উত্তর দিল, আমার এই ছোট ছেলেটির জন্য সাধারণ একগজ কাপড় ছাড়া আর কিছু কেনার পয়সা আমাদের নেই। গরীব চাষী আমরা, নতুন কিংবা লজ্জানিবারণের পক্ষে যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি কাপড় কেনার সামর্থ আমাদের কোথায়?

সবতাতেই মন্তব্য করা বৃদ্ধার স্বভাব। সে বলল কর্কশ কণ্ঠে, হ্যাঁ—বৌমা আমার ঠিকই বলেছে। আজকালকার কাপড়গুলো একেবারে বাজে। দু'একবার কাচলেই—ব্যাস্—ন্যাকড়া হয়ে গেল। আমার মনে আছে—আমার ঠাকুমার কোট আমি গায়ে দিয়েছি। সুধু তা নয়, আমার বিয়ের সময় পর্যন্ত সেটি বেশ ভালো ছিল। মান রক্ষার জন্যই আমার নতুন পোষাক করে দিতে হয়েছিল। সেটি তখনও বেশ মজবুত ছিল। জিনিসগুলো এখন এত খারাপ, এত হালকা যে—

বিক্রির লোভে কাছে এলো ফিরিওলা। আর আর ফিরিওলাদেরই মতো লোকটি অতি ভদ্র ও ঠাণ্ডা মেজাজে। বৃদ্ধাকে সে উপহাস করলোনা। বলল, বুড়ী মা, সেই পুরানো কালের কাপড়ের মতো একটি কাপড় আমার কাছে আছে। কাপড়টা বেশ মানান সই হবে তোমার নাতির পক্ষে। ও-গাঁয়ের এক ধনী মহিলা তাঁর একমাত্র ছেলের জন্য নিয়েছেন, তার খানিকটা রয়েছে। থান থেকে টুকরো কেটে রাখা হচ্ছে বলে আমি তাঁর কাছে থেকে ন্যায্য দামই নিয়েছি। মাকে বলল, তোমার কোলের ঐ ছেলেটির জন্য এই থান—কাটা টুকরোটুকুর আর দাম দিতে হবেনা।

বেশ মোলায়েম ভাবে কথাটি বলে ফিরিওলা তার গাঁট থেকে এক নিশ্বাসে বার করলো—সবুজ জমির উপর লাল ফুলকাটা একটি কাপড়।

আনন্দে চিৎকার করে উঠলো বৃদ্ধা। তার ক্ষীণদৃষ্টিতে সে পরিষ্কার চকচকে রঙ দেখতে পাচ্ছিল। দেখেই কাপড়টি পছন্দ হয়ে গেল মার। সে তাকালো কোলের শিশুটির দিকে। পেটের উপর একখানি ছেঁড়া ন্যাকড়া ছাড়া তার সর্বাঙ্গ নগ্ন। হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর শিশুটি। তিনটির মধ্যে এই সব চেয়ে বেশি সুন্দর—ঠিক তার বাবার মতো। এই ফুলকাটা কাপড়-খানিতে চমৎকার মানাবে তাকে। দুর্বল হলো তার চিত্তখানি। অনিচ্ছা

সত্ত্বেও জিগ্যেস করলো, কাপড়টির কত দাম? কিনতে পারবোনা, তবু—। ছেলেমেয়েদের আর এই বৃদ্ধার ভরণপোষণ করবার, জমিদারের খাজানা দেবার সামর্থ-ও আমাদের নেই। ধনী মহিলারা যে জিনিস তাঁদের একমাত্র ছেলেকে পরান সে—জিনিস আমরা কিনতে পারবো কেন?

একথায় বৃদ্ধাকে দুঃখিত দেখালো। ছোট মেয়েটি ছুটে এসে কাপড়খানি তার ঝাপসা চোখের কাছে এনে দেখতে লাগলো। সুধু বড় ছেলেটি নির্বিকারভাবে বসে খাচ্ছিল। গৃহস্বামী অলসভাবে বসে গুণ গুণ করে গান করছিল। শিশুর জন্য একটি কাপড় কেনা হচ্ছে; তাতে তার মাথা ঘামাবার কি দরকার?

সুর নিচু করে খোসামুদ করতে লাগলো ফিরিওলা। শিশুর কাছে ধরলো সে কাপড়খানা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে—পাছে তাতে ময়লা লেগে যায় অথচ না কেনা হয়? ফিস্ ফিস্ করে বলল, এমন কাপড়—এমনি মজবুত—এমনি রঙ—আমার হাত দিয়ে অনেক গেছে, কিন্তু এর মত কোনটি নয়। আমার নিজের যদি ছেলে থাকতো, তা'হলে আমি এর একটি টুকরো তার জন্য রেখে দিতুম। কিন্তু আমার তো ঐ এক বন্ধ্যা স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। কাপড়টা রেখে মিছিমিছি নষ্ট করবো কেন?

বৃদ্ধা শুনলো। তার স্ত্রী বন্ধ্যা শুনে মন গলে গেল। বলল, সত্যই বড় দুঃখের কথা—। তোমার মতো এমনি একটি সৎ লোক! আবার বিয়ে করে দেখ্‌ছনা কেন? আমি সবাইকে বলি—দোষটা নিজেরই কিনা জানবার আগে পুরুষের অন্তত তিনজন স্ত্রীলোককে পরীক্ষা করা উচিত।

মা শুনতে পেলোনা তা। সে বসে বসে ভাবছিল। মন স্থির করতে পারছিলনা কিছুতেই। অন্তরখানি আরও দুর্বল হলো যখন সে শিশুটির পানে তাকালো। চমৎকার এই নতুন কাপড়টি সোনার বরণ দেহচর্ম ও রক্তিম গণ্ডদ্বয়ের ওপর অপরূপ দেখালো। সে হার মানলো। জিগ্যেস করলো, এর দাম কত? বেশি টাকা তো দিতে পারবোনা!

একটা দাম বলল ফিরিওলা। খুব বেশি নয়, সে যতটা ভয় করেছিল অন্তত তেমন নয়। গোপনে দুলে উঠলো তার বুকখানি। তবু ঘাড় নেড়ে গভীরভাবে বলল তার অর্ধেক দাম। এমনি দরকষাকষি এ-অঞ্চলে হয়েই

থাকে। দরটা এত কম যে ফিরিওলা তাড়াতাড়ি কাপড়টি যথাস্থানে রেখে চলে যাবার ভাণ করলো। মা তার সুন্দর শিশুটির কথা ভেবে দামটা আর একটু বাড়ালো। অনেক দরকষাকষির পর এক-একবার চলে যাবার ভাণ করে অবশেষে কাপড়ের গাঁটটি মাটিতে রেখে ফিরিওলা কাপড়টি টেনে বার করলো। যে দাম সে চেয়েছিল তার চেয়ে কিছু কম দামে কাপড়টা দিতে রাজী হলো সে। মা মাটির দেয়ালের ভেতর থেকে টাকা বার করে আনতে গেল।

অলসভাবে বসে আপন মনে গান করছিল তার স্বামী। তার উচ্চ কণ্ঠ নীচু ও কোমল হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে সে চুমুক দিয়ে গরম জল পান করছিল। খাওয়ার পর এমনি গরম জল পান করা তার অভ্যাস। এই কেনা-বেচায় সে কোন অংশ গ্রহণ করছিলনা। ফিরিওলা চতুর। প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করা চাই তার। অসতর্কভাবেই যেন সে ঘাস-কাপড়খানি খুললো। বুনো শণের সুতোয় তৈরী কাপড়টি গরমের দিনে শরীর ঠাণ্ডা রাখে। ঠিক আকাশের মতো রঙ—যেমন পরিষ্কার, তেমনি নীল। ফিরিওলা একবার গোপনে দেখে নিল কাপড়টির উপর লোকটার দৃষ্টি পড়লো কিনা। অনুচ্চ হাসির সঙ্গে জিগ্যেস করলো, এবারকার গরমের দিনের জন্য জামা তৈরী করেছেন কি? যদি না করে থাকেন তো আমার কাছে রয়েছে—আর এমনি সস্তা দাম—আমি হলপ করে বলতে পারি—শহরেও পাবেন না।

কত জনপদ, মহানগরের উপর দিয়ে চলে ফিরিওলা। লোকের মুখ চেনাই তার ব্যবসা। দেখেই সে চিনিছে—এ লোকটি আরামপ্রিয়। সে যেন শিল্পী, অপরিচিত পরিবেশে এসে পেঁাছেছে। দয়া ও সমবেদনার সঙ্গেই যেন সে বললো সত্যিই অত্যন্ত কষ্টের জীবন আপনার, সামান্য আয়—। দেখেই বোঝা যায় আপনার জীবন কত কঠোর। তা আপনি যদি একটি নতুন জামা তৈরী করান, তা'হলে দেখবেন নতুন একটি ফলপ্রদ দাওয়াইর মতো আনন্দে ভরে উঠবে আপনার মনখানি। গরমের দিনের জন্য নতুন জামা তৈরী করার মতো মন খুসী করবার জিনিস আর কিছু নেই। আঙ্গুলের আঙটিটা একটু পরিষ্কার করিয়ে চুলে একটু তেল মেখে

আঁচড়ে এই নতুন পোষাকটি পরল, আমি জোর করে বলতে পারি—আপনার চেয়ে সুপুরুষ সারা শহরে খুঁজে পাওয়া যাবেনা আর একটিও।

লোকটি খুসী হলো এ কথায়। হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো নির্বোধের মতো। নিজেকে মনে পড়লো তার। বললো, হ্যাঁ, একটি নতুন জামা তৈরী করবোনা কেন? একটির পর একটি অপোগণ্ড ছাড়া ভবিষ্যতে আর তো কিছুই দেখতে পাইনে। চিরদিন কি তা'হলে সেই ছেঁড়া, পুরানো ন্যাকড়া পরেই থাকবো? ঝুঁকে পড়ে আঙ্গুল দিয়ে সে কাপড়খানি দেখতে লাগলো। উৎসাহ ও উত্তেজনায় আকুল হয়ে তার মা বললো, দেখ্ বাবা, খুব চমৎকার কাপড়টি। জামা তৈরী করতে হয় তো এটি দিয়েই কর্। কেমন সুন্দর নীল এই কাপড়খানি! আমার মনে পড়ে—তোর বাবারও এমন একটি জামা ছিল। আমাদের বিয়ের সময়েই কি? নাঃ—আমাদের বিয়ে হয়েছিল শীতের সময়ে। বিয়ের সময়ে আমি এমন হেঁচেছিলাম যে কনেকে এমনি হাঁচতে দেখে সবাই হেসে গড়াগড়ি দিয়েছিল।

লোকটি কর্কশকণ্ঠে জিগ্যেস করলো, একটি জামার কাপড়ের দাম কত হবে? দাম বললো ফিরিওলা। ঠিক সেই সময়ে মা টাকা নিয়ে এসে শেষ কড়িটি পর্যন্ত গুণে দিতে দিতে চকিতভাবে বললো, আর টাকা খরচ করার উপায় নেই!

একথায় স্বামীর জেদ তীব্রতর হলো। জোর করেই সে বললো, এ কাপড় দিয়ে আমার একটি জামা তৈরী করবো। কাপড়টি পছন্দ হয়েছে—এর একটি জামা আমার চাই। আমি জানি, ওখানে তিনটি রুপোর টাকা আছে।

ঐ টাকাগুলোর দাম কম নয়। বিয়ের সময় মা সেগুলো পেয়েছিল। বাড়ি ছেড়ে আসবার সময় তার মা তাকে দিয়েছিল। এ তার অমূল্য সম্পদ। কোন সময়ে সে খরচ করেনি এই টাকা। এমন কি, বৃদ্ধা মার মৃত্যুর সম্ভাবনায় যখন "কফিন" কেনা হয়, তখন সে ধার করেছে তবু টাকাগুলো খরচ করেনি। সর্বদাই মনে করে এসেছে—ঐ ক'টি টাকা আমার নিরাপদ ঐশ্বর্য। সেগুলো সুধু অসময়ের জন্য। তখন অন্ততঃ ক'দিন উপোস থেকে রক্ষা পেতে পারব দেয়ালের ভেতর রাখা সেই ক'টি

টাকায়। তাই বললো ও-টাকা আমি খরচ করতে পারিনা!

বাবুই পাখির মতো লাফিয়ে উঠলো স্বামী। সরোষে মাকে এড়িয়ে চলে গেল সেই 'তাক-এ', খুঁজে বার করে নিল সেই টাকা ক'টি। মা পেছনে ছুটে গিয়ে তাকে ধরলো, কিন্তু ওর সঙ্গে সে পারবে কেন? সে তাকে ঝেড়ে মাটিতে ফেলে দিল—তার কোলের শিশুটি সুদ্ধু। ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে বললো, এর চার গজ কেটে দাও, কিছুটা বেশি নেওয়াই তো নিয়ম?

ফিরিওলা তাড়াতাড়ি কাপড় কেটে দিল। সে যে দাম বলেছিল তার চেয়ে কম পাওয়া সত্ত্বেও টাকাটি তুলে নিল। তাড়াতাড়ি জিনিস বিক্রি করে চলে যেতে চায় সে। মা বাইরে এসে দেখে ফিরিওলা চলে গেছে। গাছের সবুজ ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে আছে তার স্বামী, তার হাতে উজ্জ্বল নীল সেই কাপড়। রুপোর টাকাগুলো তার হাতছাড়া হয়ে গেছে। বৃদ্ধা জড়সড় হয়ে বসে আছে; মাকে আসতে দেখে রুক্ষকণ্ঠে ছেলেকে বললো, চমৎকার নীল রঙটি, আর দাম-ও তো বেশি নয়। তাছাড়া, এমনি ঘাস-কাপড়ের পোষাক তুই তো পরিসনি কখনও।

সে সরোষে তার স্ত্রীর দিকে চেয়ে দেখে—রক্তিম হয়ে গেছে তার মুখখানি। ক্রোধে গর্জন করে বললো, জামাটি তুমি করে দেবে, না আর কারো কাছ থেকে মজুরী দিয়ে করিয়ে আনবো—বলবো, আমার স্ত্রী করে দিচ্ছেনা?

কিছুই বললোনা মা। ছোট্ট বেঞ্চিখানির উপর বিমর্ষভাবে বসলো। তার শরীর কাঁপছিল, শিশুটি তখনও ভয়ে কাঁদছিল। সেদিকে তখন আর তার নজর নেই। ক্রন্দনরত অবস্থায় শিশুটিকে মাটিতে রেখে খুলে যাওয়া চুল-গুলি বেঁধে নিল। খানিকক্ষণ হাঁফিয়ে, দু'একবার ঢোক গিলে স্বামীর দিকে না চেয়েই বললো, তা'হলে দাও আমিই তৈরী করে দিচ্ছি!

অপরকে দিয়ে এ কাজ করালে লজ্জা হবে মারই, গোলমাল শুনে দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের কলহ সম্বন্ধে প্রতিবেশীরা যেটুকু শুনেছে, তার চেয়েও বেশি জানাজানি হবে।

সেই দিন থেকেই স্বামীর উপর বিরূপ হলো মার মন। যথাসাধ্য সতর্কতার সঙ্গেই সে কাজটি করছিল। তবু, কাপড়টি কেটে জামার আকার করেও সে উৎসাহ বোধ করলোনা। জামা কাটবার সময় সে নীরবেই ছিল, স্বামীর

সঙ্গে কথা বললোনা, রাস্তায় কোন ঘটনা সম্বন্ধে কিংবা স্ত্রীজনোচিত অন্য কোন প্রসঙ্গ স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করলোনা। স্ত্রীকে ছোটলোকের মত এমনি হৃদয়হীন কঠিন হতে দেখে স্বামীও বিমর্ষ হয়ে রইলো। সে গান গাওয়া বন্ধ করে খাওয়ার পর রাস্তার ধারে সরাইখানায় আড্ডা দিল, চা খেতে খেতে অধিক রাত্রি পর্যন্ত জুয়া খেলল যাতে করে পরদিন অনেক বেলা অবধি ঘুমোতে পারে। অন্য সময়ে এ রকম করলে মা তাকে তিরস্কার করতো, চুপ না করা পর্যন্ত জ্বালিয়ে মারতো। কিন্তু এখন সে তাকে ঘুমোতে দিয়ে নিজে একা গেল মাঠে। স্বামীর উপর ক্রুদ্ধ বিমর্ষ হয়ে, নীরবে তার যা খুসী তা করতে দিলো মা। মনে সংশয় জাগে তবু নিজেকে শক্ত করে রাখে। জামাটি তৈরী হলো। তখন ধান্য-রোপণের সময়, তাই জামাটি তৈরী করতে বেশ ক'দিন দেরী হলো। জামা তৈরী হয়ে যাবার পরও মা কিছুই বললোনা, দেখলোনা জামাটিতে কেমন দেখায় তার স্বামীকে। স্বামীকে জামাটি দিতেই সে জামাটি গায়ে দিল। পরিষ্কার করে নিল আঙটিটা, হেঁসেলের ভেতর ঢুকে বোতল থেকে তেল ঢেলে নিয়ে চুল পালিশ করলো। তারপর গর্বিত পদক্ষেপে চলে গেল রাস্তায়।

অনেকে ডাকাডাকি করে বললো, জামাটিতে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। কিন্তু তাতে আনন্দ পেলোনা সে। তার স্ত্রী বললোনা একটি কথাও। দরজায় মুহূর্তেক দাঁড়িয়েছিল সে, আর তার স্ত্রী নীচু হয়ে ঝাড়ু দিয়ে ঘর পরিষ্কার করছিল। সে তাকালোনা একবারও। নতুন জুতো জোড়া তৈরী করে যেমন করতো ঠিক তেমনিভাবে জিগ্যেস করলোনা জামাটি গায়ে ঠিক হলো কিনা। সলজ্জ ভঙ্গীতে সে নিজেই বলল, আমার মনে হয়, সব জামার চেয়ে এটিই ভালো সেলাই করেছ। জামাটিতে আমায় ঠিক শহুরে লোকের মত দেখাচ্ছে।

তবু দৃষ্টিপাত করলোনা মা। জামাটি সেলাই করতে সঞ্চিত সুতো সব শেষ হয়ে গেছে। এক কোণে ঝাড়ুটি রেখে এক তাড়া কার্পাস নিয়ে সে সুতো কাটতে শুরু করলো। সুধু বললো, এতে যা খরচ হয়েছে, তাতে সম্রাটের পোষাকের মতোই দেখানো উচিত!

সে স্বামীর দিকে ফিরে চাইলোনা,—যখন রাস্তায় নেমে পড়লো তখনও না।

পেছন ফিরে ফিরে চললো সে। মা একবার গোপনেও দেখলোনা। তার উপর এত বিরূপ হয়ে গেছে সে। তবু, ভাবে—নীল পোষাকটিতে তার স্বামীকে চমৎকার মানিয়েছে!

॥ পাঁচ ॥

মা সারাদিন স্বামীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় রইলো। মাঠের কাজ শেষ হয়ে গেছে এখন। ক্ষেতে ধানের চারা রোপণ করা হয়েছে, স্বল্প জল আর তপ্ত সূর্যালোকে সবুজ কচি চারার নবোদগত শীষগুলো মৃদু বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। এখন মাঠে বেরোবার প্রয়োজন নেই। তাই, মা উইলো-গাছের তলায় বসে সুতো কাটছিল, আর তার কথা শোনবার জন্য বৃদ্ধা প্রসন্নচিত্তে পাশে বসে-ছিল। গায়ের কোটটি খুলে জরাজীর্ণ দু'টি বাহু প্রখর রৌদ্রে প্রসারিত করে সে হাড়ে রোদ লাগাচ্ছিল। শিশুরা উলঙ্গ হয়ে রোদে ছুটোছুটি করছিল। মা নীরবে সুতো কেটে চলেছে। খানিকটা সুতো কাটা হলে সেটা গুটিয়ে একটি বাঁশের কাঠিমে রাখছিল। আর সব কাজের মতো সে সুতো-ও কাটে ভালো, বেশ শক্ত—আর মিহি হয় সুতোগুলো।
বেলা দ্বিপ্রহর হলো। সুতো-কাটা রেখে সে উঠলো। শুষ্ককণ্ঠে বললো, নীল পোষাক পরলেও ক্ষুধার্ত হয়ে শিগ্‌গিরই ও বাড়ি ফিরে আসবে। একটু হেসে বৃদ্ধা সঙ্গে-সঙ্গেই উত্তর দিল, নিশ্চয়, মানুষের পেটের উপরে যা আছে, তা তো আর পেটের ভিতরে যা আছে তার মতো নয়!
মা সেখান থেকে চলে গেল। তারপর ভাঁড়ার থেকে চাল মেপে একটি বাঁশের ধুচ্‌নিতে নিয়ে চললো পুকুরের দিকে। যেতে যেতে তাকালো রাস্তার দিকে। কিন্তু কোথাও সেই বি-নীলিমার চিহ্নও নেই। পুকুরে নেমে ধুচ্‌নি জলে ডুবিয়ে সে চাল ধুতে লাগলো, বলিষ্ঠ পিঙ্গল হাত দিয়ে ধান-গুলো বেছে ফেললো, ভিজে মুক্তোর মতো শাদা না হওয়া পর্যন্ত বার বার জলে ডুবিয়ে চালগুলো ধুয়ে নিল। ফেরার পথে একটি কপি গাছ টেনে তুলে নিয়ে ঘরে ফিরে এল। বড় ছেলেটি ছোট বোনের হাত ধরে রাস্তা থেকে বেড়িয়ে এলো। মা শান্তকণ্ঠে জিগ্যেস করলো, হ্যাঁরে, তোর বাবাকে

দেখলি কোথাও—রাস্তায়, সরাইখানায় কিংবা কারো ঘরে?

সবিস্ময়ে ছেলেটি উত্তর দিল, বাবা তো আজ সকালে সরাইখানায় বসে চা খেয়েছে। কী চমৎকার তার সেই নতুন নীল জামাটি! দাদু দাম শুনে বলেছে—বাবা বেশি দাম দিয়ে জামাটি কিনেছে।

মা বললো, হ্যাঁ, বেশি দাম বই কি! হঠাৎ কঠিন হলো তার কণ্ঠস্বর।

মেয়েটি এগিয়ে এসে দাদারই উক্তির প্রতিধ্বনি করলো, জামাটি—নীল, সত্যি, —আমিও দেখতে পেয়েছি ওটা নীল।

আর কোন কথা বললো না মা। বেতের ঝুড়িটার ভেতর ঘুম থেকে জেগে শিশুটি কেঁদে উঠল। মা দৌড়ে গিয়ে কোটটি খুলে ছেলেটিকে বুকের উপর ধরলো। তাকে দুধ খাইয়ে শান্ত করে সে রান্নার দিকে গেল। যাবার সময় বৃদ্ধাকে বললো, ওদিকে একটু ঘুরে বোস মা, দেখ, নীল জামাটি চোখে পড়ে কিনা। তা'হলে আমায় ডেকো। আমি তার খাবারটা টেবিলে রেখে আসবো।

সানন্দে বুড়ী বললো, হ্যাঁ, আমি দেখছি বৌমা।

ভাত রান্না হলো—শাদা আর ঝরঝরে—ঠিক যেমনটি সে পছন্দ করে। তবু, সে এলোনা। কপিটা সেদ্ধ করে তাতে লাগাবার জন্য একটু মিষ্টি টক্ চাট্‌নি তৈরী করলো। তবু তার দেখা নেই।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো তারা। বৃদ্ধার ক্ষিদে পেলো। খাবারের ঘ্রাণে মূর্ছা এলো তার। তীব্র ক্ষুধাতুর হয়ে সে সরোষে চিৎকার করে উঠলো, ছেলের জন্য আর বসে থেকোনা। আমার মুখে জল বেরিয়ে আসছে, পেটটা পিঁপের মতো খালি হয়ে গেছে, এখনও সে এলোনা!

মা বৃদ্ধাকে খেতে দিল, ছেলেমেয়েদের খাওয়ালো, কপিটাও খেতে দিল—সুধু মাছটা রাখলো স্বামীর জন্য। তারপর একটু রয়ে-সয়ে নিজে খেলো। সেদিন ক্ষিধে তেমন অনুভব হলোনা তার, ভাত রয়ে গেল অনেক, কপির তরকারী উদ্‌বৃত্ত হলো। তরকারীটা সে সযত্নে রেখে দিল। রাত্রি-বেলা একটু গরম করে নিলেই সেগুলো এবেলাকার মতো ভালো হয়ে যাবে। তারপর শিশুটিকে বুকে নিয়ে স্তন দেয়, পেট পুরে খেয়ে গোলগাল মোটা-সোটা শিশুটি ঘুমালো কড়া রোদে। ছেলে ও মেয়েটি উইলো-গাছের ছায়ায়

শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো, বেঞ্চির উপর নড়লো বৃদ্ধা। পল্লীময় ছেয়ে আছে মধ্যাহ্ন রৌদ্র-তাপের নীরবতা। এমনকি পশুরাও যেন দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছে। সুধু ঘুম নেই মার চোখে। সে তকলি নিয়ে খামারের পশ্চিম দিকে উইলো-গাছের ছায়ায় বসে সুতো কেটে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে সে আর কাজ করতে পারলোনা। সারাটি সকাল সে শান্ত সহজভাবে কাজ করেছে, কিন্তু এখন সে আর পারলোনা। বিচিত্র এক চিন্তায় তার সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে এলো। সে খেতে আসেনি—এমন হয়নি আর কোন দিন। মা মনে মনে বললো, নিশ্চয় জুয়া খেলতে কিংবা অন্য কোন কাজে সে শহরে গেছে।

একথা আগে ভাবেনি সে কিন্তু যতই ভাবছে ততই তার মনে বদ্ধমূল হচ্ছে এ ধারণা। খানিকক্ষণ পরে তার প্রতিবেশী ভাশুর মাঠে যাবার জন্য বেরিয়ে এলো। তার স্ত্রী গাছের পাশে বসে এতক্ষণ ঘুমাচ্ছিল। একটু পরেই জেগে উঠে সে ডেকে জিগ্যেস করলো, তোর সোয়ামি আজ কোথাও গেছে নাকি রে?

স্বাভাবিকভাবে মা উত্তর দিল, হ্যাঁ, তার নিজের কাজে শহরে গেছে। নিড়ানী আর লাঙলের ভিতর কি একটা খুঁজতে খুঁজতে অনুচ্চকণ্ঠে ভাশুর বললো, হ্যাঁ, ঠিক বলেছে নীল জামাটি পরে তাকে শহরের দিকে যেতে দেখলাম।

মা বললো, হ্যাঁ।

খানিকটা শান্ত হলো তার মনখানি। ভাশুর তাকে শহরে যেতে দেখেছে। তাই সে সোৎসাহে সুতো কাটতে লাগলো আবার। সে স্ফূর্তি করতে গেছে নিশ্চয়—একদিনের জন্য বাড়ি থেকে দূরে গিয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে আমার উপর। পিতলের আঙটিটি মেজে পরিষ্কার করে, চুলে তেল মেখে, নতুন পোষাক পরে এ ছাড়া কী আর সে করতে পারে?

একথা ভাবতেই একটু রাগ হলো তার। কিন্তু পরক্ষণেই রাগ কমে গেল আবার। ভাশুরের কথা শুনে একটি বিচিত্র চিন্তা মিশে রইলো তার সঙ্গে। দীর্ঘ, উষ্ণতামাখা মধ্যাহ্ন কেটে গেল। বৃদ্ধা ঘুম থেকে জেগে বললো, তার বুক শুকিয়ে গাছের ছালের মতো হয়ে গেছে। মা তাড়াতাড়ি চা নিয়ে এলো। ছেলে ও মেয়েটি জেগে একবার ধূলোয় গড়াগড়ি খেয়ে নিল। তারপর উঠে

খেলতে লাগলো। শিশুটি তখনও পরম সুখে ঘুমাচ্ছে।

মা আর নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেনা। অন্যান্য দিনের মত কাজ করতে করতেও সে আজ আর সহজে ঘুমিয়ে নিতে পারেনা। আজ অন্তরের একটি বেদনা তাকে রেখেছে জাগিয়ে। সে শুনছে কার অনাগত পদধ্বনি।

অবশেষে অধৈর্য হয়ে পড়ে সে। যাকে চায় তার বদলে ফাঁকা পথখানি চেয়ে চেয়ে সে শ্রান্ত হয়। শিশুটিকে জানুর উপর বসিয়ে তার ছোট্ট কোদালটি নিয়ে চললো মাঠের দিকে। বৃদ্ধাকে বলল, আমি দক্ষিণের ক্ষেতটায় আগাছা তুলতে যাচ্ছি। যেতে যেতে ভাবে—ঘরে না থাকাই ভালো। কোন কঠিন কাজে লিপ্ত থাকলে তাড়াতাড়ি সময় কাটবে। সারাটি অপরাহ্ন সে মাঠে কাজ করলো, নীল রুমালখানি মুখে বেঁধে মুখটিকে সূর্যাতপ থেকে রক্ষা করলো। সবুজ নতুন শস্য-চারার মধ্যে অবিশ্রান্ত কোদাল চালালো। ছোট সেই ক্ষেতটির মাটি বেশ শক্ত। তারা তাদের জমিগুলোতে ধান লাগায় যতদূর সম্ভব। পাহাড়ের ঢালু জায়গায় ক্ষেতে জল দেওয়া সহজ। তা'ছাড়া, অন্য শস্যের চেয়ে চাল উপাদেয়, আর অন্য শস্যের থেকে ধান চড়া দামে বিক্রিও হয়।

ছায়াহীন পাহাড়ের নিচে নেমে এলো সূর্য। তার তেজ এসে পড়লো মার গায়ের উপর। গায়ের জামা ঘামে ভিজে কালো হয়ে গেল। মাঝে মাঝে শিশুটি কেঁদে উঠলো। তাকে খাওবার জন্য একটু বিশ্রাম করতে হয়। শিশুটি শান্ত হলেই তাকে নামিয়ে রেখে সে আবার কাজ সুরু করে। কাজ করতে করতে শরীরে ব্যথা অনুভব করলো, অবসন্ন হলো মনখানিও। তার কোদালির আগায় উঠে-আসা ছিন্নমূল আগাছাগুলো প্রখর সূর্য-কিরণে কেমন করে শুকিয়ে যাচ্ছে—সুধু এ ছাড়া তার মনে আর কোন চিন্তাই ছিলনা। ক্রমে সূর্য মাঠের প্রান্তে চলে গেল, উপত্যকাটি হঠাৎ ছায়াময় হলো। সোজা হয়ে জামায় মুখ মুছে মনে মনে বললো, ও এখন নিশ্চয় ঘরে এসে অপেক্ষা করছে। এবার আমাকে তার জন্য খাবার তৈরী করতে যেতে হবে।

নরম মাটির শয্যা থেকে শিশুটিকে তুলে নিয়ে সে বাড়ি ফিরে গেল। কিন্তু স্বামী ঘরে নেই। ঘরের ভিতরে চেয়ে দেখলো, সেখানেও সে নেই। বৃদ্ধা চিন্তিতভাবে মাঠের দিকে চেয়ে ছিল, শিশু দুটি শ্রান্ত হয়ে সিঁড়ির উপর

বসে ছিল। মাকে দেখে কেঁদে উঠলো তারা। মা হতাশার সঙ্গে জিগ্যেস করলো, তোদের বাবা এখনও আসেনি? ছেলেটি বললো, বাবা আসেনি, আমাদের ক্ষিদে পেয়েছে। মেয়েটি তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললো, আসে নি, —বড় ক্ষিদে পেয়েছে। সূর্যের তীব্র সোনালি রশ্মিটুকু প্রতিরোধ করবার জন্য তাড়াতাড়ি চোখ দুটি বন্ধ করে সে বসে পড়লো। বৃদ্ধা উঠলো। খামারের শেষ মাথায় গিয়ে গৃহাভিমুখী ভাশুরকে ডেকে কর্কশকণ্ঠে জিগ্যেস করলো, আমার ছেলেকে কোথাও দেখেছো?

আকস্মিক অধীরতার সঙ্গে মা বলে উঠলো, থাক্ মা, সে আসেনি একথা সকলকে জানিয়োনা। বিরক্ত হয়ে তার দিকে চেয়ে বৃদ্ধা বললো, বেশ, কিন্তু সে তো আসেনি!

মা আর কিছু বললোনা। ঠাণ্ডা ভাত এনে ছেলেমেয়েকে দিল, বৃদ্ধার ভাতের উপর একটু গরম জল ঢেলে দিল, কুকুরটাকে দিল এক মুঠো বাসি ভাত। ওরা খেতে বসলো, মা তার শিশুটিকে কোলে নিয়ে রাস্তায় নেমে সরাইখানায় গেল। পাশের গাঁয়ের দু'একজন লোক ছাড়া সেখানে খদ্দের ছিলনা বেশি। এই সময়টায় দিনের কাজের শেষে পুরুষরা ঘরেই থাকে। মা ভাবলো, এখানে এলে সে নিশ্চয় রাস্তার পাশে টেবিলটায় বসে বাইরের সব কিছু শুনবে ও দেখবে, নয়তো সে থাকবে কোন অতিথির সঙ্গে। পারতপক্ষে সে একা থাকে। যদি খেলা চলতে থাকে তো সে থাকবে সকলের মাঝখানে। ঠাহর করে সে চাইলো, কিন্তু নীল জামাটির চিহ্ন দেখলোনা কোথাও। জুয়ার টেবিলে কোন কলরব নেই। সে ভিতরে ঢুকলো, দেখলো সেখানে নেই তার স্বামী।

সান্ধ্য-ভোজনের পর সরাইওলা চুলোর পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করছিল। বহুদিনের ধোঁয়ায় ও চর্বিতে তার মুখখানি কালো হয়ে আছে। এ ব্যবসা করতে গিয়ে মুখ পরিষ্কার করে কোন লাভ নেই। একটু পরেই মুখখানি আবার কালো হয়ে যাবে—এই তার ধারণা।

মা তাকে জিগ্যেস করলো, আমার স্বামীকে দেখেছ? হাতের কালো নখ দিয়ে দাঁত খুঁটিয়ে চুষতে চুষতে সে অলসভাবে উত্তর দিল, সেই নীল জামাটি পরে সকালবেলা এখানে খানিকক্ষণ বসেছিল। তারপর সে আজকের দিনের

জন্য শহরে গেল। নতুন গল্পের সন্ধান পেয়ে বললো, কেন—কিছু হয়েছে নাকি, গিন্নী?

মা তাড়াতাড়ি জবাব দিল, না—হয়নি কিছুই। শহরে কাজে আটকা পড়েছে, তাই দেরী হচ্ছে। আজকের রাতটা সেখানে কোথাও কাটিয়ে কালই বাড়ি ফিরবে মনে হয়।

কৌতূহলী হয়ে সরাইওলা জিগ্যেস করলো, কাজটা কি? সে উত্তরে বললো মেয়ে-মানুষ আমি, তার কী জানি?—বলেই সে বেরিয়ে এলো।

ফিরবার পথে যাদের সঙ্গে দেখা হলো তাদের সকলের কথার উত্তর দিতে দিতে সে কী যেন চিন্তা করলো। বাড়ি ফিরে দেয়ালের সেই ছিদ্রটার ভেতর হাত দিয়ে দেখে—ছিদ্রটি শূন্য। সে বেশ জানতো ক'টি তামার মুদ্রা লুকানো ছিল সেখানে। ক'দিন আগে ধানের খড় বিক্রি করে যে টাকা ক'টি পাওয়া গিয়েছিল সেটাও সেখানে রাখা হয়েছিল। জিনিস বিক্রি করতে ওস্তাদ তার স্বামী। সব ক'টা টাকাই সে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছিল। তার কাছ থেকে টাকাগুলো নিয়ে গুণে সেখানেই রেখেছিল। টাকাগুলো সেখানে নেই!

তখন সে বুঝলো, সে গেছে। তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে তার মনে হলো—সে গেছে—সত্যিই চলে গেছে। শিশুটিকে কোলে নিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে মাটির ঘরে মেঝেতে সে বসলো নীরবে। হ্যাঁ, সে চলে গেছে। তিনটি ছেলেমেয়ে আর এই বৃদ্ধাকে দিয়ে আমাকে রেখে সে চলে গেছে!

হঠাৎ কেঁদে উঠলো শিশুটি। সে তেমনিভাবে বুকটি খুলে তার মুখে ধরলো। ছেলেমেয়ে দু'টি ঘরে এলো। মেয়েটি চোখ মুছতে মুছতে প্যান্‌প্যান্‌ করছিল। বৃদ্ধা লাঠিতে ভর দিয়ে বলতে বলতে এলো, ভাবছি—কোথায় গেল আমার ছেলেটি? দেখ বৌমা, কোথায় গেল বলে গেছে কি? আশ্চর্য—কোথায় গেল সে?

দাঁড়িয়ে মা বলল, সে কাল নিশ্চয় ফিরে আসবে মা। তুমি ঘুমোওগে। কাল সে আসবে।

শুনে শান্ত হয়ে বৃদ্ধা মা বলল, ও—হ্যাঁ, কাল—কাল আসবে, নিশ্চয়। অন্ধকার ঘরের মধ্যে পথ হাতড়ে সে তার বিছানায় চলে গেল। মা তার

সন্তানদের উঠানে নিয়ে এলো। অন্যান্য গ্রীষ্মের দিনের মতো ঘুমোবার আগে গা ধুয়ে দিল তাদের। এক এক ঘটি জল গায়ের উপর ঢেলে হাত দিয়ে মেজে দিল গায়ের বাদামী চামড়া। তাদের কোন কথা, এমন কি চোখের যন্ত্রণায় কাতর মেয়েটির কান্নাও সে শুনলোনা। বিছানায় গিয়ে তার বাবাকে না দেখে অবাক হয়ে ছেলেটি জিগ্যেস করলো, তাহলে বাবা আজ কোথায় ঘুমুবে? মা জবাব দিল, নিশ্চয় শহরে, কাল কিংবা দু'-একদিনের মধ্যে ও বাড়ি ফিরবে। তারপর ঈষৎ রোষভরে বলল, ঐ ক'টি টাকা ফুরোলেই সে বাড়ি ফিরে আসবে। আরও তিক্ততার সঙ্গে আবার বলল, আর সেই নতুন নীল পোষাকটি ময়লা হয়ে আমারই জন্য তৈরী থাকবে—আমাকে সেটি পরিষ্কার করে দিতে হবে আবার।

স্বামীর উপর রাগ করতে পেরে মা খুসী হলো। সে আঁকড়ে ধরে রইলো তার রাগকে। রাগ হলেই স্বামীকে আরও কাছে মনে হয় তার। পশুটাকে ঘরের ভেতর এনে মনে মনে বলল, আমি বলে দিচ্ছি—হয়তো আজকের রাত্তিরেই আমি ঘুমিয়ে পড়লেই সে এসে দরজা ঠুক্‌বে।

অন্ধকার রাত্রিতে স্তব্ধ, উষ্ণ রজনীতে বন্ধ ঘরের নীরবতায় রাগের উপশম হলো। মনে জাগলো ভয়—যদি সে ফিরে না আসে,—সঙ্গীহীন তরুণী সে, কী করবে? তার বিস্তৃত শয্যাখানি শূন্য। আজ আর সতর্কতার প্রয়োজন নেই; সে তার হাত দু'টি, পা দু'খানি প্রসারিত করতে পারে। সে চলে গেছে। সেই লোকটির জন্য অতর্কিতে তীব্রতম স্পৃহা অনুভব করলো সে। ছ'টি বছর ধরে সে আশ্রয় করে আছে তার স্বামীকে। কখনও দিনের বেলায় তার উপর রাগ করেছে, রাত্রিতে তার কাছে যেতেই ভুলে গেছে স্বামীর আলস্য ও নির্বুদ্ধিতার কথা। মনে পড়লো—কেমন শান্ত, কমনীয় তার মূর্তিটি, মুখখানি তার কর্কশ নয়, দুর্গন্ধ নেই; অতি সুদর্শন যুবক, দাঁতগুলো মুক্তের মতো শাদা। সে শুয়ে রইলো—তারই আশায়, মন থেকে ধুয়ে গেল সকল ক্রোধ, মনে জেগে রইলো—অশান্ত আকাঙ্ক্ষা।

সকালে সে শয্যাত্যাগ করলো। অনিদ্রায় শ্রান্ত হয়ে গেছে তার দেহখানি। আবার সে কঠিন হলো। সে উঠেছে, কিন্তু এখনও আসেনি তার স্বামী। সে পশুগুলোকে বার করে দিল, ছেলেদের খাইয়ে বৃদ্ধার খাবার দিল,

মনকে শক্ত করে বার বার অনুচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করলো, টাকাটা ফুরিয়ে গেলেই সে ফিরে আসবে—আমি বেশ জানি, সে ফিরবেই।

শয্যা শূন্য দেখে সবিস্ময়ে ছেলেটি জিগ্যেস করলো, বাবা কোথায়, মা? মা উচ্চকণ্ঠে ঝাঁঝালো সুরে উত্তর দিল, বলছি তো—ও দু'একদিনের জন্য বাইরে গেছে! রাস্তায় কেউ যদি তোকে জিগ্যেস করে, বলিস্—ও দু'-একদিনের জন্য বাইরে গেছে।

ছেলেমেয়ে বাইরে খেলতে চলে গেল। মা মাঠে গেল না। বেঞ্চিখানি বাইরে নিয়ে এলো। বেঞ্চির উপর বসে চেয়ে রইলো—পল্লীর রাস্তা বেয়ে কেউ আসছে কিনা।

বৃদ্ধার অর্থহীন সব কথার উত্তর দিতে দিতে সে ভাবল—সেই নীল জামাটি এত পরিষ্কার যে অনেক দূর থেকেই দেখা যাবে। বসে বসে সুতো কাটতে লাগলো সে। চরকায় প্রতিটি মোচড়ের পরই সে একবার রাস্তার দিকে চেয়ে দেখছিল। মনে মনে হিসেব করে দেখলো—কত টাকা সে নিয়েছে, ঐ টাকায় তার ক'দিন চলতে পারে। যদি সে জুয়া খেলে কিছু টাকা না পায় তা'হলে সাতদিনের মধ্যেই টাকাটা খরচ হয়ে যাবে। জুয়ায় জিত্‌লে আরও দু'একটা দিন হয়তো থাকা যাবে। তারপর সে ফিরে আসতে বাধ্য হবে। সকালের মধ্যে বহুবার বৃদ্ধার প্রলাপ তার অসহ্য বোধ হয়েছে। কিন্তু, হয়তো স্বামীকে দেখবার তীব্র আশায় সে তা সহ্য করেছে।

দুপুরবেলা। ছেলেমেয়ে ক্ষুধার্ত হয়ে ফিরে এলো। তাদের বাবার জন্য রাখা কপির পাত্রটি দেখে ছেলেটি একটু কপির চাটনি চাইলো। কিন্তু মা দিলনা। আবার চাইতেই প্রচন্ড ধমক দিল তাকে। বলল, ওটা তোর বাবার জন্য। আজ রাতেই যদি ও ফিরে আসে তার ক্ষিধে পাবে, এর সবটুকুই তার লাগবে।......গ্রীষ্মের দীর্ঘ স্তব্ধ অপরাহ্ন শেষ হলো। সে এলোনা। কনক রশ্মিতে ভরা সূর্য যথারীতি অস্তমিত হলো। উপত্যকাটি অল্পক্ষণের জন্য আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এখন সে আর ছেলেদের চাটনিটা দিতে নারাজ হলোনা। তাদের সামনে পাত্রটি রেখে বলল, তোরা যা পারিস খা, আর একটি দিন থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে এটা। কে জানে—! সে মিষ্টি টক চাটনি হাত দিয়ে তুলে বৃদ্ধাকে দিল। বললো, খাও। কাল সে এলে

নতুন করে আবার রাঁধবো। বৃদ্ধা মা জিগ্যেস করলো, তা'হলে ও কাল আসবে? মা গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, হ্যাঁ, হয়তো কাল।

রাত হলো। অত্যন্ত ভীত ও বিমর্ষভাবে সে শয্যায় শুয়ে রইলো। এই রাত্রিতে স্পষ্টভাবেই তার মনকে বলল, কে জানে সে আসে কিনা! তবু, আশা—সাতদিন পর্যন্ত। এরই মধ্যে তার টাকা খরচ হয়ে যেতে পারে। এক-একটি করে এলো সেই সাতটি দিন। প্রতিটি দিনের প্রতীক্ষায় মার মনে হলো যেন স্বামীর ফিরে আসার দিন এসেছে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়ানো বা অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে বসে গল্পগুজব করে সময় নষ্ট করা তার অভ্যাস নয়। কিন্তু এক-একটি করে প্রায় কুড়িজন এলো তার কাছে, জিগ্যেস করলো—তার স্বামী কোথায়। বলল, এখানে এই ছোট্ট পল্লীতে আমরা সবাই তো একই পরিবারভুক্ত। আমরা সবাই তার আত্মীয়! মা অগত্যা গর্বপ্রণোদিত হয়ে একটি কাহিনী তৈরী করে বলল, দূরে এক শহরে ওর এক বন্ধু আছে। সে—সেখানে কাজ পাওয়া যায়। বেতনও নাকি খুব ভালো। মাঠে খেটে খেটে শরীর পাত করতে হবেনা। ও কাজ যদি ভালো না লাগে সে শিগ্‌গিরই বাড়ি ফিরে আসবে, আর কাজটি যদি তার উপযুক্ত হয়, তাহলে ছুটি না পাওয়া পর্যন্ত ফিরবেনা।

কথাগুলো সে বলল সত্যিকথার মতো শান্ত সহজ ভাবে। অবাক হয়ে গেল বৃদ্ধা। চেঁচিয়ে উঠলো, আমি তার মা। এমন সুখবরটা আমায় আগে দাওনি কেন?

আবার বানিয়ে মা বলল, তোমায় কথাটি জানাতে আমায় বারণ করে দিয়ে গেছে। কারণ, তা'হলে ও যতটুকু করছে না, লোকে জানবে তার চেয়ে ঢের বেশি—অথচ, সে চায়না—সবাই একথা জানুক।

ও তাই বলনা!—বৌমার মুখখানি দেখবার জন্য বৃদ্ধা ঝুঁকে পড়লো তার লাঠিটার উপর। তারপর একটু আহত হয়েই যেন বলল, আমি বেশি কথা বলি বটে, কিন্তু একেবারে নুড়ির মতো ঝর্‌ঝরে আমি নই।

মা বার বার বললো এই গল্পটি। বাড়িয়ে বাড়িয়ে গল্পটিকে সত্যের মতো নিখুঁত করলো। একটি প্রগল্‌ভা বিধবা প্রায়ই তার বাড়ির পাশে আসে। সে থাকে তার দাদার বাড়িতে। সন্তানহীনা সে বিশেষ কোন কাজকর্ম নেই

তার। সারাদিন বসে বসে নিজের তৈরী জুতোয় ফুল তোলে, কোন একটি কৌতুককর কিছু শুনলেই বিস্ময়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবে। সে ভাবল—লোকটির অন্তর্ধান সম্বন্ধে। সেদিন কি যেন ভেবে ছুটে এসে সে মাকে বলল, আমাদের এ গাঁয়ে তো অনেকদিন ধরে কারও কোন চিঠি আসেনি। তোমার স্বামীর কোন চিঠি এসেছে এমনতো শুনিনি।

বিধবাটি গোপনে গেল পাড়ার সেই লেখাপড়া-জানা লোকটির কাছে। কারো প্রয়োজন হলে সে চিঠি লিখে দেয়, উত্তর এলে পড়ে শোনায়। তাতে বেশ দু'পয়সা উদ্বৃত্ত আয় হয় তার। তাকে জিগ্যেস করলো, তৃতীয় লী-র ছেলে প্রথম লীর কাছে থেকে কোন চিঠি এসেছে কি? লোকটি উত্তর দিল, না। বিধবা বলল, কিন্তু একটি চিঠি এসেছে—তার স্ত্রী তাই বলছে—মাত্র দিন কয়েক আগে। অন্য পাড়ার কোন পত্র-লেখকের কাছে চিঠিটা নেওয়া হয়েছে ভেবে লোকটির ঈর্ষা হলো। সে বারংবার অস্বীকার করলো। বলল, আমি জানি—কোন চিঠি বা উত্তর আসেনি। আমার কাছে কেউ চিঠি পড়াবার বা লেখাবার—এমনকি চিঠিতে ডাকটিকিট লাগাবার জন্যও আসেনি। ডাকটিকিট তো আর কারো কাছে পাওয়া যায়না এখানে। তা'ছাড়া কুড়ি দিনের মধ্যে এদিকে পিওন আসেনি।

বিধবা বিচিত্র এক রহস্যের আভাস পেলো। সর্বত্রই সে বলে বেড়াতে লাগলো, লীর স্ত্রী মিথ্যে কথা বলেছে, তার স্বামীর কোন চিঠি আসেনি। সে নিশ্চয় স্ত্রীকে ফেলে পালিয়েছে। ঐ নতুন নীল জামাটি নিয়ে তাদের ঝগড়াটা কি পাড়াসুদ্ধ সবাই শোনেনি? সে তার স্ত্রীকে একেবারে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল, এমনি কি মেরেছিল তাদের ছেলেমেয়ে তো তাই বলেছে!

মার কানে এ কথা পেঁাছলো। সে দৃঢ়ভাবে বলল, সে সত্যি কথাই বলেছে। স্বামীকে শহরে পাঠাবার জন্য সে নিজেই নীল জামাটি তৈরী করে দিয়েছে। তাদের ঝগড়া হয়েছিল অন্য একটা বিষয়ে। আর চিঠি! চিঠিতো আসেইনি। নদীর ওপার থেকে এক ফিরিওলা এসেছে, সে সংবাদ এনেছে। স্থিরভাবে—বেশ জোর দিয়েই সে মিথ্যে কথাটি বলল। বৃদ্ধা গল্পটি বিশ্বাস করলো। সে চিৎকার করে ঘোষণা করতে লাগলো—কী বড়লোক তার ছেলে! মা তার মুখখানি প্রফুল্ল রাখলো। স্বামীর পলায়নে লজ্জিতা

আর—আর স্ত্রীলোকদের মতো সে কাঁদলোনা। গল্পটি সত্য বলেই মনে হলো সকলের। প্রগল্‌ভা বিধবাটি-ও অনেকটা নীরব হলো। মনে মনে বলল, আচ্ছা, সময়ে সবই দেখা যাবে। দেখবো—টাকা বা চিঠিপত্র আসে কিনা—সে ফিরে আসে কিনা!

পল্লীর সামান্য উত্তেজনাটুকু থেমে গেল। বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ করলো সবাই। মা ও তার গল্প দুই-ই ভুলে গেল তারা।

মা সুস্থিরভাবে আরম্ভ করলো তার জীবন। অনেকদিন আগেই সেই সাত-দিন অতিবাহিত হয়েছে। তার স্বামী ফিরে আসেনি। মাঠে ধান পেকেছে, হলদে গাছগুলো নুয়ে পড়েছে, শস্য-সংগ্রহের দিন এসেছে, কিন্তু সে আসেনি। মা ধান কাটলো একা। তার ভাশুর নিজের ফসল-কাটা শেষ করে মাত্র দু'দিন সাহায্য করলো তাকে। সে ধানগুলো আঁটি বেঁধে দিল। এই সাহায্যের জন্য সে খুসী হলো। সৎ ও স্বল্প-ভাষী এই লোকটিকে সে ভয় করে। তার সহজ প্রশ্নের উত্তর সত্যি করে না দেওয়া কঠিন। কিন্তু সে নীরবে কাজ করে গেল, তাকে কিছুই জিগ্যেস করলোনা। অপরিহার্য দু'একটি কথা ছাড়া কিছুই বললোনা। সুধু যাবার সময় বলল, জমিদারের খাজনার জন্য ভাগ করে দেবার সময়ও যদি সে না আসে, আমি এসে তোমায় সাহায্য করবো। নতুন নায়েবটি বড় ধূর্ত। তার সঙ্গে কোন স্ত্রীলোকের পেরে ওঠাই দায়!

মা খুসী হয়ে ধন্যবাদ জানালো। নায়েবকে সে ভাল জানেনা। লোকটি নতুন এসেছে মাত্র দু'বছর আগে। শহুরে লোক সে। তার কাজে ও কথায় রয়েছে এক কপট সারল্য।

দিন যায়, মাস কাটে, দিনের পর দিন মা ভোর হবার আগে শয্যাত্যাগ করে। ছেলেমেয়ে ও বৃদ্ধা তখনও থাকে ঘুমে। ঘুম থেকে জেগে সে তাদের খাবার তৈরী করে। তারপর এক বাহুতে শিশু পুত্রটিকে ধরে অপর হাতে বাঁকা কাস্তেটি তুলে নিয়ে চলে যায় ধান কাটতে।

ছেলেটি একটু বড় হয়েছে। সে এখন নিজে নিজে বসতে পারে। মা তাকে মাটির উপর বসিয়ে রাখে। শিশু মনের সুখে খেলে, দু'হাতে গায়ে কাদা মাখে, মুখে দেয় মাটি, খানিকটা খেয়ে থু-থু করে ফেলে দেয় আবার। তার-

পর আবার ভুলে গিয়ে মাটি খায়, মাটি বমি করে। মা সেদিকে নজর দিতে পারেনা। দু'জনের কাজ করতে হয় তাকে। সে সুধু কাজই করে যায়। শ্রান্ত হয়ে জিরোবার আগে কাঁদলে ছেলেটি কাঁদতেই থাকে। বিশ্রাম নিতে বসে মা তার কাদামাখা মুখের ভেতর স্তন দেয়।

মা মুঠো মুঠো হলদে ফসল কাটে। নুয়ে নুয়ে বেঁধে রাখে আঁটি করে। ধান-কুড়ুনীরা ও ভিখারীরা ধান কুড়াতে আসে তার ক্ষেতে। ঘামে আর মাটিতে কালো অবসন্ন মুখখানি ফিরিয়ে সে গাল দেয়—তোরা কি আমার মতো অসহায়কেও বাদ দিবিনা? ভিখারী, চোর কোথাকার! আমি যে তোদের চেয়েও গরীব! সে মনের সুখে তাদের গাল দেয়—মা-বাপ-ছেলে তুলে। তার অভিসম্পাত শুনে সবাই ভয়ে ক্ষেত ছেড়ে চলে যায়।

তারপর সে আঁটি আঁটি ধান বয়ে নিয়ে খামারে রাখে। পাথরের চাকার সঙ্গে মোষটিকে জুড়ে দিয়ে ধান ছাড়ায়। শরতের নির্বাত উষ্ণ দিনে সে পশুটাকে চালায় সারাদিন। ধান ছাড়ানো শেষ হলে খালি খড়গুলো নিয়ে একটির উপর একটি আঁটি বেঁধে তুলে রাখে, দমকা বাতাসে ধানের আগড়া ঝেড়ে নেয়।

এখন সে ছেলেটিকেও কাজে লাগিয়েছে। কাজে ঢিলে দিলে কিংবা খেলতে চাইলে শ্রান্ত হতাশ হয়ে তাকে মারে। কিন্তু খড়ের গাদা দিতে সে জানেনা। একাজ এতদিন তার স্বামীই করতো। ঐ কাজটারও উপর অন্যান্য কাজের চেয়ে তার বিদ্বেষ ছিল একটু কম। নিপুণ-ভাবেই সে কাজটি করতো, খড়ের গাদাটির মাথায় কাদা লেপে দিত। মা ভাশুরকে অনুরোধ করলো তাকে যেন একবার কাজটি শিখিয়ে দেয়—আসছে বারে তার স্বামী ফিরে না এলেও ছেলেটিকে নিয়ে সে যেন এ কাজ করতে পারে। ভাশুর এলো। সে তাকে দেখিয়ে দিল কেমন করে খড়ের গাদা করতে হয়। গাদার ওপর বসে খড় বিছিয়ে রাখতে লাগলো ভাশুর, সে নিচু থেকে তাকে খড় ছুঁড়ে দিল। এমনি করে ধান তোলা হয়ে গেল।

পরিশ্রমে তার হাড় হিম হয়ে গেছে। সহজেই শ্রান্ত হয়ে পড়ে সে। শরীরের সবটুকু মাংস শুকিয়ে গেছে তার। গাল, চিবুক আর ঠোঁট দু'টি ছাড়া গায়ের সব চামড়া পুড়ে বাদামী হয়ে গেছে! এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক

আছে যারা নিজে খেয়ে মোটা হয়, সন্তানকে খাওয়ায় না মোটেই। কিন্তু মা সন্তানদের জন্যই গড়া। সন্তানের প্রয়োজনে তার মাতৃত্ব নিজের দেহকে নির্মমভাবে বঞ্চিত করতে পারে।

এলো জমিদারের ভাগ দেবার দিন। গাঁয়ের জমিদার ও জমির মালিক এখানে কোনদিন আসেননি। বহু দূরে নগরীতে বসে তিনি অলসভাবে দিন কাটান। জমিদারীটি তাঁর পৈতৃক। তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে নায়েবকেই তিনি খাজনা আদায় করতে পাঠান। গত বছর পুরানো নায়েবটি কাজ ছেড়ে চলে গেছে। তাই, এবার নতুন নায়েবকে পাঠালেন। নতুন নায়েব এলো। সে পল্লীর প্রত্যেকটি লোকের কাছে গেল। মা তার অপেক্ষায় রইলো। ধানগুলো খামারে স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। নায়েব এলো। লম্বা দোহারা চেহারা, ধূসর পোষাক পরা, পায়ে চামড়ার জুতো—খাঁটি শহুরে লোকটি! দাড়ি-গোঁফ কামানো। কথা বলবার সময় সে তার মসৃণ হাতখানি ঠোঁটের উপর বুলায়। সে এসে ডাকলো, চাষী, কোথায় গেলে? মা এসে একটু পিছিয়ে দাঁড়ালো। বৃদ্ধা বলল, আমার ছেলে এখন শহরে কাজ করছে। বাড়িতে আছি সুধু আমরাই।

মা ছেলেকে ভাশুরের কাছে পাঠিয়ে নীরবে রইলো তার প্রতীক্ষায়। ইতো-মধ্যে একটু এগিয়ে সৌজন্যের সঙ্গে নায়েবের হাতে চা-এর পেয়ালাটি তুলে দিতে গেল। তার মনে হলো—লোকটির চোখ দু'টো তার খালি পা ও মুখখানির উপর যেন কেমনভাবে নিবন্ধ হয়ে আছে। সে একপাশে সরে দাঁড়ালো। ভাশুর ধান মেপে দিতে লাগলো। তাকে মার কোন কথা বলবার দরকার হলোনা। তাই সে খুসী হলো ধান ভাগ করা হয়ে গেল। দুঃখ জাগলো মার মনে—তাদের শ্রমের ফলস আর সবাইকার মতো শহুরে লোকটিকে ভাগ করে দিতে হবে। সবাই দেয়, না দিলে নির্যাতিত হবে, তাই সেও দিল। জমিদারের খাজানার শস্য ছাড়া সকলেই দু'একটি মুরগী, এক মাসা চাল কিংবা কয়েকটি ডিম অথবা নজরানা হিসাবে কিছু টাকাও দেয় নায়েবকে। তাছাড়া, সকলের কাছ থেকে ধান তোলা হবার পর নায়েবের জন্য প্রীতি-ভোজনের আয়োজন হয়। প্রত্যেকটি ঘর থেকে এক-একটি তরকারী রান্না করে দেওয়া হয়। এ বছর ভোজনের জন্য মা একটি মুরগী কেটে রাঁধলো,

চামড়া-শুদ্ধু গোটা মুরগীটি মৃদু জালে সেদ্ধ করলো। তবু, মাংসটা এত কাঁচ যে কাঠি ছোঁয়াবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝরে পড়ছিল। সেই মুরগীর সুরভিত ঘ্রাণে উতলা হয়ে ছেলেমেয়ে হেঁসেলের ভিতর আনাগোনা করতে লাগলো। ছেলেটি বলল, এ যদি আমাদের জন্য হোত—আমরা যদি কোনদিন এমনি একটা মুরগী খেতে পেতাম!

ক্লান্তিতে তিক্ত হয়ে পড়েছিল মা। বলল, বড়লোক ছাড়া এমনি মাংস কে আর খেতে পারে?...তবু, খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সবাই যে টেবিলে বসে খেয়েছিল সেখানে গিয়ে একটি পরিত্যক্ত হাড় তুলে নিল মা। একটু চামড়া ও খানিকটা মাংস লেগেছিল তার সঙ্গে। সেটি ছেলেটিকে চুষতে দিয়ে বলল, তাড়তাড়ি বড় হয়ে নে বাবা, যেন তুইও এদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতে পারিস। ছেলে নির্বোধের মতো বললো, বাবা দেবে বুঝি?

মা উত্তর দিল, তোর বাবা এখানে না থাকলে তুই নিশ্চয় এই টেবিলে বসে খাবি।

বছর ঘুরে এলো। শরৎ অবসান-প্রায়। ছেলেরা ভুলেই যাচ্ছে—তাদের এই শয্যায় তারা ও তাদের মা ছাড়া আর কেউ ছিল কোনদিন। এমনকি বৃদ্ধাও তার ছেলের সম্বন্ধে বড় জিজ্ঞাসাবাদ করেনা। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার হাড়গুলোয় ব্যথা ধরছে। একটু গরম জায়গা ও একটু রোদের জন্য কত কিছু করতে হয় তার। বাতাস এমনি বয় বলে সে প্রায়ই অনুযোগ করে। বলে, বছরের পর বছর যেন সূর্যের তাপ কমে আসছে! ছেলেটি রোজ একটু একটু কাজ করে। কাজটাকে সে তার কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। দিনের শেষে কাজ সেরে সে তার মোষটাকে পাহাড়ের ধারে চরাতে নিয়ে যায়। সারাদিন হয়ত তার পিঠের উপর শুয়ে থাকে, নয়তো, নিচে নেমে ঝোপের ধারে ঝিঁঝি ধরে, ঘাসের ডগা দিয়ে ঝিঁঝির জন্য ছোট খাঁচা বোনে। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে ঝুলিয়ে রাখে সেই খাঁচাটি। ঝিঁঝি-পোকাগুলো ডাকে। ছোট্ট শিশুটি আর তার বোনটি সে ডাক শুনে উৎফুল্ল হয়।

শীতের আগমনে বাদামী হয়ে ওঠে বনের বুনো ঘাসগুলো, ঘাসের মধ্যে

গ্রীষ্মের ফুলগুলিতে বীজ ধরে, পথঘাট ছেয়ে যায় লাল-হলদে পাহাড়ী ফুলে ফুলে, শীতের জ্বালানি ঘাস কাটবার সময় হয়। ছেলেটি তার মার সঙ্গে যায়। মা তার ছোট্ট কাঁচিটি দিয়ে সারাদিন শুকনো ঘাস কাটে, ছেলেটি ঘাসের দড়ি দিয়ে সেগুলো আঁটি বাঁধে। সারাটি পাহাড়ে সুধু দেখা যায় নীল দাগ। ওরাও তাদের মত মানুষ, ঘাস কেটে বাদামী ঘাসগুলোর আঁট বাঁধছে তারা। সন্ধ্যায় যখন সূর্য অস্ত যায়, পাহাড়ের চূড়া থেকে রাতের ঠাণ্ডা বাতাস বয়, তখন তারা সবাই কাঁধে ঘাসের বোঝা নিয়ে শ্রান্ত পদক্ষেপে অপরিসর আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ বেয়ে ফিরে চলে। মা ও তার ছেলেও তেমনি ছোট্ট দু'টি বোঝা ঘাস নিয়ে যায়।

বাড়ি ফিরে মা কোলের ছেলেটিকে তুলে নিয়ে দুধ খাইয়ে বুকের দুধের ভার কমায়। শিশুটি ক্ষুধার্তভাবে খায়, সারাদিন সুধু ভাতের ফেন ছাড়া আর তো কিছু খায়নি সে। এই ঠাণ্ডা দিনে সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা বিছানায় শুয়ে শরীরটা তাতিয়ে রাখতে চায়। ক্ষীণ আলোকে পথ হাতড়ে আসে ছোট্ট মেয়েটি। দাদাকে দেখে খুসী হয় সে। খামারে বসে তার দাদাকে কাজ করতে হয়, তাই সে এতক্ষণ দেখেনি তাকে।

এমনি করে কেটে যায় শরৎ। গম-বীজ বপনের জন্য জমিতে লাঙ্গল দেবার সময় আসে। মা তার ছেলেকে শিখিয়ে দেয়—কেমন করে গমের বীজ ছড়াতে হয়, হাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। বলে, কোথাও ঘন, কোথাও পাতলা করে যেন বীজ ফেলা না হয়। গম একটু অঙ্কুরিত হয়ে উঠতেই এলো শীত। শীতে সঙ্কুচিত, শক্ত হলো মাঠ। মা বিছানার নীচ থেকে শীতের জামা বের করে নিল, রোদে দিয়ে সেগুলো পরবার জন্য তৈরী করে রাখলো। গরমে ও শীতের এই কঠোর কাজে তার হাত ফেটে যায়, আঙগুল-গুলো শক্ত হয়, ফাটার মধ্যে কর্কশ সুতোর কাপড় পর্যন্ত আটকে থাকে। তবু, দক্ষিণ দিকে রোদে বসে ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে নিজেকে দূরে রেখে সে কাজ করে যায়। বৃদ্ধার পোষাকের দিকে সে মন দেয় সর্বাগ্রে—তার ঠাণ্ডা লাগে সবচেয়ে বেশী। তাই সে বৃদ্ধাকে বিছানায় শুইয়ে তার লাল জামাটি খুলে নিয়ে তাতে তুলো পুরে দিল। বৃদ্ধা শুয়ে থেকে খুশী হয়ে জিগ্যেস করলো, তোমার মনে হয় কি বৌমা, এ জামাটি ছিঁড়ে না যাওয়া পর্যন্ত

আমি বাঁচবো? গরমের সময় মনে হয়—আমি বাঁচবোই; কিন্তু শীত এলেই আর জোর করে বলতে পারিনা। এ সময়টায় খেলেও আগের মতো শরীর গরম হয় না।

অন্যমনস্কভাবে মা উত্তর দিল, নিশ্চয় বাঁচবে তুমি, মা। তোমার সমবয়সীরা সব কোন্ কালে মারা গেছে, কিন্তু তুমি বেঁচে আছ। কে আছে তোমার মত দীর্ঘজীবী? বৃদ্ধা খুসী হয়ে হাসতে হাসতে কেশে ফেললো। বলল, হাঁ, আমি দীর্ঘজীবী বৈ-কি। তা আমি জানি। সে তৃপ্তির সংগে বিছানায় শুয়ে জামাটি আবার গরম করে দেবার অপেক্ষা করতে লাগল।

মা ছেলেদের জামাগুলো রিফু করলো। মেয়েটির জামাগুলো কোলের ছেলেটিকে আর ছেলের জামাগুলো মেয়েকে দিতে হবে। তিনজনেই বড় হয়ে গেছে বছরের মধ্যে। এখন সমস্যা—ছেলে কি পরবে? স্বামীর তুলো-আঁটা কোটটি রয়েছে। তার পাজামাটিও আছে—সে মাত্র তিনটে শীত পরেছে সেটা। গলার দিকে ও হাতের দিকে ছিঁড়ে গেছে একটু। মা ছেঁড়াটা সেলাই করে দিয়েছে। সামনের দিকটায় মস্ত একটি ফুটো রয়েছে। মোষটার উপর রাগ করে সে তার নাকের ছিদ্রের ভেতর দড়ি পরাছিল—পশুটি যন্ত্রণায় মাথা নাড়তেই পাজামাটায় শিং লেগে গেল। এ জামা কেটে ছেলের গায়ের জন্য জামা তৈরী করা সহ্য হবেনা তার। জামাগুলো নিয়ে সে উল্টে-পাল্টে দেখলো, ভাবলো, বেদনা বোধ করলো। অবশেষে মনে মনে বলল, যদি সে ফিরে আসে! নাঃ—এখন থাক্। ছেলেটির শীতের জামা নেই। শীতের সকাল আর সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে সে কাঁপতে থাকে। তাই, অগত্যা ঠোঁট চেপে ধরে জামাটি কেটে ছোট করলো—ছেলের জন্যে। জামা তৈরী হবার পর এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিল—সে যদি ফিরে আসে তো কিছু চাল বিক্রী করে একটা নতুন জামা কেনা যাবে। নতুন জামা পেলে সে বরং খুসীই হবে!

শীত কেটে গেল। মার মনে হলো—এবার নববর্ষে নিশ্চয় সে আসবে। পথের ভিখিরী না হলে, আর—বেঁচে থাকলে, নতুন বছরে সবাই বাড়ি আসে। কেউ জিগ্যেস করলেই সে বলতে আরম্ভ করলো, এবার নববর্ষ-উৎসবে সে আসবে। দিনে অন্ততঃ দশ বার করে বৃদ্ধা বলল, নববর্ষে আমার ছেলে

যখন আসবে—। ছেলেরাও রইলো সেদিনের আশায়। নববর্ষ-উৎসবের দিনের জন্য সুন্দর একজোড়া নতুন জুতো তৈরী করতে করতে সেই প্রগল্‌ভা বিধবাটি ঈর্ষার সঙ্গে হেসে বলল, তোমার স্বামীর একটি চিঠিও আসেনা—এ তো বড় আশ্চর্যের কথা! আমি জানি—আমায় সেই লেখকটি বলেছে—তার কোন চিঠি আসেনা।

শান্ত সহজভাবে মা উত্তর দিল, কিন্তু আমি লোক—মারফতে কয়েকবার তার খবর পেয়েছি। আমি ও আমার স্বামী চিঠি লিখে অনর্থক পয়সা নষ্ট করা পছন্দ করিনা। ভাড়াটে চিঠি-লেখক কি লেখে, কি লেখে না, জানবার উপায় নেই। তা'ছাড়া লিখে কোন খবর পাঠালেই সবাই জেনে যায়। ও যে চিঠি লেখেনা তা'তেই আমি সন্তুষ্ট।

সে চুপ করিয়ে দিল বিধবাটিকে। তার কথা শুনে মনে হলো—সত্যই আসবে তার স্বামী এই নতুন বছরে।......দিন ঘনিয়ে এসেছে। গাঁয়ের প্রত্যেকেই উৎসবে মেতে উঠেছে। মা ও চুপ করে থাকতে পারেনা। তার ছেলে মেয়ের নতুন জুতো তৈরী করতে হবে, তাদের সব জামাকাপড় কেচে দিতে হবে, শিশুটির জন্য একটি টুপি চাই। তাছাড়া, স্বামীর জন্যও তার অনেক কাজ করবার রয়েছে। দু'ঝুড়ি চাল নিয়ে সে শহরে গেল। স্বামীর চেয়ে একটু কম দরে চালটা বিক্রি করলো। একা মেয়ে-মানুষ সে। পুরুষের সঙ্গে দরকষাকষি করে যে-দর পেয়েছে তা-ই যথেষ্ট। টাকা দিয়ে সে কিনলো: —ঠাকুরের সামনে জ্বালাবার জন্য দুটি লাল মোমবাতি ও কিছু ধূপ, লাঙগল ও কোদালের জন্য দু'টি লাল অক্ষর, তারপর মিঠাই বানাবার জন্য কিছু আতর ও চিনি। বাকী টাকায় কাপড়ের দোকানে কুড়ি গজ নীল সুতোর কাপড় ও আর এক দোকান থেকে কিছু নরম তুলো কিনলো।

স্বামী ফিরে আসবে—এ ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। কাপড়ে কাঁচি লাগিয়ে সে ধীরে ধীরে কাটতে লাগলো—বেদনা আর সতর্কতার সঙ্গে। সে একটি কোট তৈরী করলো, ভাল কাপড়ের একটি পাজামা সেলাই করলো, তুলো আঁটলো সেগুলোয়, জামাগুলোর বোতামের ঘর পর্যন্ত শেষ করে ফেললো। স্বামীর জন্য সেগুলো রেখে দিল সে। সকলের মনে হলো—জামাগুলো লোকটিকে আরো তাড়তাড়ি বাড়ি ফিরিয়ে আনবে বুঝি!

ভোর হোল, কিন্তু সে এলোনা। পরিষ্কার কাপড় জামা পরে তারা সবাই বসে রইলো সারাদিন। ছেলেমেয়েরা পরিচ্ছন্ন , সতর্ক হয়ে রইলো—যেন জামা ময়লা হয়ে না যায়। বৃদ্ধা সাবধান হয়ে খেলো—যেন খাবার জামার উপর না পড়ে। মা সারাদিন স্মিতমুখে সকলকে বলে গেল, এইতো দিনের সুরু, এখনও তার আসবার সময় আছে। এরই মধ্যে সে এসে গেছে ভেবে তার স্বামীর বন্ধুরা তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এলো। জিগ্যেস করলো, কখন সে ফিরবে। মা তাদের জানালো, আজই-তো তার আসবার কথা। কিন্তু ওর মনিব হয়তো ওকে ছাড়ছেনা। শুনেছি, মনিব তাকে ভালবাসেন, সব কিছুতেই তার উপর নির্ভর করেন।

পরের দিন এলো—স্ত্রীলোকের দল। তাদেরও সে বলল সেই একই কথা। সহজভাবে হেসে সে বলল, যখন এলোই না, নিশ্চয় শিগ্‌গিরই খবর আসবে তার আসা হলোনা কেন। তারপর, সে অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করলো।

এমনি করে দিন কেটে যায়। স্থিরভাবে সে কথা বলে। ছেলেমেয়ে ও বৃদ্ধা তার আর-আর সব কথার মতো এ কথাও বিশ্বাস করে।

সেদিন সে বসে বসে ভাবছিল। তার দুগণ্ড বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল। সে অনুভব করলো—অন্ততঃ এ লজ্জা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। তার জন্য নতুন জামা তৈরী করে সে টাকা খরচ করেছে—তবু সে এলোনা। তারই জন্য সে কেক্ তৈরী করেছে, ধূপ জ্বালিয়ে দেবতার পায়ে নিবেদন জানিয়েছে। তবু সে এলোনা! মনে পড়লো—সেই বিধবাদি বক্র-দৃষ্টি ও অস্পষ্ট ইঙ্গিত, এমনকি ভাশুরের সন্দিগ্ধ দৃষ্টির কথাও। সময় উত্তীর্ণ হলো, তবু সে এলোনা। মার মনে হলো এ লজ্জা থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। চোখের জল মুছে ফেললো সে। ভাবল এক কাজ করবে। সে তার উদ্বৃত্ত সব চাল ও খড় শহরে নিয়ে বিক্রী করে ফেলে। রূপোর টাকাটা বদলে কাগজের একখানি নোট নিয়ে গেল পত্র-লেখকের কাছে। অপরিচিত অদ্ভুত এই লোকটি। চালাঘরটির ভেতর বসেছিল সে। অদূরে একখানি বেঞ্চির উপর বসে মা বলল, আমার দেওরের একখানি চিঠি লেখাতে এলুম আপনার কাছে। ও এখন ব্যস্ত, বাড়ি যেতে পারছেনা। আমি যা বলছি লিখুন। আমি তার হয়ে লিখ্‌ছি।

বৃদ্ধ চশমাজোড়া নাকের উপর থেকে তুলে নিয়ে একবার রাস্তার দিকে চাইলো। তারপর একটুকরো শাদা কাগজ নিয়ে দোয়াতে তুলিটি ডুবিয়ে তার দিকে চেয়ে বলল, বল তা'হলে। ও, হ্যাঁ, আগে তোমার জা-র নাম-ধাম আর তোমার নাম বল।

মা বলল, আমার দেওর তার স্ত্রীর কাছে এই চিঠিখানি লেখাতে বলল। সে থাকে শহরে। আমি সেখান থেকে এসেছি। আমার নামের কোন দরকার নেই। সে তার দেওরের নামের বদলে বললো তার স্বামীর নাম, জায়গার নাম বললো, ছেলেবেলায় নাম শোনা একটি দূর শহরের। দেওরের স্ত্রীর নামের জায়গায় বললো তার নিজের নাম। ধাম বললো তার নিজেরই পল্লীটি। তারপর বলল, এই লিখতে হবে তার স্ত্রীকে।—আমি এখন কাজে বড্ড বেশি ব্যস্ত। জায়গাটি বেশ ভালো, খাওয়ার কোন অভাব নেই—যখন যা খুসী খেতে পাই। আমার মনিবটি খুব সহৃদয়। কাজের মধ্যে করতে হয়—তাঁর হুকোটা এনে দেওয়া, চা পরিবেষণ করা আর তাঁর চিঠিপত্র বন্ধু-বান্ধবের কাছে নেওয়া। মাসান্তে খাওয়া ছাড়া তিন টাকা মাইনে পাই। মাইনে থেকে আমি এরই মধ্যে দশ টাকা জমিয়ে ফেলেছি। টাকাটা বদলে একখানি নোট পাঠালাম। মার, তোমার ও ছেলেমেয়েদের জন্য টাকাটা খরচ করো।

মা বসে রইলো। লোকটি ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরে লিখলো। পরে বলল, এই তো?

মা বলল, না, আর একটি কথা লিখবার আছে। লিখুন, এবার নববর্ষে আমি বাড়ি যেতে পারলামনা। আমার মনিব আমায় এত ভালবাসে যে আমায় ছাড়লোই না। যদি পারি, আসছে বছরে আসবো। তাও যদি সম্ভব না হয়—ফি বছরে তোমার কাছে টাকা পাঠাবো যথাসাধ্য।

আবার লিখলো বৃদ্ধ। আর একটু ভেবে নিয়ে মা বলল, আর লিখুন—মাকে বলো তাঁর জন্য বাড়ি যাবার সময় তৃতীয় সমাধিবস্ত্র নিয়ে আসবো লাল কাপড়ের—খুব ভালো দেখে।

চিঠি লেখা হয়ে গেল। সই করে গালা দিয়ে এঁটে, শিরোনামা লিখে, থু-থু দিয়ে ষ্ট্যাম্প লাগিয়ে সে বলল, চিঠিখানি যথাসময়ে ডাকে দেব।

মা তার পারিশ্রমিক দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। এইবার মা তার চোখের জল মুছলো।

॥ ছয় ॥

দিন সাতেক পরে কাঁধে চিঠির থলে নিয়ে এলো ডাক-পিওন। এ এক নতুন ব্যাপার। আগে এমন পিওন ছিলনা। এমনি করে চিঠি আসতে পারে—এ ধারণাই ছিলনা এ গাঁয়ের কারো। কিন্তু, তবু চিঠি এলো। লোকটি থলে থেকে একখানি চিঠি তুলে নিল। মার দিকে চেয়ে বলল, আপনিই কি লীর স্ত্রী?

সে বুঝলো তার চিঠি এসেছে। বলল, হ্যাঁ আমিই। পিওন বলল, তা'হলে এ আপনার চিঠি; আপনার স্বামীর কাছ থেকে এসেছে। লেখকের নাম লেখা রয়েছে। সে চিঠিটি তার হাতে দিল। মা চিৎকার করে ঘোষণা করলো—তার কপট আনন্দ। বৃদ্ধাকে ডেকে বলল, মা তোমার ছেলের চিঠি এসেছে! ছেলেদের বলল, তোদের বাবার খবর এসেছে রে! চিঠিটা পড়বার তর্ সইছিলনা তাদের।

মা গা ধুয়ে পরিষ্কার একটি কোট পরে চুল আঁচড়িয়ে শুনলো—বৃদ্ধা বড়-জাকে ডেকে বলছে, ছেলের চিঠি এসেছে। বলতে বলতে আনন্দে খিল-খিল করে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে তার কাশি উঠলো। বুড়ো দুর্বল শরীরে প্রবল ঝাঁকুনি দেখে ভয় খেয়ে বড়জা ছুটে এলো। তার পিঠ মালিশ করে দিতে দিতে সে বলল, তা' বলে আত্মঘাতী হয়োনা, মা! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এলো মা। বড়-জা মৃদু হেসে বলল, চিঠি এসেছে, তাই বুড়ি এত ফুঁপাচ্ছে। উচ্ছল হাস্যে মা বলল, হ্যাঁ, চিঠি এসেছে, এই যে—! সে চিঠিখানি তার চোখের ওপর তুলে ধরলো।...রাস্তা দিয়ে যাবার সময় সবাই ঘিরে ধরলো তাকে। ছেলেটি তার সঙ্গেই যাচ্ছিল। কেউ জিগ্যেস করলেই সে বল্‌ছিল, তার বাবার চিঠি এসেছে। মার পোষাকের আঁচল ধরে ছোট মেয়েটিও চলেছে। তখন শীতের দিন। কারো কাজ ছিলনা। কর্ম-বিরত স্ত্রী-পুরুষেরা মার সঙ্গে পত্রলেখকের বাড়ি গেল। এমনি অপ্রত্যাশিত

জনতা দেখে সে অবাক হয়ে গেল। ঘটনাটা শুনে চিঠিখানি একটু পড়ে এপিঠ্-ওপিঠ্ উল্‌টে সে গম্ভীরভাবে বলল, তোমার স্বামীর চিঠি। মা বলল, আমিও তা অনুমান করেছি। প্রগল্‌ভা বিধবাটিও ছিল ভিড়ের মধ্যে। সে বলে উঠলো, তা'ছাড়া অন্য আর কার হবে, মশায়? জনতা যুগপৎ উচ্চ হাস্যধ্বনি করলো।

পত্রলেখক ধীরে ধীরে পড়তে লাগলো চিঠিখানি। সবাই শুনতে লাগলো নীরবে। মা শুনলো, ছেলেমেয়েরা শুনলো, জনতা শুনলো। থেমে থেমে, প্রত্যেকটি শব্দের মানে বলে দিতে লাগলো সে। কথ্যভাষা ও লেখার ভাষা এক নয়, তাছাড়া নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করা চাই তো। মা গভীর মনোযোগ-সহকারে শুনলো যেন পত্রের একটি বর্ণও সে আগে শোনেনি, ঘাড় নাড়লো প্রত্যেকটি শব্দ শুনে। পত্রলেখক সেই জায়গাটায় পৌঁছল—যেখানে টাকা পাঠানো হয়েছে লেখা আছে। যথাসম্ভব উঁচু স্বরে সে পড়লো এই অংশটা। জনতা হাই তুলে চেঁচালো, চিঠির সংগে কি টাকাও ছিল? ঘাড় নাড়লো মা, হাতের মুঠো খুলে দেখালো টাকা বদ্‌লে নেওয়া সেই নোটখানি। মা পত্রলেখককে নোটটি দিল। সে গম্ভীরভাবে বলল, হ্যাঁ, দশ টাকাইতো দেখছি।

জনতাকেও নোটটি দেখাতে হবে। কাগজে স্থূলকায় এক জেনারেলের ছবি ছাপা ছিল। ছবিটি দেখে চম্‌কে উঠে বিধবাটি বলল, ওমা! তোমার স্বামীর এমন পরিবর্তন হয়েছে? সে ভেবেছিল ছবিটি ওর স্বামীর। মা ছাড়া আর কেউ জোর করে বলতে পারলোনা—ছবিটি তার স্বামীর নয়। মা বলল, আমি জানি, এ ছবি আমার স্বামীর নয়। পত্রলেখক অনুমান করে বলল, এ তা'হলে ওর মনিবের ছবিই হবে! সবাই মিলে সাগ্রহে দেখলো ছবিটি। বলল, কেমন ধনী আর মোটাসোটা এ লোকটি! বিস্ময়ে ও ঈর্ষায় নির্বাক হলো জনতা। সবাই দেখলো, মা সেই মূল্যবান কাগজখানি ভাঁজ করে মুঠোর মধ্যে রাখলো।

চিঠিখানি পড়া হলো। ভাঁজ-করা চিঠিখানি খামে পুরে বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে বলল, খুব ভাগ্যবতী তুমি! ক'জন স্ত্রীলোকের স্বামী শহরে এমনি ভালো জায়গায় থাকতে পারে, কিংবা তার মাইনের টাকাগুলো এমনি করে পাঠায়—

যদিও শুনেছি—শহরে টাকা খরচ করবার জায়গার অভাব নেই।

মার প্রতি শ্রদ্ধায় জনতা পেছু নেয়। মা সগর্বে বাড়ি ফিরলো। মার গৌরবের অংশ গ্রহণ করে ছেলেমেয়ে চললো তার পেছনে। বাড়ি ফিরে বৃদ্ধাকে বলল সব কথা। সমাধিবস্ত্রটির কথা শুনে বৃদ্ধার মন আনন্দে ফেটে পড়লো, কর্কশকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো, আনন্দাতিশয্যে হাঁটু চাপড়ে বলল, আমার ছেলে! আমি জোর করে বলতে পারি—আমার ছেলের মতো ছেলেই হয়না। আর শহরের সেই জিনিসটা নিশ্চয় খুব সুন্দর হবে। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে সোৎসাহে বলল, দেখ বৌমা, ও যেমন বলেছে তেমনি ভালো কাপড় যদি হয়, তবে সেটা যতদিন বাঁচি ততদিন আর ছিঁড়বোনা। ঐটিই হয়তো আমার শেষ সমাধিবস্ত্র।

ঠাকুমার গাম্ভীর্য দেখে ছেলেটিও গম্ভীর হলো। আনুগত্যের সঙ্গে বলল, না ঠাকুমা, তা হবেনা। তুমি তো দু'টো জামা এরই মধ্যে ছিঁড়েছ, এটা তো আর দু'টোর মতো মজবুত হতে পারেনা!

বৃদ্ধার মনে স্ফূর্তি ফিরে এলো। ছেলেটার বুদ্ধি দেখে হেসে উঠলো সে। মাকে বলল, চিঠির কথাগুলো সবই তোমার ঠিক মনে আছে—যেন তুমি নিজেই চিঠিখানি পড়েছ।

প্রশান্তকণ্ঠে মা বলল, হ্যাঁ, প্রত্যেকটি শব্দই আমার স্পষ্ট মনে আছে। ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে সে নীরবে অশ্রুপাত করলো। হোক সে গর্বিত; তবু, এই চিঠিখানি আর এই কাগজের নোটখানি তো আসলে মূল্যহীন। তার নিঃসঙ্গতার কাছে এসবের দাম নেই—কোন অর্থ নেই। তবু, মার এ ফন্দীতে কাজ হলো বেশ। এর পর গাঁয়ের মধ্যে কেউ আর তাকে ঠাট্টা করেনা, ইঙ্গিত করেনা—তার স্বামী পালিয়েছে বলে। এবার তার মনকে একটু শক্ত করতে হলো বরং। সবাই জেনে গেছে তার টাকা আছে, এমনি আরো টাকা তার কাছে আসছে বছর। কেউ কেউ গোপনে টাকা ধার নিতে এলো তার কাছে। একজন—সেই বুড়ো পত্রলেখক, তা'ছাড়া দু'একজন নিষ্কর্মা লোকও এলো। অস্বীকৃতি জানাতে দস্তুরমতো বেগ পেতে হলো তার। পাড়ার সকলের সঙ্গেই একটা-না-একটা সম্পর্ক রয়েছে। তাদের সকলেরই পদবী "লী"। সে তাদের বুঝাল একথা-ওকথা বলে। বলল, ও-টাকা

দিয়ে তার ধার শোধ দিতে হবে, এরই মধ্যে সব টাকা খরচ হয়ে গেছে-- ইত্যাদি। বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে প্রতিবেশিনীদের কেউ তাকে সম্বোধন করলো। বিধবাটি অর্থপূর্ণভাবে তার সামনে বলল, এখন কাপড়ের সূঁচ-এর, জুতোর ফুল তোলার রেশমী ফিতের কী অসম্ভব দাম! বাড়িতে থাকলেই সবাই তাকে ডেকে বলতে লাগলো, তোমার অদৃষ্ট ভালো, তাই তুমি নিশ্চিন্তে খরচ করতে পার। তোমার স্বামী রোজগার করছে, তার ওপর তুমি নিজে জমির উপস্বত্বটা পাচ্ছ। কেউবা মন্তব্য করলো, আমাদের পাড়ায় এমনি ধনী মহিলা রাখাও নিরাপদ নয়। যে-কোন সময় পাড়ায় ডাকাত পড়তে পারে। ধন যেখানে ডাকাত সেখানে— যেমন মধু যেখানে সেখানেই মৌমাছি।

মার মনে হলো—ঐ এক টুকরো কাগজই যত অনর্থের মূল। বিধবাটি যা বলে বলুক গে। সবাই সেটি দেখতে আসে। তা'ছাড়া কাগজের টাকা সে এর আগে কোনদিন ব্যবহার করেনি। ঐ টাকার উপর অশ্রদ্ধা এলো তার। ভয় হলো—সেটা বাতাসে উড়ে যেতে পারে, ইঁদুরে কাট্‌তে পারে, ছেলেরা হাতে পেয়ে তার দাম না বুঝে ছিঁড়ে খেলা করতে পারে। প্রতিটি দিন তাকে দেখতে হবে—নোটটি চালের বাক্সের ভিতর নিরাপদে রয়েছে কিনা! মাটির দেয়ালের আর্দ্রতায় নোটখানি পঁচেও তো যেতে পারে। এ যেন এক দুঃসহ বোঝা! ভাশুরকে শহরে যেতে দেখে তাকে বলল, এই কাগজখানি ভাঙিয়ে নিয়ে এসো। তা'হলে আমি বুঝবো আমার হাতে টাকা আছে। এই কাগজটা হাতে নিলে এর কোন দাম আছে বলে মনেই হয়না।

সে ভাশুরকে নোটখানি দিল। ন্যায়পরায়ণ সে। প্রত্যেকটি টাকা বেশ করে পরীক্ষা করে নিয়ে সে নোটটি ভাঙালো। মার ঘরের দরজায় এসে একটির পর একটি বাজিয়ে দেখালো শব্দ ঠিক আছে কিনা। পাছে সে তাকে সংকীর্ণমনা মনে করে, তাই, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলল, একটা টাকা তুমি নাও, কষ্ট করে ভাঙিয়ে এনেছ, ধান কাটবার সময়-ও তুমি আমায় সাহায্য করেছ। আমি জানি, তোমার টাকার দরকার, বড়-জার ছেলে-পিলে হবে!

টাকার দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চেয়ে সে একবার ঢোক গিললো। চোখ দুটি আগ্রহে

মিটমিট করে উঠলো। টাকা সে নেবেনা। অত্যন্ত সৎ ও সাধু-প্রকৃতির লোক সে। ইচ্ছাটি তার মনে প্রবল হয়ে ওঠার আগে সে বলল তাড়াতাড়ি, না, তুমি একা মানুষ—আর আমি এখনও বেশ সক্ষম!

মা জানে—যত ভালই হোক না কেন, বেশিক্ষণ টাকার দিকে চেয়ে দুর্বল না হয়ে পারেনা কেউ। বলল, তা তোমার যদি কখনও টাকা ধার নিতে হয়—

মা তাড়াতাড়ি টাকাগুলো তুলে নিল।

সেই রাত্রিতে যখন ছেলে-মেয়ে আর বৃদ্ধা ঘুমালো তখন মা উঠে মোমবাতি জ্বালিয়ে নিড়ানী দিয়ে ঘরের মেঝেতে একটি গর্ত খুঁড়ে ন্যাকড়ায় মুড়ে লুকিয়ে রাখলো সেই টাকা দশটি। মোষটি তার ডাগর উদাস দৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকিয়ে রইলো, খাটের নীচে মুরগীটি জেগে তার দিকে চাইলো, রাত্রিতে এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে দুর্বলভাবে ডাকলো। মা গর্তটি ভরিয়ে দিয়ে তার উপর হেঁটে বাকী অংশের সংগে মিলিয়ে জায়গাটি সমান করে দিল। তারপর সে অবার শুয়ে পড়লো অন্ধকারে। কিন্তু আশ্চর্য! বিছানায় শুয়ে অর্ধস্বপ্নাতুর অবস্থায় ভুলে গেল—সে নিজের টাকাই পুঁতে রেখেছে। মনে হলোনা—এ অর্থ পাওয়া গেছে—সে যে ধান কেটেছে শ্রান্তিতে নুয়ে-নুয়ে—তারই থেকে। বোধ হলো, সত্যিই তার স্বামী এ টাকা পাঠিয়েছে। এ যেন উদ্বৃত্ত, তার নিজের টাকার অতিরিক্ত! মনে মনে বলল, ও যে টাকাটা নিয়ে গেছে আর তার সেই নীল জামাটার জন্য খরচ করেছে—এটা তারই জায়গায় রইলো। এ তো তার চেয়েও বেশি! স্বামীর ব্যবহারের জন্য মনে মনে সে তাকে ক্ষমা করলো। তাই চোখে তার ঘুম নামলো।

এর পর কেউ এসে সেই নোটখানি দেখতে চাইলে সে শান্তভাবে উত্তর দিল, ভাঙিয়ে খরচ করে ফেলেছি। একথা শুনে তার ঢিলে মুখখানি ফাঁক করে বিধবাটি বলল, সবটাই কি খরচ করেছ? মা সহজভাবে উত্তর দিল, হ্যাঁ, এটা-ওটা—দু'একটা নতুন হাঁড়ি, কাপড় আর খুঁটিনাটি কিনতেই সব টাকা খরচ হয়ে গেছে। টাকাটা খরচ করবেনা-ই-বা কেন—আরো টাকা তো আসছে। ঘরে ঢুকে সে নিয়ে এলো স্বামীর জন্য তৈরী-করা নতুন জামা-কাপড়। বলল, ঐ টাকা থেকে এসব কিনেছি। আঙুল দিয়ে টিপে দেখে সবাই বলল,

বেশ, ভালো মজবুত কাপড়! অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিধবা বলল, সত্যিই তুমি সুগৃহিনী। ঐ টাকা দিয়ে সকলের জন্য সমান কাপড় কিনেছ দেখছি—সুধু তোমার আর ছেলেমেয়েদের জন্য নয়—স্বামীর জন্যও।

স্থিরভাবে মা বলল, আমি আর আমার স্বামী পরস্পরের ওপর সন্তুষ্ট কিনা! তবে, আমার জন্য আরও কিছু অতিরিক্ত খরচ করেছি। একজোড়া ইয়ারিং আর একটি আংটির বায়না দিয়েছি। আমার স্বামী বলতো, সম্ভব হলে ও দু'টো জিনিস যেন আমার হয়।

এসব কথা শুনে বৃদ্ধা জোর গলায় বলল, আমার ছেলের যেমন কথা তেমন কাজ! আমার জন্য একটি ভালো কাপড়ের সমাধি-বস্ত্র কিনবে। খুব ভালো ছেলে সে। তোমাদের সকলের, বিশেষ করে আমাদের বড়-বৌ-এর যেন এমন একটি ভাল ছেলে হয়!

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। প্রতিবেশিনীরা হাসতে হাসতে চলে গেল একে একে। সবাই চলে গেলে মার অন্তর গুমরে উঠলো সুদীর্ঘ এই কাহিনী বর্ণনা করে। সে নিজেকে ভর্ৎসনা করলো। মনে মনে বলল, যেটুকু বলেছিলাম তাতে সন্তুষ্ট না থেকে গল্পটাকে দীর্ঘতর করবার কী প্রয়োজন ছিল? গহনা-গুলো কিনবার টাকা পাবো কোথায়? তবু, যে কোন উপায়ে মুখের কথা ঠিক রাখতে হবে!

স্বেচ্ছায় নিজের উপর আরোপিত এ বোঝার কথা চিন্তা করে সে দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

॥ সাত ॥

আবার বসন্ত এলো। এখন মাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে মাঠে। সে ছেলেটাকেও কাজে লাগিয়ে দিল। তাকে শিখিয়ে দিল কেমন করে মোষ চালাতে হয়। ছেলেটি ছোট ও পাত্‌লা। সে তাই লাঙ্গল চালাতে পারেনা, কিন্তু মোষটার পেছন পেছন হেঁটে তার পুরু চামড়ার উপর বেত মারতে পারে। মোষের পুরু চামড়ায় বেতের আঘাত লাগেনা। এজন্য মা বাঁশের মাথায় একটি ধারাল গোঁজ বেঁধে দিয়েছে, আর পশুটিকে গোঁজ দিয়ে মারবার

আদেশ দিয়েছে যাতে পশুটি কুঁড়েমি না করে।

ছোট মেয়েটিকেও মা দু'একটি খুঁটি-নাটি কাজে লাগায়। বয়সের সংগে সংগে অলস হয়ে পড়েছে বৃদ্ধা। সুধু ক্ষুধাতৃষ্ণা ছাড়া আর কোন কথাই মনে থাকেনা তার। ছোট ছেলেটি কাঁদলেই সে একটু নড়ে। ওকেই সে ভাল-বাসে সব চেয়ে বেশি। মা মেয়েটিকে পুকুর থেকে দুপুর বেলাকার চাল ধুয়ে আনা শিখিয়েছে। মাঠে বেরোবার আগেই সে তাকে দিয়ে কাজটা করিয়ে রাখে—পাছে সে পুকুরে পড়ে ডুবে যায়। সে এত ছোট যে কড়াইর ঢাকনি-ও নাগাল পায়না। তবু, মা তাকে ভাত রান্না করা শিখিয়ে ফেলেছে। এমনকি, আগুন ধরানো পর্যন্ত শিখিয়ে দিয়েছে। মেয়েটিও কাজ-গুলো ভালভাবেই শিখে নিয়েছে। ধোঁয়া হলে সে স্থিরভাবে বসে চোখ কচলায়, অনুযোগ করেনা কোন কিছু। সে বোঝে—তার বাবা নেই বাড়িতে, মাকেই তাদের জন্য সব করতে হয়। কাজ শেষ হলে সে অন্ধকার ঘরে ঢোকে। সেখানে বসে পুরানো কাপড়খানি দিয়ে চোখের জল মুছে, নীরবে সয়ে যায় যন্ত্রণা। শিশুটি হাঁটতে পারে এখন। বসন্ত এসেছে। শীতের সময় তার গায়ে তুলোভরা ভারী কাপড় জড়ানো ছিল। সে তাই হাঁটবার চেষ্টা করতে পারেনি। এমনকি, মাটিতে পড়ে গেলেও কেউ তুলে না দেওয়া পর্যন্ত উঠতে পারতোনা। এখন সে সবই খায়। মার বুক প্রায় শুকিয়ে গেছে, তবু তাকে স্তন খাইয়ে সে নিরাসক্ত তৃপ্তি লাভ করে। শিশুটি আঁকড়ে থাকে তার বুকে। রাত্রিতে তাকে বাড়ি ফিরতে দেখে কেঁদে তার কাছে দৌড়ে যায়—তারই জন্য সঞ্চিত সামান্য খাবারটুকু পাওয়ার আগ্রহে। সে এক ভাষা-হীন মধুর আনন্দ!

এমনি করে আসে নব বসন্ত—পরিপূর্ণ, শান্ত মধুঋতু। মা ছেলেটিকে পাশে রেখে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে। মাঠ চষা হয় কোন মতে—অবশ্য, গত ক'বছর ধরে তার স্বামী যেমন সোজা আর গভীর করে মাটি খুঁড়ে এসেছে আর সে সুধু বীজ বপণ করেছে, তেমন ভাবে নয়। সীম লাগানো হলো। কপি আর মুলো বাজারে বিক্রি করতে হবে। সর্ষে গাছগুলোতে ফুল ফুটলো আবার। মাথা গজালো সীমের, হলদে আর সোনালি ফুল ফুটে উঠলো। মাঠে কাজের ভিড়ে সে স্বামীকে প্রায় ভুলেই গেল। রাত্রিতে সে

এত অবসন্ন হয়ে পড়ে আর ঘুমে এমনি অচেতন হয় যে ভোরে উঠতে পারেনা আবার।

কিন্তু তার স্বামীকে মনে পড়লো আবার।...বড়-জার প্রসবকাল উপস্থিত হলো। সে তার একটি বাচ্চাকে পাঠালো মাকে ডাকতে। সে তার বান্ধবী, নিকটতম প্রতিবেশিনী। বাচ্চাটি যেখানে মা কাজ করছিলো সেই মাঠে এলো। বসন্তের মধুর বাতাসে গায়ের ঢিলে কোটটি উড়ছিল আর সেই সঙ্গেই ঘামটা ঠাণ্ডা করে দিচ্ছিল।

বাচ্চা মেয়েটি এসে বলল, কাকিমা, কাকিমা, মার সময় হয়েছে, তাই তোমাকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে যেতে বলল। শিগ্‌গির চল, মা তোমারই জন্য বসে আছে, গিয়েই ভাইকে ধরতে পারবে।

পেছন ফিরে উত্তর দিলে মা, আচ্ছা, বলগে—আমি আস্‌ছি। তার ছেলেটির দিকে ফিরে বলল, আমার নিড়ানীটি নিয়ে ততক্ষণ ভাল করে সীম গাছের গোড়ায় আগাছাগুলো তোল। আর আর বারের মতো যদি তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তো ওখানে আমার ঘণ্টাখানেকের বেশি দেরী হবেনা।

মা মাঠের উপর দিয়ে চললো। মেয়েটি আগে আগে ছুটলো, আর মা তারই পিছু পিছু চলেছে। যেতে যেতে নতুন করে তার মনে হলো—কী মধুর এই দিনটি! এই উপত্যকায় সে বাস করে, কাজ করে যায়—দিনের পর দিন। চারদিকের পৃথিবীর পানে তাকাবার জন্য মাথা তোলবার চিন্তাও তার মনে কখনও জাগেনি। তার মনখানি ঘিরে রয়েছে—জমি আর তার সংসার। সারাক্ষণ তাদেরই উপর রয়েছে তার দৃষ্টি। যেতে যেতে সে মাথা তুলে দেখলো—উইলো-গাছগুলো উজ্জ্বল কোমল হরিৎপত্রে ভরে উঠেছে, নাসপাতি গাছের প্রস্ফুটিত মুকুলগুলি বাতাসে উড়ছে, ডালিমের কচিপাতায় ঈষদারক্তিম বর্ণচ্ছটা। থেকে থেকে উষ্ণ বাতাস বয়ে যাচ্ছে। সে বুঝতেই পারলোনা চষা-মাঠের নিবিড় নীরবতার মধ্যে বেরিয়ে-আসা মাটির ঘ্রাণ আর দম্‌কা হাওয়ার গন্ধ—এ দু'য়ের কোন্‌টি মধুরতর। এই নীরবতা ও দম্‌কা হাওয়ায় চলতে চলতে সে অনুভব করলো—পরিপূর্ণ, সমর্থ ও নবীন হয়ে উঠেছে তার দেহখানি। স্বামীর জন্য একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আচ্ছন্ন হলো দেহ-মন।

প্রায় প্রতিটি বসন্তে—বিবাহের পর প্রায় প্রতি বসন্তেই, সন্তান প্রসব করেছে সে। কিন্তু এবার বসন্তে তার দেহটি শূন্য। একদা সন্তান-ধারণ তার পক্ষে ছিল সাধারণ, স্বাভাবিক, পৌণপৌণিক। আজ মনে হলো তার জীবনে সে ছিল এক অপরিসীম আনন্দ। নিঃসঙ্গতার বেদনা আজ তাকে পীড়িত করে তুলল। স্বামী ফিরে না এলে এমনি বসন্তে সে আর সন্তান ধারণ করতে পারবেনা—একথা মনে হতেই স্তনে ব্যথা অনুভব করলো। এই কামনা অতর্কিতে ক্রন্দন হয়ে বেরিয়ে এলো যেন—ফিরে এসো, ফিরে এসো!

নিজের কানে সে শুনতে পায় নিজের কান্না। সে থমকে দাঁড়ালো ভয়পেয়ে মেয়েটিও শুনে ফেলেনি তো? সে জোরে চিৎকার করেনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে শোনে বাতাসের শব্দ আর ডালিমগাছে কোকিলের সমধুর সংগীত। আঁধার ঘরে ঢুকে সে দেখলো বড়-জার গোল মুখখানি শুকিয়ে এসেছে, ম্লান হয়ে গেছে ঘামে, মুখের স্বাভাবিক হাসি অন্তর্হিত হয়ে বেদনার গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে। মা অনুভব করলো-তার নিজের দেহখানি ভারী ও পূর্ণ হয়েছে—যেন সন্তান হচ্ছে তার নিজেরই,—তার বড়-জার নয়। শিশুটি ভূমিষ্ঠ হলে তাকে সে এক টুকরো কাপড়ে মুড়ে রাখলো। তার কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবার সে মাঠে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু সে যেতে পারলোনা। উদ্দেশ্যহীনভাবে সে গেল তার নিজের বাড়ি। বৃদ্ধা জিগ্যেস করলো, খাবার সময় হলো নাকি? কিন্তু আমার তো—এখনও খিদে পায়নি। চোখের উপর হাতখানি রেখে দৌড়ে এসে মেয়েটি বলল, উনোন ধরাবার সময় হয়েছে, মা? মা তেমনিভাবে জবাব দিল, না সময় হয়নি এখনও। আজ আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, একটু বিশ্রাম করবো। মা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

কিন্তু বিশ্রাম করতে পারলোনা সে। একটু পরেই উঠে ছেলেটিকে তুলে ধরলো সজোরে, বুক খুলে তাকে স্তন দিতে চাইল। অনভ্যস্ত এই উগ্রতায় অবাক হয়ে গেল শিশুটি। তখনও ক্ষিদে পায়নি তার, খেলায় তখন তার মন। সে গড়াগড়ি দিয়ে সোজা হয়ে সরে গেল অনিচ্ছায়। মার মনে জেগে উঠলো এক বিচিত্র ক্রোধ। সে তাকে মেরে জোরে মাটির উপর বসিয়ে দিল। চিৎকার করে উঠলো ছেলেটি। অস্ফুটস্বরে মা বলল, যখনই আমার ইচ্ছা

থাকেনা তখনই তুই স্তন খাবি, আর আমি যখন তোকে খাওয়াতে চাই, তখন তোর ক্ষিদে থাকেনা!

শিশুটিকে মাটিতে পড়ে কাঁদতে দেখে এক অদ্ভুত তৃপ্তি বোধ করলো মা। কিন্তু ছেলেটির কান্না শুনে চিৎকার করে উঠলো বৃদ্ধা। মেয়েটি দৌড়ে এল তাকে কোলে তুলে নিতে। মার মনের কোমলতা ফিরে এলো। সে মেয়েটিকে নিতে দিলনা। নিজেই একটানে তুলে নিল, গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিল, অশ্রু-সিক্ত মুখখানি হাত দিয়ে মুছে দিল। তার নিজের বেদনার জন্য ছেলেটিকে কষ্ট দিল বলে মনে মনে নিতান্ত লজ্জা অনুভব করলো......

কিন্তু সেদিন থেকে ছেলেটি তার দুধ খাওয়া ছাড়লো। যে সামান্য তৃপ্তি-টুকু ছিল তা' থেকেও বঞ্চিত হলো মা।

॥ আট ॥

যৌবনাবধি সর্বদাই গভীর স্নিগ্ধ উত্তাপে ভরা এই স্ত্রীলোকটি। এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছে যারা চট্ করে যুবকের দিকে তাকিয়ে কিংবা কাউকে যেতে দেখে তার গুণাগুণ বিচার করে ফেলে। মা কিন্তু তেমন নয়। তার অন্তর লজ্জায় কানায় কানায় ভরা। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত একা থাকলেও সে কখনও পুরুষের কথা ভাবেনি, মনে বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা জাগলেও কারো পানে তাকিয়ে দেখেনি—কে এলো, আর কেনই বা এলো। অবিচল ধৈর্যের সঙ্গে সে কাজ করে যেতো,—নীরব প্রতীক্ষায় চেপে রাখতো তার উদ্দীপনা। বিয়ের পরেই সে চিনলো এই একটি লোককে, একান্তভাবে অনুভব করলো তার প্রয়োজন। তখনই তার মধ্যে এলো স্পষ্টতা, গভীর মৌন কামনা কতকটা পরিষ্কার হয়ে উঠলো। সময় সময় সে স্বামীকে তিরস্কার করতো—তার উপর রাগ করতো। তবু সে জানতো—তাকে ছাড়া সে বাঁচতে পারেনা। মনের সেই জমাট অশান্ত কামনা পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রিয় স্বামীর প্রতি অকারণ ক্ষোভ বিদ্যুৎভরা মেঘের মত পুঞ্জীভূত হতো মার মনে। তারপর দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরতো। সেই পুরানো সহজ নিয়মেই চরম-পুলক লাভ করে শান্ত হোত আবার।

তবু, এই লোকটাই সব নয়, তার নিজের মধ্যে সে সম্পূর্ণ নয়। তার থেকে গর্ভ-ধারণ করতে হবে, অনুভব করতে হবে শরীরের অভ্যন্তরে শিশুর জন্ম ও বৃদ্ধি! এ কাজও সম্পূর্ণ হলো। শিশু নড়লো, বড় হতে লাগলো, আশার পরিপূর্ণতায় আনন্দে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলো সে। তার পায়ের কাছে বসে ছেলেমেয়ে যখন কাঁদতো কিংবা এটা-ওটার জন্য ঘ্যান্-ঘ্যান্ করতো অথবা অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মতো বায়না ধরতো, তখন তাদের উপর রাগ হলেও সে মধুর দৈহিক তৃপ্তির সঙ্গে নিজ অঙ্গে সন্তান সম্ভাবনার চিহ্ন লক্ষ্য করতো। সে খাচ্ছে, বিশ্রাম করছে, ঘুমোচ্ছে। তার দেহের যেন আর কোন প্রয়োজন নেই।

শিশুকে সে ভালবাসে চিরদিন। এই পল্লীর চেয়ে একটু বড় একটি পাহাড়ী পল্লীতে তার বাবার বাড়িতে সে যখন কুমারী ছিল তখনও সে এমনি ছিল। সেখানে ছেলেমেয়ে ছিল অনেকগুলো, সে ছিল সকলের বড়—তাদের মার মতো। তবু, সারাদিনের পরিশ্রমে সে যখন ক্লান্ত হোত আর ছেলেমেয়েরা তার পায়ে পায়ে ছুটতো তখনই হোত তার পরীক্ষা। সে উচ্চৈঃস্বরে তার কাছ থেকে তাদের সরে যেতে বলতো। শিশুদের প্রতি তার ভালবাসার কার্পণ্য ছিল না এতটুকুও। তাদের ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা তার অন্তরকে দুর্বল করে ফেলতো। প্রায়ই সে নিজের ঘরের কিংবা কোন প্রতিবেশীর একটি-না-একটি শিশুকে তুলে নিয়ে শুঁকতো—সজোরে, শিশুটি যতক্ষণ সইতে পারতো ততক্ষণ আদর করতো। ছোট শিশুকে ধরে সে পেতো গভীর অকারণ আনন্দ। কচি ও তারই উপর নির্ভরশীল যা' কিছু সবই তার অন্তরে দাগ কেটে যেতো। বসন্তে তার প্রিয় ছিল ডিমের খোলস থেকে বেরিয়ে-আসা মুরগীর বাচ্চাগুলো। কোন কারণে কোন মুরগী আধা-তা' দেওয়া ডিম রেখে বাসা ছেড়ে গেলে সে ডিম-গুলো একটি থলিতে ভরে নিয়ে সেগুলো তাদের গরম মাংসের নিচে গড়িয়ে দিত সন্তর্পণে। ডিমগুলোতে আবার তা' দেওয়া আরম্ভ হলেই চলে আসতো ধীর-পদক্ষেপে। ছোট গুটি পোকাগুলোকে সে সযত্নে খাওয়াতো তাদের বৃদ্ধি দেখতো আনন্দের সঙ্গে। পোকাগুলো জীবন্ত সুতোর মতো সরু অবস্থা থেকে বড় হোত, গুটি ফোটাতো, বেরিয়ে আসতো কীট আর তার

জোড়া—পোকা থেকে পোকা। তখন সে নিজের শরীরেও ঠিক তেমনি তৃপ্তি অনুভব করতো, আকুল হয়ে উঠতো মন।

পিতৃগৃহের শিশুরা সবে শৈশবাবস্থা কাটিয়ে উঠেছে, আর তার বিয়ের সময় আসন্ন এমন সময় ঘটলো একটি ঘটনা। কোন পুরুষ অদ্যাবধি তাকে এমন উত্তেজিত করতে পারেনি। তাদের প্রতিবেশীর ছোট্ট একটি ছেলে ছিল। বেশ মোটা-সোটা ছেলেটি। সে হাঁটতে শেখেনি তখনও। শিশুটির বড় বোন পিঠে কাপড় বেঁধে সারাটি গ্রীষ্মে উলঙ্গ সেই শিশুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। মা তখন তরুণী। বিয়ের দিন গুণছে। মেয়েটির পিঠ থেকে কাপড়টি খুলে সে মাঝে মাঝে শিশুটিকে নিত। ছোট্ট মেয়েটি কিছুক্ষণের জন্য পিঠের ভার মুক্তির আনন্দে ছুটতো খেলায়। প্রতিদিন তরুণী মা খুঁজতো এই চাঁদ বদন ছেলেটিকে। গাঁয়ের আর সব শিশুর চেয়ে তাকেই বেশি ভালো লাগতো তার। মার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলো সে। তাকে ধরে মোটা হাতের তালু শুঁকে, গোল-গাল দুটো আর গোলাপী মুখখানি স্পর্শ করে সে আনন্দ পেতো, কটিদেশে বসিয়ে শিশুটিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। মার মা তাই দেখে বলতো, আমাদের বাড়িতে কি ছেলের অভাব যে পরের ছেলে কোলে করে বেড়াতে হচ্ছে তোর? তখন সে বলতো, ছোট ছেলে কোলে নিতে আমার কোন কষ্ট হয়না, মা!

শিশুটি অজ্ঞাতে মার মনে এক অনাস্বাদিত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিল। মনে মাতৃত্ব জাগলো তার। একদিন তার নিজের ছেলে হবে। সে জানে—এ তার অধিকার। এই স্থূলকায়, শান্ত চক্ষু শিশুটি যেন তার মধ্যে সন্তান-কামনার চেয়েও বেশি একটা কিছু জাগ্রত করলো। শিশুর সঙ্গে অকারণ খেলার চেয়ে বড় হয়ে উঠল গভীর, গোপন একটা কিসের কামনা!

ছেলেটি কোলে থাকলে সে নানা অজুহাতে তার সঙ্গে একা থাকতে চাইতো। সবাই ব্যস্ত থাকতো নিজেদের কাজে—এখানে-ওখানে, মাঠে, হেঁসেলে। শিশুর বোনটি ছাড়া পেয়ে খুসী হতো। মা শিশুটিকে কাছে টেনে নিয়ে বসে বসে তার সঙ্গে অস্পষ্ট অর্থহীন ভাষায় কথা বলতো, জড়িয়ে ধরে আদর করতো, ছোট্ট স্থূল গোলগাল অসহায় দেহটি দেহের উপর চেপে ধরতো। তখনও দাঁত গজায়নি শিশুটির। তাই সে মাঝে মাঝে চাল বা কেক চিবিয়ে

তার ঠোঁট থেকে শিশুটির ঠোঁটে পুরে দিত। চিবোতে চিবোতে হঠাৎ মুখের ভেতর খাবার পেয়ে অবাক হয়ে যেতো শিশুটি। হেসে উঠতো মা, কিন্তু জানতোনা তার কারণ। তার মনে জাগতো তীব্র গভীর বেদনা—দুর্নিবার এক স্পৃহা। নিবৃত্তির উপায় খুঁজে পেতোনা সে।

তার বিয়ের কিছুদিন আগে।

সেদিন শিশুটি তার কাছে ছিল একা। দুপুর হলো। ছোট মেয়েটি অন্যান্য দিনের মতো খাওয়াবার জন্য শিশুটিকে মার কাছে নিয়ে যেতে এলোনা। সে মাথা ঝেড়ে ঝেড়ে কাঁদতে সুরু করল। কিছুতেই শান্ত করা যায়না। তার ক্ষিদে দেখে মা ধমনীর রক্তে এক অজানা আবেগ অনুভব করলো। সে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। কম্পিত-হস্তে খুললো তার কোর্টটির বোতাম। শিশুটিকে রাখলো তার তরুণ কোমল বুকের উপর। রাক্ষুসের মতো স্তনটি ধরে সজোরে চুষতে লাগলো শিশুটি। শিশুটির মুখের দিকে চেয়ে সেই মুহূর্তে তার রক্তে উঠলো অপ্রত্যাশিত, স্বপ্নাতীত এক মহা কোলাহল। তার চোখে জল এলো, ঠোঁট দিয়ে শব্দ বেরুল—ভাঙা শব্দ—কথা নয়। শিশুটিকে জড়িয়ে ধরে রইলো সে। শিশুটির এই উষ্ণ স্পর্শের চাইতেও উত্তেজক এক অপূর্ব মাদকতায় সে আচ্ছন্ন। কেটে গেল সেই ক্ষণ। শূন্য তার বুক। হতাশায় কেঁদে উঠলো শিশুটি। সে তার কোর্টটি বাঁধলো। এ কাজের জন্য লজ্জা বোধ করলো। শিশুটির বোন দৌড়ে এসে তাকে তুলে নিয়ে আবার ছুটে চলে গেল তার মার কাছে। তরুণীর কাছে এই মুহূর্তটি ছিল এক জাগরণ—বিবাহের চেয়ে বড়ো। এর পরেও, যার সংগে তার বিয়ে হয়েছিল তাকে সে ভালবাসতো। সে ছিল তার মাতৃত্বের সহায়ক। সুধু তার নিজেরই জন্য স্বামীকে ভালবাসতোনা। তার উদ্‌গত যৌবনের দিনগুলো ছিল এমনি। এখন-ও তার দেহে যেন পরিপূর্ণ জোয়ার। সে জানে তার নারীত্বের পরিপূর্ণতার কথা। তবু, সে একা, পরিত্যক্তা। ছেলেমেয়েরা একটু একটু করে বাড়ছে প্রতিটি দিন, ছাড়িয়ে উঠছে তাদের শৈশবাবস্থা। মার মনে হয় তারা পর হয়ে যাচ্ছে তার কাছে।

বড় ছেলেটি লম্বা, পাতলা গম্ভীর। খুব কম কথা বলে সে। একান্ত আনুগত্যের সংগে মার কাজের অংশ গ্রহণ করে। দিনের শেষে মা বাড়ি

ফেরবার জন্য শক্ত কাঠের লাঙগলখানি কাঁধে নিতে গেলে সে-ই লাঙগলটি তার অপরিসর কাঁধে তুলে নিয়ে জোয়ালের মতো ধরে চষা-মাটির উপর দিয়ে হেলে-দুলে অগ্রসর হয়। মা প্রায়ই বড় শ্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই তাকে এ কাজে বাধা দেয়না। সে-ই এখন কুয়ো থেকে জলের বালতি টেনে আনে, মোষটাকে খাওয়ায়, মাঠে তার বরাদ্দের বেশি কাজ করে—যেন সে নিজেই তার বাবা!

তবু, নিষ্ঠার সঙ্গে তার কাজের অংশভাগী হওয়া সত্ত্বেও, সে যেন দূরে সরে যাচ্ছে তার মার কাছ থেকে। মনে হয়—স্বেচ্ছায়, দুর্বোধ্য এক উপায়ে সে তার মাংস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সে যেন তার কাছে থাকতে চায়না, দাঁড়াতে চায় দূরে, মাকে ঘিরে যেন রয়েছে একটা দুর্গন্ধ যা সে সইতে পারেনা। প্রায়ই, সামান্য কারণে তাদের ঝগড়া সুরু হয়। মা ছেলেকে নিড়ানীটি ভালো করে ধরতে বললে সে তা' না শুনে নিজের মতো করেই ধরে; দেখায়—ও ভাবে ধরলে কাজে যুৎ পায়না সে। এমনি, আর এর চেয়ে আরও ছোট-খাটো বিষয়ে কোন্দল করে তারা। কিন্তু, দু'জনেই অস্পষ্টভাবে জানে—তাদের ঝগড়ার আসল কারণ—দু'জনেরই অনুভবের বাইরে গভীর একটা কিছু। অর্ধঅন্ধ মেয়েটিও মাকে আনন্দ দিতে পারেনা। তবু, অসাধারণ ধৈর্যশীলা সে। আগের মতো অনুযোগ সে করেনা। ছোট ছেলেটি হাঁটতে শিখেছে, ছুটতে শিখেছে। সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে রাস্তায় ছুটো-ছুটি করতে ও খেলতে সে ভালবাসে। যেখানে তার মা আর দাদা কাজ করে সেখানে মেয়েটি মাঝে মঝে আসে। মাঠে তার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার চেয়ে তাকেই সাহায্য করতে হয় বেশি—বিশেষ করে মাঠের গাছগুলো যখন ছোট থাকে তখন। তার দৃষ্টি এত ক্ষীণ যে অনেক সময় সে আগাছা ভেবে চারা গাছগুলোকে উপ্‌ড়ে ফেলে। ছেলেটি রাগে চিৎকার করে বলে, তুই বাড়ি যা বলছি, এখানে তোর কোন দরকার নেই। বাড়ি গিয়ে ঠাকুমার পাশে বোস্‌গে যা।

মর্মাহত হয়ে অর্ধস্ফীতাননে সে উঠে দাঁড়ায়। ছেলেটি তীব্র কণ্ঠে আবার বলে, দেখ্‌ তো কোথায় পা দিচ্ছিস্‌, কোথাকার আপদ একটা, গাছগুলো মাড়াচ্ছিস্‌ তো!

সে তাড়াতাড়ি মাঠ থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে। মাঠে না—থাকাই বরং গৌরবের। মায়ের স্নেহ ছেলে ও এই হতভাগ্য অর্ধ-অন্ধ মেয়েটির মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। তবু, মা জানে—বয়সের পক্ষে বেশি কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত ছেলেটি, বেদনায় ধৈর্য পরায়ণা মেয়েটির অ,তরের ব্যথা সে মর্মে মর্মে অনুভব করে। মেয়েটি এলে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সত্যিই যে তুই কাজের অনুপযুক্ত। ঐ চোখ নিয়ে তো সেলাই-ও করা যায়না। বাড়ি গিয়ে বরং মেঝেটা ঝাঁট দিয়ে খাবারটা ঠিক করে রেখে আগুনটা ধরিয়ে ফেলগে। ও—কাজটা তুই বেশ ভালই পারিস্। বাচ্চাটিকে দেখিস্, যেন পুকুরে পড়ে না যায়। সে তোদের সবার চেয়ে সাহসী আর জেদী। তোর ঠাকুমাকে একটু চা ঢেলে দিস্। তোর কাজ ওখানে, তুই সুধু আমায় এই সাহায্য করতে পারিস্। একটু সময় পেলেই আমি তোর চোখের একটা মলম নিয়ে আসবো।

এমনি করে মেয়েটিকে সান্ত্বনা দেয় সে। কিন্তু মেয়েটি তাকে তৃপ্ত দিতে পারেনা এতটুকু। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থিরভাবে স্মিতমুখে বসে সে তার সিক্ত, যন্ত্রণাতুর চোখের পাতা রগড়ায়। মা মাঝে মাঝে তার দিকে চায়। বড় ছেলেটির রাগ ও ছোট ছেলেটির খেলায় আগ্রহ দেখে অবাক হয়ে ভাবে—যখন শিশু ছিল তখন ওরা তার কাছে ছিল সুন্দর, আনন্দ-দায়ক। এখন তাদের পানে চেয়ে তার অন্তরে পুলক শিহরণ জাগেনা।

হ্যাঁ, প্রায় সন্ধ্যায় মা ভাশুরের ঘরের পানে তাকায়। তীব্র ঈর্ষা জাগে তার মনে। সেখানে গৃহকর্তা উপস্থিত—সরল, ন্যায়বান, শান্ত মাটিমাখা মানুষটি। তার স্বামীর মতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর নয় সে। তবু, ভালো। সে পুরুষের যেমন উচিত তেমনি, রোজ মাঠে যায়, বাড়ি এসে খেয়ে ঘুমোয়। বাড়িতে রয়েছে তার সন্তানেরা। বিনা কষ্টে, স্বাভাবিক গতিতে তাদের জন্ম হয়েছে। বাড়িতে বড়-জা শিশুটিকে হাঁটুর উপর নিয়ে বসে থাকে সহজ আনন্দে, পরম তৃপ্তিভরে,—আনন্দে উচ্ছল তার আত্মা, মুখে অফুরন্ত ভাষা। সে বেশি কথা বলে। তবু সে সদাশয়া, সুপ্রতি-বেশিনী। সে প্রায়ই মাকে মাংস রেঁধে খাওয়ায়, ছেলেদের একমুঠো ফল দেয়, মেয়েটিকে দেয় তারই তৈরী ছোট্ট একটি মাথার ফুল। পরিপূর্ণ আনন্দময় সেই গৃহটি। মার ঈর্ষা হয় তার উপর, মনে দেখা দেয় গভীর অস্বস্তি অতৃপ্ত লালসা!

॥ নয় ॥

এ-ও বরং ভালো হোত—যদি সে ঐ লোকটিকে ভুলতে পারতো, ছিন্ন করে দিতে পারতো তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক, দেখতো—তার স্বামী মারা গেছে, সমাধিস্থ করা হয়েছে তাকে, সে চিরতরে বিদায় নিয়েছে! যদি সে বিধবা হতো, বুঝতো—ওই লোকটির সঙ্গে তার জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে! পল্লীর লোকেরা যদি তাকে বিধবা বলে জানতো, আর সে সেই বৈধব্যকে পবিত্র ও সংযতভাবে রক্ষা করতে পারতো, যদি পথ চলতে স্বকর্ণে শুনতো কিংবা জানতো—লোকে বলছে—স্বর্গীয় "লী"র স্ত্রী অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী বিধবা, ঐখানে রয়েছে "লী"র কবর, ঐ তার স্বামী-পরায়ণা স্ত্রী চলেছে ধীর শান্ত পদক্ষেপে। তখনকার দিন হলে, তার সম্মানার্থে মার্বেলের না হলেও অন্ততঃ পাথরের একটি বেদী তৈরী হতো! এ কথায় সে হয়তো উৎসাহ পেতো, নির্ভর করতে পারতো, মানুষের গড়া এই বেশে সন্তুষ্ট থাকতে পারতো, তার জীবন এর চেয়ে সহজ হোত। অথচ এখনও সবাই তাকে ভাবে তাই।

কিন্তু বিধবা নয় সে। অনেকে জিগ্যেস করে—তার স্বামী কেমন আছে? সর্বদাই সে প্রসন্নভাবে মিথ্যা বলে। এই মিথ্যার মধ্যে নিয়তই স্মরণ করে স্বামীকে। লোকে শুধোয়, কেমন আছ বৌ? চিঠিতে কিংবা লোক মারফৎ তোমার স্বামীর কোন সংবাদ পেয়েছ কি?

কাঁধে বোঝা নিয়ে হাটে যেতে যেতে, কিংবা খালি ঝুড়ি নিয়ে অবসন্নভাবে ধীরে ধীরে বাড়ি ফেরার পথে, প্রায়ই তাকে উত্তর দিতে হয়, হ্যাঁ, খবর পেয়েছি। শুনেছি ভাল আছে। ও আমায় বছরে একবারের বেশি চিঠি লেখেনা!

বাড়ি ফিরে এই মিথ্যা-ভাষণের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ে। অন্তর কখনও-বা বিষাদ ও নিঃসঙ্গতায় পূর্ণ হয়। মনকে ডেকে বলে, আমি এমনি দুঃখিনী ও একাকিনী যে সুধু কথা ও মিথ্যা দিয়েই স্বামীকে তৈরী করতে হয়!

তখন বসে রাস্তার দিকে চেয়ে বিষণ্ণভাবে চিন্তা করে—যদি সে সত্যিই বাড়ি

ফিরে আসে, তার সেই নীল জামাটি অনেক দূর থেকে দেখা যাবে। কেমন সুন্দর পরিস্কার নীল ছিল তার জামাটি!

বস্তুতঃ, নীল কিছু চোখে পড়লেই তার মনখানি নেচে ওঠে। দূরে নীল জামা পরে কাউকে যেতে দেখলেই সে কাজ থামিয়ে রুদ্ধশ্বাসে দেখে। মাঠে থাকলে, হাত দিয়ে চোখের রোদ আড়াল করে নিড়ানীটি রেখে লক্ষ্য করে—কোন্‌দিকে কতদূরে গেল সেই লোকটি। কিন্তু প্রতিবারেই দেখা যায় সে নয়। নীল রঙ এখন সাধারণ হয়ে গেছে। যে-কেউ—দরিদ্র, নগণ্য হলেও—নীল জামা পরতে পারে।

কখনও কখনও মা নিজের মিথ্যাভাষণের জন্য স্বামীর উপর ক্রুদ্ধ হয়। মনকে প্রবোধ দেয়—তার অযোগ্য সে। মা তাকে ভালবাসে। তবু, সে যদি এমনি একদিন বাড়ি ফিরে আসে—মা ক্রোধে ফেটে পড়ে স্বামীকে মনের সুখে ভর্ৎসনা করে তাকে কষ্ট দেবে। অনেক সময় তার এই ক্রোধ ক'দিন ধরে থাকে। তখন তাকে অপ্রসন্ন দেখায়। ছেলেমেয়ে আর বৃদ্ধার উপর সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, নিড়ানী দিয়ে কুকুরটাকে জোরে ঠেলে দেয়। এই অশিষ্ট আচরণের জন্য পরে বেদনা বোধ করে আবার। তবু—।

এমনি এক সময়ে এলো—ফসল-কাটার পর ধান মাপবার দিন। ধান্য রোপণের সময় সে একাকিনী প্রাণপণ পরিশ্রম করেছে। সুধু ছেলেটার সামান্য সাহায্য ছাড়া দু'একদিন মাত্র সহৃদয় ভাশুরের সাহায্য নিয়েছে। তারপর এলো সেই ঝাড়া ধান বণ্টনের সময়। সেদিন মার মনে হলো—লালসা ও ক্রোধে তার অন্তরখানি যেন কাঁচা মাংসের মতো হয়ে গেছে, চতুর্দিকে যা দেখছে সবই এক-একটি আঘাত হয়ে এসে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে। সাধারণতঃ যে-সব জিনিস আগে চোখে পড়েনি, আজ সে তা' দেখছে ও অনুভব করছে। দুর্দমনীয় স্পৃহা জেগে ওঠে তার মনে। সে দেখলো, খামারের শস্যস্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে আছে নায়েব জমিদারের দালাল। ধূসর সিল্কের পোষাক পরা লম্বা লোকটি। চতুষ্কোণ, ডাগর ও সাহসদীপ্ত সুন্দর তার মুখখানি। মার মনে পড়লো—তার আচরণ ঠিক আগেকারই মতো আপাতশিষ্ট, কিন্তু তার পরিপূর্ণ দু'টি চোখের উপর ভারী চোখের দু'টি পাতা অর্ধ-মুদ্রিত। আনত-চোখের পাতার ভেতর দিয়ে সে যেমনভাবে তার দিকে চেয়েছিল, তাতে

মার মনে হোল—নায়েব তার কাহিনী শুনেছে; জেনেছে—তার স্বামী অন্যত্র চলে গেছে, আর ফিরে আসেনি। নায়েব আজ মার অন্তরখানি জেনে ফেলেছে। এ কথা সত্যি, একা কোন স্ত্রীলোককে দেখে তার মনখানি কেমন, শরীরের গঠন কিরূপ—এ সম্বন্ধে একবার মনে-মনে ভেবে না দেখবার মতো লোক নয়, নায়েব। সুগঠিত দেহ, সুন্দর মুখ, এমন সরল ও অকৃত্রিম কণ্ঠস্বর সত্ত্বেও তার মনখানি কুকুরের মতো। তার মৌখিক ভদ্রতা ও সরল উক্তি সত্ত্বেও প্রজারা তাকে ঘৃণা করে। অত্যন্ত বদমেজাজী ও নিষ্ঠুর সে। বিশাল তার বপু। কেউ তার কথায় প্রতিবাদ জানালে সে বন্ধমুষ্টিতে তাকে ধরে হাঁটুর কাছে টেনে আনে। তাই তারা তাকে ভয় করে। সে চোখের উপর ঝুলিয়ে রাখা চোখের পাতা সরিয়ে নিল। উজ্জ্বল, কালো, নিষ্ঠুর, ভীতিকর তার চোখ দুটি। তবু, তারা প্রায়ই তার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করে। বিনা প্রতিবাদে তার প্রাপ্য দিলে সে বিনিময়ে দু'একটা মজার কথা বলে গ্রহণটাকে মোলায়েম করে। তার কথা শুনে বিষাদের হাসি না হেসে পারেনা কেউ। তার বলার মধ্যে এমন একটা বিশিষ্টতা রয়েছে যে সবাই নির্বাক হয়ে শুনে যায়।

মার বাড়িতে এসে সে আজ তেমনি একটা মজা করলো। সে জানে—সে থাকে একা, স্বামী ছাড়া।, ছেলেটিকে ডেকে সে বলল, মাঠের কাজে সাহায্যের জন্য তোমার মতো লোককে পেয়ে তোমার মার দেখছি আর তোমার বাবাকে প্রয়োজন নেই! ছেলেটি যুগপৎ লজ্জা ও সাহসে তার শীর্ণ ক্ষুদ্র দেহখানি ঝেড়ে গর্ব প্রকাশ করলো। খুসী হয়ে বলল, আমার যেটুকু করবার আমিই করি। বড়দের যেমন দেখেছে তেমনি ভাবে সে থু-থু ফেললো, একবার তার ছোট্ট অস্থিসার জানুর উপর বাহু বসিয়ে দেখলো। অনুভব করলো —সে বড় হয়েছে, সম্পূর্ণ সাবালক সে!

নায়েব হাসলো তখন। ছেলেটির কথায় তারই হাসির সঙ্গে মিলিয়ে একটু সদয় হাসি হাসবার জন্য সে মার দিকে চাইলো। মা না হেসে পারলোনা। অন্যান্য অতিথিদের সে যেমন আপ্যায়িত করে ঠিক তেমনিভাবে নায়েবের হাতে এক পাত্র চা এনে দিল। নায়েবের হাসিভরা দু'টি চোখের খুব কাছেই সে ছিল। সে তাই বাধ্য হলো তার চোখের দিকে চাইতে। সেই দৃষ্টির

ভিতর দিয়ে তার ক্ষুধিত অন্তরখানি অজ্ঞাতে আত্মপ্রকাশ করলো। লোকটি তার দিকে চাইলো; বুঝলো-তার উত্তেজনা, নিজের উত্তেজনাও গম্ভীর হলো। চা'র পাত্রটি নিতে গিয়ে সে না-দেখার ভান করে তার হাতখানা লাগালো মার হাতে। কিন্তু মা অনুভব করলো এই স্পর্শ। আগুনের শিখার মতো ধমনীর রক্ত জ্বলে উঠলো সেই ইঙ্গিতে।

লজ্জিত হয়ে মা ফিরে দাঁড়ালো। সে শুনবেনা তার অন্তরের কথা। সে ধান নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। হঠাৎ তার নিজের উপর ভয় জাগলো। নীচু গলায় ছেলেকে বলল, তোর জেঠার কাছে দৌড়ে গিয়ে বলগে, যেন আমার একটু সাহায্য করতে আসে। উত্তেজনা-নিবৃত্তির জন্য মনে মনে বলল, যদি সে এসে পড়ে—যদি ভাশুর এসে পড়ে-!

কিন্তু গর্বিত ও গোঁয়ার তার ছেলেটি। সে বলল, আমি তো রয়েছি, মা! আমিই তোমায় সাহায্য করবো। আর লোকের দরকার কি তোমার? এই দেখ, আমি এখানে রয়েছি।

ছেলেটির জানু চাপড়ে হোঃ হোঃ করে হাসলো নায়েব। তার অজ্ঞতার গোপন সুযোগ গ্রহণ করে বলল, হ্যাঁ, তুমি তো রয়েছ। সত্যিই, তোমার মার আর অন্য লোকের দরকার নেই।

এই উৎসাহ পেয়ে ছেলেটির সাহস বাড়লো। তার মা তাকে অর্ধস্ফুটভাবে বলল, তোর জেঠা এখানে উপস্থিত থাকলে ভাল হতো। ছেলেটি বলে উঠলো, না, মা, ওঁকে ডাকবোনা আমি—এখন আমি বেশ বড় হয়েছি। শস্য ওজন করবার জন্য সে "রেক"টি নিল। অস্বস্তির সঙ্গে হেসে উঠলো মা। ছেলেকে বাধা দিলনা কাজে। তাকে এ কাজ করতে দেবার অন্য কারণও ছিল আসলে।

ধান মাপা শেষ হলে, মা আর এক "রেক" ধান নিল নায়েবের প্রাপ্য দিতে। নায়েব বড়লোকী কায়দায় "রেক"টি ছেলেটির হাত থেকে নিয়ে ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে নিয়ে মার মুখের পানে উৎসুকভাবে চেয়ে রইলো। ঘরের বন্ধ দরজার আড়ালে—নিদ্রাতুরা সেই বৃদ্ধা আর এই ছেলেমেয়ে ছাড়া কে আর আছে এখানে? বলল, তুমি এখন একা স্ত্রীলোক, তোমার স্বামী চলে গেছে, আব এ ফসল হয়েছে তোমার নিজেরই পরিশ্রমে। জমিদার যাতে আমার দোষ

দিতে না পারে, সেজন্য, ঠিক তাঁর ন্যায্য খাজানার অতিরিক্ত তোমার কাছ থেকে আর কিছুই নোবনা আমি। তোমার কাছ থেকে আমি নজরানা নেবনা।
সেই মধুর রুগ্ন উত্তেজনায় সহসা ভীত হয়ে পড়লো মা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রাপ্য নিতে বার বার অনুরোধ করলো। তবু সে নিলনা। হাতের উপর হাত দিয়ে "রেক"টি ঠেলে দিল। অবশেষে "রেক"টি টেনে ধানের স্তূপের মধ্যে ধানটা ঢেলে দিল। সে নেবেনা।
তাকে পুনর্বার অনুরোধ করবার ক্ষমতা ছিলনা মার। এই লোকটির মুখে ও হাসিতে, আর তার মূল্যবান ধূসর পোষাকের তলে লুকানো বিচিত্র গোপন শক্তি শরতের উজ্জ্বল সূর্যালোকে আত্মপ্রকাশ করে মাকে আঁকড়ে ধরলো; আগুনের জিহ্বার মতো লক্‌লক্ করতে লাগলো তার চারিদিকে। সে কুমারীর মতো ঘাড় নিচু করে রইলো। ধান ঢেলে দিয়ে সহাস্য-নমস্কারে শির দুলিয়ে, ঠোঁটে হাত বুলাতে বুলাতে সে চলে গেল। মা একটি কথাও বলতে পারলোনা। নগ্ন পিঙ্গল পা দুখানি ছেঁড়া জুতোর ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে, একহাতে তার পরণের তুলোট জামাটির কোণ মোচড়াতে মোচড়াতে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো নীরবে।
নায়েব চলে গেল। মা মাথা তুলে পেছন পানে চাইলো। নায়েবও সেই মুহূর্তেই ফিরে তাকালো। মার চোখের সঙ্গে মিললো তার চোখ। সে অভিবাদন জানাল্যে, হাসলো আবার। এমনি করে সে চলে গেল। তারপর সহস্রবার মা ভাবলো—তার দিকে এমন করে না তাকিয়ে যদি সে থাকতে পারতো! কিন্তু তখন সে তা পারেনি। খুসী হয়ে ছেলেটি বলল, খুব ভালো লোক তো মা, ওর "নজরানা" পর্যন্ত নিলনা। নায়েব তার পাওনা নেয়না, এমন তো কখনও শুনিনি। নীরবে হেঁসেলে গেল মা। অর্ধস্বপ্নাতুর-ভাবে ছেলেটি তার পিছু পিছু গিয়ে বলল, নিজের জন্য কিছুই চাইলোনা,— লোকটি কি ভাল লোক নয় মা? তবু উত্তর দিলনা মা। অবশেষে বিরক্ত হয়ে সে ডেকে উঠলো—মা, মা!
তখনই চমকে উঠলো মা। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জবাব দিল, ও—হ্যাঁ হ্যাঁ-বাবা। ছেলেটি বলে গেল, সত্যিই ভাল লোক, মা। বাবা চলে যাওয়ার পর তুমি গরীব হয়ে গেছ জেনে তোমার কাছ থেকে কিছুই নিলনা।

থমকে দাঁড়ালো মা। কড়াই-এর ঢাকনিটি তার হাতেই রইলো। সে এক-দৃষ্টে ছেলেটির পানে চাইলো; লজ্জাও সেই দুর্বল মধুর উত্তাপে তার পরিপূর্ণ অন্তরখানিতে প্রতিধ্বনিত হলো—সে কি বিনিময়ে কিছুই চায়নি আমার কাছে? ছেলের কথার উত্তর দিলনা সে।

নায়েব এই স্ত্রীলোকটির উত্তেজনার কথা বিস্মৃত হতে পারেনি। নানা অছিলায় সে এই পল্লীতে ফিরে আসে। কখনও বলে—সে এসেছে একটা হিসাব মিলাতে, আবার কখনও বলে—অমুক লোক ওজনে কম দিয়েছে, তাই জমিদার রেগে অগ্নিশর্মা হয়েছে তার উপর। প্রায়ই সে যায় মার বাড়ির পাশে ভাশুরের বাড়িতে। সেখানে বসে এটা-ওটা দেখে। কখনও সে আসে একরকম তুলোর নতুন বীজ নিয়ে; বলে—অন্যান্য অঞ্চলে এর খুব কদর। কখনও-বা জমির উর্বরতা বাড়াবার জন্য এক বস্তা চূণ একটি লোকের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে আসে। তার এই ঘন ঘন যাতায়াতে অবাক হয়ে যায় ভাশুর। প্রথম প্রথম তার ভয় হতো—কোন অনিষ্ট সাধনের জন্য সে আসছে। কিন্তু তেমন কিছু না দেখে চিন্তিত হয়ে তার স্ত্রীকে বলল, নিশ্চয় কোন গভীর গোপন কু-মতলব রয়েছে লোকটির। উৎকণ্ঠিতভাবে বসে সে তার উপর নজর রাখে, তার দিকে তাকায়, মাঠের কাজ পড়ে থাকে বলে অধৈর্য হয়ে ওঠে আবার। যে-লোকটি ইচ্ছা করলেই তার অনিষ্ট করতে পারে তার উপর অসৌজন্য হচ্ছে ভেবে মনে মনে ভয়ও পায়।

কিন্তু ভাশুর কিংবা তার স্ত্রী দুজনের কেউ দেখতে পায়না, নায়েবের বক্র-দৃষ্টি কেমন করে চলে যায়—রাস্তার ওপারে সেই স্ত্রীলোকটির উপর। সে খামারে না থাকলেই অল্পক্ষণ পরে সেস্থান ত্যাগ করে, আর থাকলে বসেই থাকে তার দিকে মুখ করে। মিথ্যে ভালমানুসি দেখিয়ে উঁচু গলায় বলে, নাঃ, এ ছাড়া আমার আর কাজ কি? সাধারণ লোক আমি। শরতের রোদে কোন সৎ লোকের ঘরের দরজায় রোদে বসার চেয়ে আর কিছুই বেশি ভালো লাগেনা আমার। কিন্তু রাস্তার ওপারে যেখানে স্ত্রীলোকটি বসে সুতো কাটে বা সেলাই করে সেদিকেই চেয়ে থাকে সারাক্ষণ।

শীতের দরুণ নীরব হয়ে আসছে পৃথিবী। শুকনো মাটিতে গম লাগানো হয়েছে, অঙ্কুরোদ্গমের জন্য ওরা বৃষ্টির অপেক্ষা করছে। একটু অবসর

পেয়ে মা দরজায় বসে শীতের জামাগুলো রিপু করছিল ও নতুন জুতো সেলাই করছিল। এ কাজ করবার মতো দৃষ্টিশক্তি মেয়েটির নেই, হবেওনা। গরমের জন্য মা সেখানে বসেছিল রোদে। আধ-স্বপ্নাবিষ্ট, অন্যমনস্কভাবে সে শুনছিল বৃদ্ধা ও ছেলেমেয়েদের কথা। নিষ্কম্প তার দুটি ঠোঁট, রৌদ্রোজ্জ্বল সোনার মতো পিঙ্গল দেহচর্ম; কেশরাশি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, সুবিন্যস্ত। সে এখন প্রতিদিন কেশপ্রসাধনের সময় পায়। এখন বয়সের চেয়ে তরুণ দেখায় তাকে—যদিও তার বয়স এখনও পঁয়ত্রিশ হয়নি।

সে জানতো, রাস্তার ওপারে অদূরে সেই লোকটি বসে আছে। মা তাকালোনা সেদিকে। যখন অনুভব করলো লোকটির দৃষ্টি তাকে তীব্রভাবে বিন্ধ করছে, তখন সে ঘরের ভেতর চলে গেল—লোকটিকে চলে যেতে না-দেখা পর্যন্ত বাইরে এলোনা। কিন্তু সে জানতো—নায়বের সেখানে আসার উদ্দেশ্য, আরও জানতো—কেন সে তার দিকে তাকায়। লোকটিকে মা নিজেও ভুলতে পারেনি।

সারাটি শীতে সে কিছুতেই তাকে ভুলতে পারলোনা। অবশেষে ঠাণ্ডা পড়লো ভয়ানক। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যও সেখানে আসা আর সম্ভব হলোনা লোকটির। তুষার পড়লো, উত্তর-পশ্চিমের বাতাস তীব্রভাবে বইলো। এখন তাকে বিস্মৃত হওয়া উচিত ছিল মার। কিন্তু সে নায়েবকে ভুললোনা।

নতুন বছর এলো ঘুরে। আর আর বছরের এবারও শহরে গিয়ে কিছু ধান বিক্রী করল। রূপোর টাকা বদলে নোট নিয়ে গেল আর একজন লেখকের কাছে। এবারও সে চিঠি লেখালো—যেন তার স্বামী তাকে লিখছে। পল্লীবাসীরা একে একে শুনলো সে-কথা, জানলো-তার স্বামীর কাছ থেকে সে টাকা পেয়েছে।

তবু, সবার নতুন ঈর্ষা, নানা কথা ও প্রশংসা এবার তার শূন্য অন্তরখানিকে এতটুকু পূর্ণ করতে পারলোনা। এমনকি, আত্মশ্লাঘা অনুভব করলনা সে। চিঠিখানি যখন পড়া হলো তখন তার মুখখানি দেখালো শান্ত, উদাসীন। বাড়ি গিয়ে খড়ের সংগে চুলোয় পুড়ে ফেললো সেই চিঠি। ঘরে ঢুকে টেবিলের ড্রয়ার খুলে তিনখানি চিঠি বার করলো। এতদিন হলো তার

স্বামী চলে গেছে। সে সেগুলোও চুলোয় দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। তা' দেখে ছেলেটি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলো, বাবার চিঠিগুলো পোড়াচ্ছ?
চঞ্চল অগ্নিশিখার পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে মৃত্যুর মতো হিম হয়ে গেল মা। উত্তর দিল, হ্যাঁ। ছেলেটি কেঁদে বলল, তা'হলে বাবা কোথায়, আমরা জানবো কেমন করে? মা জবাব দিল, আমি জানি তার ঠিকানা। আমি ভুলে যাবো ভেবেছিস?
মা মনখানিকে খালি করে নিল। কিন্তু মন কি খালি থাকে কখনও? কিছুদিন পরে নোটটি ভাঙবার জন্যে সে শহরে গেল। আজকাল সে আর ভাশুরকে বিরক্ত করেনা। সে একা থাকতে শিখেছে। দশটি মুদ্রা হাতে নিয়ে বেরোবার জন্য ঘুরতেই দেখলো—রাস্তার উপর দরজার পাশে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে মৃদুহাস্যে ঠোঁটে আঙ্গুল বুলাচ্ছিল। সে আর কেউ নয়—জমিদারের দালাল—নায়েব!
গত শরৎকালের পর মা আর তাকে এত কাছাকাছি দেখেনি। সেখানে আশে-পাশে পরিচিত কেউ ছিলনা। লোকটি সাহস করে মার দিকে তাকাল। হেসে বলল, তুমি এখানে কি করছ?
টাকা ভাঙাতে এসেছিলাম—বলেই সে থেমে গেল। সে বলতে যাচ্ছিল—আমার স্বামী টাকাটা পাঠিয়েছে! কিন্তু গলায় আটকে গেল। মনের কথা মনেই রয়ে গেল।
চোখ তুলে মার উপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নায়েব জিগ্যেস করলো, তা'হলে কখন? ঘাড় নিচু করে সহজভাবে কথা বলার চেষ্টা করলো মা। বলল, আমার জন্য একটি রুপোর কিংবা মিনে-করা চুলের পিন্ কিনবো ভাবছি। পুরানো পিনটা অনেকদিনের ব্যবহারে সরু হয়ে গিয়েছিল, কাল একেবারে ভেঙে গেছে।
সত্যিই, তার চুলের পিন্‌টা ভেঙে গিয়েছিল। অজ্ঞাতে তার মুখ থেকে কথাটি বেরিয়ে এলো। শহরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপরিচিতদের সামনে একটি পুরুষের সঙ্গে কথা বলে লজ্জা বোধ করছিল সে। চোখে পড়বার মতোই লোকটির দৃষ্টি! দীর্ঘ তার আকৃতি, মুখখানি চতুষ্কোণ, পাণ্ডুর। পথচারীরা যেতে যেতে উৎসুকভাবে তাদের দিকে তাকাচ্ছিল। মা যাবার

জন্য ফিরলো।

কিন্তু লোকটি অনুসরণ করলো মাকে। রাস্তায় শান্ত-ভদ্রভাবে সে চলেছে। সে বুঝলো, লোকটি তার পিছনে আসছে। যা বলেছে তার অন্যথা করতে ভয় হলো। তার পরিচিত একটি রৌপ্যকারের দোকানে গিয়ে মা রুপোর কিংবা মিনে-করা পিন চাইলো। একজোড়া ইয়ারিং হাতে নিয়ে সে নাড়ছিল। দেখলো, হঠাৎ দোকানে ঢুকে মাকে চেনেনা এমনি ভাব দেখিয়ে নায়েব রৌপ্যকারকে জিগ্যেস করলো, এসব ইয়ারিং-এর কত দাম?

রৌপ্যকার বলল, আগে রুপার ওজনটা দেখে নিই। ওজন হিসেবে ন্যায্য দামই নেবো আপনার কাছ থেকে।

রৌপ্যকার দেখলো সিল্কের পোষাক-পরা এই লোকটি নিশ্চয় নীল-সুতোর পোষাক-পরা এই গেঁয়ো স্ত্রীলোকটির চেয়ে ভালো খদ্দের। সে তাই মাকে একটু অপেক্ষা করতে বলল। মা লোকটির সাহসী গোপন দৃষ্টি থেকে মুখটি সরিয়ে দাঁড়ালো। রৌপ্যকার ইয়ারিং জোড়া নিক্তিতে উঠালো। অলস অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল লোকটি।

উচ্চকণ্ঠে রৌপ্যকার বলল, আড়াই তোলা! তারপর সুর নামিয়ে খোসামুদের সুরে বলল, তা' ইয়ারিং জোড়া যদি আপনার স্ত্রীর জন্য হয়, তো তার সঙ্গে একজোড়া রিং-ও নিন না কেন? এর সঙ্গে মানানসই এক-জোড়া রিং দেখাচ্ছি আপনাকে। উপহারের পক্ষে খুব চমৎকার হবে। যে-কোন স্ত্রীলোক জিনিসটা পছন্দ করবে।

একথায় হাসলো লোকটি। তেমনিভাবে বলল, তা'হলে দিন। তারপর উচ্চ হাসির সঙ্গে সে বলল, তবে এটা আমার স্ত্রীর জন্য নয়, ছ'মাস হলো আমার স্ত্রী মারা গেছে।

রৌপ্যকার তার এ বিক্রীতে খুসী হয়ে রিং জোড়াও রাখলো তাড়াতাড়ি। বলল, তা'হলে আপনার ভাবী স্ত্রীর জন্য এটা নিন। লোকটি আর কোন কথা বললোনা। ঠোঁটে হাত বুলাতে বুলাতে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। এই গ্রাম্য মহিলাটিকে চেনে এমন লক্ষণ প্রকাশ করলোনা একবারও। কাগজে মোড়া রিংগুলো নিয়ে সে পেছন ফিরে চললো। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার দিকে চেয়ে রইলো মা। যার জন্য সে এই রিংগুলো

কিনেছে তার উপর ঈর্ষা জাগলো মনে। এমন জিনিসই তার পছন্দ-সই। সে যখন কুমারী ছিল তখন প্রায়ই এমন একটি রিং পরার ইচ্ছা হোত। সে বলেছে, তার প্রেরিত টাকা দিয়ে এমন জিনিস কিনতেই স্বামী বলে পাঠিয়েছে। প্রগল্‌ভা বিধবাটি সর্বদা তাকে জিগ্যেস করে, তোমার সেই রিং কোথায় গেল, আমায় একবার দেখাও কোন্‌ ছাঁচের হলো জিনিসটা! মুস্কিলে পড়ে যায় সে। বলে, বেনের দোকানে এখনও গড়া হচ্ছে, কিংবা কোথায় রেখেছি ঠিক মনে পড়ছেনা এখন। এ পর্যন্ত কত রকমের অজুহাত সে দেখিয়েছে। গত বছর ঘৃণাভরে সে তাকে জিগ্যেস করেছে, তুমি কি ঐ রিংগুলো কখনও পরনা? উত্তরে মা বলেছে, পরবার ইচ্ছা হয়না। যেদিন সে ফিরে আসবে সেইদিনই পরবো।

পিন্‌ কিনে খোঁপায় লাগিয়ে সেই সুন্দর রুপোর জিনিসটার কথা ভাবতে ভাবতে সে বাড়ির পথ ধরলো। দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। তার শ্রমলব্ধ অর্থে খেলনা কিনবার আদৌ ইচ্ছা ছিলনা। তাকে কেমন দেখায় তাতে এখন নিশ্চয় কারো কিছু যায় আসেনা। সে যেমন আছে তেমনিই থাকবে। এই ভেবে, খানিকটা ভয়ে ভয়ে নগরীর প্রবেশপথ পেরিয়ে সে এলো বড় রাস্তা থেকে তাদের পল্লীর দিকের ছোট্ট গ্রাম্য পথটির উপর। তার মনে পড়লো গৃহের কথা, তার দেহের একমাত্র তৃপ্ত—সেখানকার খাবারের কথা। শীতের ক্ষণস্থায়ী সান্ধ্য গোধূলি-আলোকে এসে দাঁড়ালো সেই লোকটি। অতর্কিতে এসে সুদীর্ঘ কোমল হাতখানি বাড়িয়ে ধরলো। কাছে আর একটি প্রাণীও ছিলনা। এ সময়টায় পল্লীবাসীরা সবাই যে-যার ঘরে থাকে: ঠান্ডা পড়েছে। রাতের তুষারে বাতাস ভরে আছে। অপরিহার্য না হলে কেউ বাইরে থাকেনা এসময়ে। তবু, ঐ লোকটি ছিল সেখানে। সে ধরলো তার মনিবন্ধ, মার হাতের স্পর্শ অনুভব করলো নিজের হাতে। নীরব নিশ্চল-ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো মা।

নায়েব রুপোর ছোট পুঁটলিটি বার করে মার হাতে গুঁজে দিয়ে আঙগুলগুলো গুটিয়ে দিয়ে বলল, এগুলো কিনেছি তুমি ছাড়া আর কারো জন্য নয়। কিনেছি সুধু তোমারই জন্য। এগুলো তোমার।

নগরীর প্রাকারের নীচে ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। মা

রূপোর সেই গহনাগুলো হাতে নিয়ে সেখানে একা রইলো।
প্রকৃতিস্থ হয়ে সে দৌড়লো তার পিছু পিছু, না, না, এ আমি নিতে পারিনা —পারিনা!
কিন্তু ততক্ষণে সে চলে গেছে। প্রবেশপথ পর্যন্ত ছুটে গেল সে। উঁকি মেরে দেখলো খোলা দোকান থেকে বেরিয়ে-আসা ক্ষীণ আলোয়; কিন্তু তাকে দেখতে পেলোনা। শহরের উপর দৌড়তে আর সেই লোকটার মুখের দিকে চাইতে লজ্জা হলো তার। এই অস্পষ্ট আলোয় সে দাঁড়িয়ে রইলো—লজ্জিত, অনিশ্চিতভাবে। নগর-রক্ষীরা অধৈর্য হয়ে বলে উঠলো, আজ রাতে যদি তোমার গেটের বাইরে যেতেই হয়, তো এবেলা যাও। সময় হয়েছে। কম্যুনিস্ট—আজকালকার সেই নতুন ডাকাতদের—উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য এবার "গেট" বন্ধ করতে হবে।
সে নেমে এলো তার রাস্তায়। ছোট্ট পাহাড়টি পেরিয়ে উপত্যকার নিচ দিয়ে সে চলতে লাগলো। একটু পরেই গহনাগুলো ফেলে দিল তার বুকের ভেতর। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাণ্ড, শীতল, উজ্জ্বল চাঁদ উঠল। সে যখন বাড়ি ফিরলো—তখন তার ছেলেমেয়েরা বিছানায় শুয়ে পড়েছে, তাদের বৃদ্ধা ঠাকুমা ছিল নিদ্রিত। সুধু ছেলেটি জেগে ছিল তখনও। মা এলে সে বলল, তোমার জন্য আমার ভয় হচ্ছিল মা। তোমায় খুঁজতে বেরোচ্ছিলাম আমি। সুধু বাচ্চা দুটি আর ঠাকুমাকে একা ফেলে যেতে ভয় হচ্ছিল, তাই যাইনি।
নিজেকে ওদের তুলনায় কত বড় ভেবে ওদের এমনি বাচ্চা বলাতে মা হাসতে পারলোনা। বলল, হ্যাঁ, ফিরে এলাম। তবে, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি খুব বেশি! ঘরে ঢুকে ঠাণ্ডা কিছু ভাত এনে সে খেলো। গহনাগুলো তার বুকের ভিতর ছিল তখনও।
খাওয়ার পর সে শয্যার দিকে তাকালো। মোমবাতির আলোয় দেখলো—ছেলেটি ঘুমাচ্ছে। মশারি খাটিয়ে দিয়ে সে টেবিলের পাশে বসলো। ছোট পুঁটলিটি বুকের ভিতর থেকে নিয়ে নরম কাগজের মোড়কটি খুললো। তার ভেতরে ছিল চক্‌চকে শাদা রিংগুলো আর চমৎকার ইয়ারিং জোড়া। প্রতিটি রিং-এর সঙ্গে বাঁধা ছিল তিনটি সুন্দর চেন, শেষ চেনটির সঙ্গে ঝুলানো

ছিল একটি ছোট খেলনা। তার শক্ত হাতের উপর নিয়ে সে সেগুলো নিবিষ্ট-ভাবে দেখতে লাগলো। একটি চেনের উপর একটি ছোট্ট মাছ ঝুলছিল, দ্বিতীয়টির উপর ছিল ঘণ্টা, একটি তারা ছিল তৃতীয়টির উপর। নিখুঁত সুন্দরভাবে গড়া। যে-কোন স্ত্রীলোকের পছন্দ-সই। ইতিপূর্বে তার কঠিন পিঙ্গল হাতে এমন সুন্দর জিনিস সে নেয়নি। সে বসে বসে খানিকক্ষণ দেখলো, দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ভাবলো না সেগুলো দিয়ে কি করবে কিংবা কেমন করে সেই লোকটিকে ফিরিয়ে দেবে। সে গহনাগুলো আবার মুড়ে রেখে দিল।

তার সন্তানদের সঙ্গে একই লেপের নিচে সে ঘুমুতে পারলোনা। রাতের সিক্ত শৈত্যে শীতল হয়েছিল তার দেহখানি। তবু তার গণ্ডদ্বয় জ্বালা করছিল। ঘুম এলোনা অনেকক্ষণ ধরে। অবশেষে একটু ঘুম পেলো তার। সে স্বপ্ন দেখলো—বিচিত্র একটি জিনিস জ্বল জ্বল করছে—কার তপ্ত একখানি হাত রয়েছে তার হাতে!

॥ দশ ॥

সারাটি বসন্তকাল ধরে মা আর লোকটিকে দেখতে পেলোনা। তবু তাকে ভুললোনা। গ্রীষ্মের সবে সুরু। গমগুলোয় সোনালি রঙ ধরেছে, ভিটেয় বীজধানগুলো নতুন সবুজ হয়ে গজিয়ে উঠছে। লোভী পাখীরা এদের কোমলতায় আকৃষ্ট হয়। মা তাই বাড়ির কাছে ছোট ছোট পাথরের টুকরো দিয়ে ঘিরে ক্ষেত তৈরী করেছে—যাতে করে বৃদ্ধা ঘরে বসেই পাহারা দিতে পারে। মার অন্তরখানি তখনও শূন্য, উত্তপ্ত। এমন এক দিন মা নায়েবকে দেখলো।

সেই নতুন গ্রীষ্মে এলো একটি বায়ুহীন দিন—মৃদু নবীন উত্তাপ-মাখা। পতঙ্গেরা তাদের তীব্র প্রেম জানিয়ে গেল। ডেকে ডেকে তাদের সুর ক্ষীণ-তর হয়ে ধীরে ধীরে নীরবতায় মিশে গেল। সূর্য উপত্যকাটিতে স্বচ্ছ উষ্ণ সুরার মতো কিরণ ছড়িয়ে দিল। ছোট্ট পল্লীটির মসৃণ তপ্ত পাথরে গরম হাওয়া আটকে যায়। নগ্নদেহ ছেলের দল তার ভিতর দৌড়-ঝাঁপ করে

খেলা করে।

এতটুকুও বাতাস ছিলনা। আঙিনায় দাঁড়িয়ে মা ভাবছিল—গ্রীষ্মকালে এত শিগ্গির এমনি প্রবল অতর্কিত উষ্ণতা সে তো কখনও অনুভব করেনি। ছোট ছেলেটি পুকুরপাড়ে দৌড়ে গিয়ে জলের উপর বসে হাসতে হাসতে আহবান করলো তার খেলার সাথীদের। বড় ছেলেটি তার কোট ও পায়-জামাটি খুলে উপরের দিকে ছুঁড়ে ফেললো। তারপর তার বাবার পুরানো বড় বাঁশের টুপিটা মাথায় দিয়ে চললো অংকুর গজানো শস্যক্ষেত্রে। মেয়েটি ঘরের মধ্যে অন্ধকারে বসেছিল। মা তার দীর্ঘশ্বাস শুনছিল। সুধু বৃদ্ধই ভালবাসে এমনি তাপ। সে রোদে বসে তার জরাজীর্ণ দেহের উপর থেকে কোটটি খুলে নিয়ে বুড়ো হাড়গুলিতে আর শুকনো চামড়া ঝুলানো বুকে একটু রোদ লাগাচ্ছিল। পুত্রবধূকে দেখে সে বলল, গরমের দিনে আমার মরণের ভয় হয়না, বৌমা। আমার এই বুড়ো শরীরে রোদটা যেন নতুন রক্তমাংস।

কিন্তু বাইরের এ গরম মা সইতে পারলোনা। তার দেহের অভ্যন্তরে রয়েছে যথেষ্ট উত্তাপ। তার রক্ত যেন অত্যধিক তাপে ধমনীর মধ্যে গর্জন করে উঠছে। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। বলে গেল, জমির ধানগাছগুলোতে একটু জল দিতে হবে—আজ রোদ বড় তেতেছে। নিড়ানীটি নিয়ে কাঁধে খালি বালতি ঝুলিয়ে সরু পথ বেয়ে সে চললো তারই ক্ষেতের একটু উপরে দূর পুকুরটির দিকে। সকৃতজ্ঞ চিত্তে অগ্রসর হচ্ছিল সে। গরম হলে-ও বাতাস এখানে রাস্তার মতো স্থির, নিষ্প্রাণ নয়। সে চললো। রাস্তায় কারো সঙ্গে দেখা হলোনা। দুপুর উত্তীর্ণ হয়েছে। এই সময়টায় সবাই বিশ্রাম নেয়। এমনি প্রখর রোদে কাজ করা যায়না। কেউ কোথাও মাঠে কাজ করতে গেলেও এখন সে ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে—আর মাছির উপদ্রব এড়াবার জন্য টুপি দিয়ে মুখ ঢেকে কোন গাছের তলায় ঘুমাচ্ছে। গরমে শ্লথ ও তন্দ্রাচ্ছন্নদেহ মোষটা মাথা নিচু করে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রখর তেজ মার অসহ্য হলোনা। এ তেজ আসছে আকাশ থেকে, দেয়ালে কিংবা তার ধমনীর মধ্যে তা রুদ্ধ হয়ে যায়নি। সে তার ক্ষেতে কিছুক্ষণ কাজ করলো। নিড়ানী দিয়ে ক্ষেতের উঁচু দিকটায় এক

ধারে পুকুরটি থেকে জল আনবার একটি সরু পথ করে দিল। তারপর পুকুরধারে গিয়ে বালতি ভরে জল এনে একটি গর্তে ঢালতে লাগলো—বালতির পর বালতি জল। দেখলো—মাটি জলে ভিজে কালো হয়ে গেল। মনে হলো—যেন কোন তৃষিত জীবকে জল পান করিয়ে সে জীবন দিল।

কাজ করতে করতে একবার পিঠ সোজা করে দাঁড়িয়ে, বালতিগুলো মাটিতে রেখে, সে বিশ্রামের জন্য বসলো পুকুরের সবুজ কিনারায়। উত্তরে ছোট্ট পাড়াখানির দিকে তাকিয়ে সে দেখলো একটি লোক তার শাশুড়ীর কাছে গিয়ে কী জিগ্যেস করে পুকুরের ধারে সে যেখানে বসেছিল সেদিকে আসছে। সে দেখলো। দেখে চিনলো—নায়েব! তাকে আসতে দেখে মার মনে পড়লো—তার দেওয়া গহনাগুলো এখনও তার কাছে রয়েছে। মাথা হেঁট করে রইলো সে। বুঝতে পারলোনা সেগুলো ফিরিয়ে না দিয়ে সে-সম্বন্ধে কী আর বলবে? রাস্তা দিয়ে যেতে কেউ হয়তো দেখে ফেলবে—এই ভয়ে বাড়ি গিয়ে জিনিসগুলো এনে দিনদুপুরে ফিরিয়ে দেবার সাহস হলোনা। তাছাড়া, সেই বুড়িও তো রোদে বসে জেগে আছে। যে-জিনিসটা তার দেখা উচিত নয় সেটাই সে দেখে তাড়াতাড়ি!

লোকটি তার কাছেই আসছে। কাছাকাছি এলে মা ধীরে ধীরে উঠে তার সামনে দাঁড়ালো। লোকটি সহজভাবে বলল, এবার গম কেমন হলো, কত আন্দাজ ফসল পাওয়া যাবে দেখতে এলাম।

কিন্তু কথাগুলো বলার সময় তার চোখ দুটি মার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করলো। গরমের জন্য সে একটি পাতলা কোট আর নীল রঙের পাজামা পরেছিল। তার পিঙ্গল নগ্ন পা দুখানির উপর লোকটি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখলো। ভয় পেয়ে মা রূঢ়ভাবে বলল, ঐ তো মাঠ, দেখুন না তা'হলে ঐদিকে।

সেখানে দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে সুন্দর শহুরে কায়দায় বলল সে, চমৎকার মাঠগুলো! এবারের চেয়ে ভালো ফসল আর কখনও হয়নি। একটি ভাঁজ-করা বই নিয়ে কাঠির মতো কি একটা দিয়ে সে তাতে লিখলো। এমনটি সে আর কখনও দেখেনি। পত্রলেখকের কাঠির মতো সেটা কালিতে ডোবাতে হয়না। কালি অমনিই বেরোয়। অর্ধ-উৎসুকনয়নে মা সেদিকে চেয়ে রইলো।

এমন একটি শিক্ষিত সুদর্শন ব্যক্তি তার মতো স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করছে ভেবে মনে মনে গর্ব অনুভব করলো। ভাবল—এখন গহনাগুলো সম্বন্ধে কোন কথা বলবেনা।

লেখা হয়ে গেলে ঠোঁটে হাত বুলাতে বুলাতে সে বলল, যদি সময় থাকে তো তোমার বার্লি-খেতটা একবার আমায় দেখাতে পার? আমার প্রায়ই ভুল হয়ে যায়—কোন্ জমিটা তোমার, আর কোনটা তোমার ভাশুরের।

নিড়ানীটি নেবার জন্যই যেন দু'চোখ নামিয়ে অনিচ্ছার সঙ্গে বলল, পাহাড়ের চারদিকেই তো আমার জমি রয়েছে!

লোকটি বলল, পাহাড়ের চারিদিকে?—কোমল হলো তার কণ্ঠস্বর। বলিষ্ঠ নরম হাতখানি ঠোঁটের উপর বুলিয়ে স্মিতহাস্যে বলল, তা' আমায় একবার দেখাও।

লোকটি প্রকাশ্যভাবে মার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখলো। তার সেই চাহনিতে ছিল—অভিভূত করবার শক্তি। নিড়ানীখানি রেখে মা তার সঙ্গে গেল। স্বামীর সঙ্গে বেড়াবার সময় স্ত্রী যেমন যায়, ঠিক তেমনিভাবে মা চললো নায়েবের পিছু পিছু।

যেতে যেতে প্রখর সূর্য-কিরণ পড়লো তাদের উপর। পায়ের তলায় সবুজ তৃণে কোমল মাটি বেশ উষ্ণ। মা অতর্কিতে অনুভব করলো—প্রখর রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের রক্ত যেন মধুর ক্লান্তিতে ভরে উঠছে। তার আগে আগে চলেছে সেই লোকটি, বলিষ্ঠ ঘর্মাসিক্ত তার ঘাড়; গ্রীষ্মের উপযোগী পোষাকে সজ্জিত তার সেই সুন্দর দেহের দিকে তাকিয়ে মার মনে জাগে অপরিসীম তৃপ্তি। মা নীরবে নগ্ন পায়ে চলেছে তার সঙ্গে; পাশাপাশি যখন এসে পড়ে তখনই তার নাকে লাগে পুরুষের দেহের বিচিত্র গন্ধ, রক্ত-মাংসে মেশা, ঘামে ভেজা দেহের এক অদ্ভুত সৌরভ। সেই ঘ্রাণে লালসায় কেঁপে উঠলো মার দেহখানি। এই স্পৃহায় তার মন আতঙ্কিত হলো। সে ভেবে স্থির করতে পারলোনা কী করবে! তৃণাচ্ছাদিত পথে দাঁড়িয়ে কম্পিত-কণ্ঠে বলল, আমি শাশুড়ীর একটা কাজ করতে ভুলে এসেছি। নায়েব পিছন ফিরে তাকাতেই তার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। উত্তপ্ত, দুর্বল হলো তার সর্ব-শরীর। বলল, একটা কাজ করতে ভুলে গেছি। ঘাড় ফিরিয়ে দ্রুত-পদক্ষেপে

মা ফিরলো। লোকটি সেখানে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো।

সোজা ঘরে এসে ঢুকলো মা। উঠোনের পাশ দিয়ে সে গেল। কেউ দেখতে পেলোনা তাকে। সবাই তখন ঘুমোচ্ছে। মধ্যাহ্নের শেষে সূর্যের তেজ ক্রমশঃ বাড়ছে। বড়-জা রাস্তার ধারে বসে হাঁ করে ঘুমোচ্ছে, কোলের শিশুটি তার বুকের উপর ঘুমিয়ে আছে। বৃদ্ধা শাশুড়ীও ঘাড় গুঁজে কোমরের উপর জামাটি টেনে দিয়ে রোদে বসে আছে। মেয়েটি বন্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঠান্ডা একখানি পাথরকে বালিশ করে নিয়ে গুটিসুটি হয়ে ঘুমিয়েছে। ছোট ছেলেটি উলংগ অবস্থায় উইলো-গাছের নীচে সটান শুয়ে আছে।

সুধু দিনটিরই পরিবর্তন ঘটেছে। অন্ধকার এসেছে ঘনিয়ে। আরো স্থির, গভীর ও তীব্র হয়েছে উত্তাপ। বিশাল, কৃষ্ণকায় মেঘমালা পাহাড়ের উপর স্ফীত হয়ে উঠেছে। এক বিচিত্র উজ্জ্বল আভ্যন্তরীণ আলোকে মেঘের প্রান্ত-ভাগ রূপোর মতো উদ্ভাসিত দেখাচ্ছে। সেই দিনের বিশাল তপ্ত নীরবতার মধ্যে পতঙ্গের শব্দ ও পাখির ডাক রুদ্ধ হয়ে আছে।

কিন্তু মার চোখে ঘুম ছিলনা। সে সন্তর্পণে অন্ধকার নীরব ঘরে প্রবেশ করে শয্যার উপর বসলো। তার কানের কাছে গর্জন করে উঠলে—রক্ত তার বলিষ্ঠ বুভুক্ষু দেহের রক্ত। সে বুঝলো কী হয়েছে তার। শহুরে স্ত্রীলোক-দের মতো সে কোন পীড়ার ভান করলোনা। সত্যিই কি হয়েছে জেনেও না-জানার ছল করার মতো কাপট্য নেই তার। সে আজ জীবনে অনুভূতপূর্ব এক ভীতি বোধ করলো। কারণ, সে জানে। সে জানে—তার ক্ষুধা ওই লোকটির ক্ষুধারই অনুরূপ। কল্পনাও করতে পারলোনা ঐ লোকটিকে সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। মা আর্তনাদ করে উঠলো—সে যদি আমায় না চায় তাহলেই হবে ভালো। উঃ—সে যদি আমায় কামনা না করতো—আমি রক্ষা পেতাম! কিন্তু কে যেন শয্যা থেকে তাকে তুলে দিল। সেই ঘুমন্ত পল্লী থেকে যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথে সে মাঠে ফিরে এলো।

বিশাল, কৃষ্ণবর্ণ, উজ্জ্বল-ধার মেঘের নিচ দিয়ে সে চললো। ঘন অন্ধকারের মধ্যে সবুজ স্বচ্ছ পাহাড় তার চারিদিকে বিরাজমান। এমনি আকাশের তলায় সরু আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে সে চলেছে। ছোট ভাঙা মন্দিরটির পাশ দিয়ে যেখানে পথটি বেঁকেছে সেখানে, মন্দিরের প্রবেশপথে লোকটি অপেক্ষা করছিল।

মা তার সম্মুখ দিয়ে যেতে পারলোনা। লোকটি ভিতরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। দরজা অবধি তাকে অনুসরণ করে মা দাঁড়ালো। দেখলো—ক্ষীণ গোধূলি-আলোয় সেই বাতায়নহীন মন্দিরের অভ্যন্তরে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে প্রতীক্ষায়; পশুর মতো জ্বলছে তার দুটি চোখ। মা ভেতরে প্রবেশ করলো। ক্ষীণালোকে দু'জনে তাকালো দু'জনের পানে। স্বপ্নাবিষ্ট দু'জনেই অধীর, প্রতীক্ষার শক্তিহীন! দু'জনেই তৈরী হলো—যা তাদের করতেই হবে তারই জন্য।

তবু, মা থামলো একবার। তার দৃষ্টি পড়লো মন্দিরের তিনটি দেব-মূর্তির উপর। প্রধান দেবতাটি একটি শান্ত বৃদ্ধের মূর্তি; তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সম্মুখের দিকে চেয়ে, পাশে রয়েছে তাঁর দু'জন পরিচারক—ছোট সুন্দর দর্শন লোক-দেবতা। যাত্রীরা এই মন্দিরে বিশ্রাম করে, দেবতাকে পূজা দেয়। মা তার খুলে-রাখা পোষাকটি তুলে মূর্তিগুলোর উপর ফেলে দিয়ে, অবরুদ্ধ করে দিল তাদের তীব্র দৃষ্টি!

॥ এগার ॥

সেই রাত্রিতেই অতর্কিতে উঠলো ঝড়—দূর পাহাড়ে শার্দুলের গর্জনের মতো। দুরন্ত ঝটিকা নিষ্প্রভ জলভরা মেঘপুঞ্জকে আকাশ থেকে নামিয়ে নিয়ে এলো। হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হলো। দিনের উত্তাপ গেল ধুয়ে। ঝড়-বৃষ্টির শেষে ধূসর স্তব্ধ আকাশের নীচে তুষারমুক্ত নির্মল শান্ত প্রভাত আত্মপ্রকাশ করলো।

ঝঞ্ঝা ও অতর্কিত শৈত্যে অবশেষে স্বর্গ থেকে নেমে এলো বৃদ্ধার মৃত্যু-দূত। সূর্যাস্তের পর সর্বাঙ্গ উন্মুক্ত করে অনেকক্ষণ ধরে হাওয়ায় বসে ঘুমিয়েছিল সে। গোধূলি-বেলায় মাঠের কাজ সেরে যেমন আসে তেমনিভাবে নিঃশব্দে ঘরে ফিরে মা দেখলো—বৃদ্ধা শীতে হিম হয়ে শয্যায় পড়ে আছে। বৃদ্ধা চিৎকার করে উঠলো, কোন প্রেতাত্মা আমায় আশ্রয় করেছে, বৌমা! খারাপ একটা বাতাস আমার গায়ে লেগেছে। যন্ত্রণাসূচক ধ্বনির সঙ্গে সে তার ছোট্ট কম্পিত হাতখানি বাড়ালো। মা ধরে দেখলো—হাতখানি শুষ্ক,

এতে বরং খুসীই হলো মা। একটি তৃপ্তিকর কুকার্য করে এসেছে সে। সে-কথা ভুলে গিয়ে এদিকে মন দিতে পারবে। তাই সে আনন্দ অনুভব করলো। অনুচ্চ-কণ্ঠে বলল, কী বিশ্রী কালোই না হয়েছিল আকাশ! সেই অন্ধকার আকাশের নীচে তুমি বসে আছ কিনা দেখতে আমি বাড়ি আসছিলাম। পরে ভাবলাম, আকাশের রঙ দেখে তুমি নিশ্চয় ঘরে ঢুকে পড়বে।

বিলাপ করলো বৃদ্ধা, আমি ঘুমিয়েছিলাম যদিও—। সবাই ঘুমিয়েছিলাম আমরা। জেগে উঠে দেখলাম, সূর্য অস্ত গেছে আর আমি মড়ার মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছি।

মা তাড়াতাড়ি জল গরম করলো। আদা ও গরম গাছ-গাছড়ার শিকড় দিয়ে বৃদ্ধাকে গরম জল পান করালো। তবু, রাত্রিতে জ্বর বাড়লো। বৃদ্ধা বলল, একটি ভূত তার বুকের উপর বসে ছুরি চালাচ্ছে। সে নিশ্বাস ফেলতে পারছেনা। তারপর নির্বাকভাবে ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে লাগলো।

আজ মাকে ঘুমোতে হবেনা। মা খুসী হলো তাই। সারাটি রাত বৃদ্ধার শয্যার পাশে বসে পাহারা দিতে হবে, জল চাইলেই জল দিতে হবে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে গা থেকে লেপ ফেলে দিয়ে সে যখন বলবে, তার শরীর জ্বালা করছে, তখন লেপটি গুঁজে দিতে হবে। বাইরে রাত্রি কালো হয়ে গেছে, বৃষ্টি পড়ছে তার ঘরের চালের উপর, চালের ফুটো দিয়ে এখানে-ওখানে জল পড়ছে। ঐ কোণা থেকে বৃদ্ধার বিছানাটি সরিয়ে আনতে হবে। সেখানে বৃষ্টির জল পড়ছে। জল বন্ধ করবার জন্য ছেলেমেয়েদের বিছানাটির উপরে সে একটি মাদুর খুলে দিয়েছে। এসব কাজ তাকে করতে হচ্ছে বলে সে আনন্দিত হলো। সারা রাত সে এমনি ব্যস্ত থাকবে। এরই জন্য সে আনন্দ বোধ করলো।

সকালে বৃদ্ধার অবস্থা আরও খারাপ হলো। যে-কোন লোক তা বুঝতে পারবে। মা ছেলেকে পাঠালো ভাশুরের কাছে। সে এলো, এলো তার স্ত্রী, প্রতিবেশীদের ক'জনও এলো। অর্ধচেতন অবস্থায় শায়িতা বৃদ্ধাকে দেখলো সবাই। সে খানিকটা উপলব্ধি করতে পারছিল কী হয়েছে তার। জ্বর ও শ্বাসকষ্টে মোহাচ্ছন্নভাবে নিশ্বাস ফেলছিল বৃদ্ধা। প্রত্যেকেই

পরামর্শ দিল কি করা যায়, কি ব্যবস্থা করা উচিত। মা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে লাগলো। একবার জ্ঞান হলো বৃদ্ধার। শয্যার পাশে জনতা দেখে দুর্বল, ক্ষীণকণ্ঠে বলল, ঐ-ঐ—সেই ভূত বসে আছে—সে আমায় পাকড়াও করছে। আমার সময় হয়েছে—আমার সময়—!

মা দ্রুতপদে অগ্রসর হলো। দেখলো—বৃদ্ধা কী যেন বলতে চাইছে অথচ বলতে পারছেনা, তবু, কম্পিতহস্তে তার গায়ের তালি দেওয়া সমাধি-বস্ত্রটি টানছে। এর তালিগুলো ঠিকমতো লাগাবার পর সে সহাস্যে বলছিল, এ পোষাকটির চেয়ে বেশিদিন টি'কে থাকবে সে। এখন সে পোষাকটি টানছে। মা ঘাড় নিচু করে রইলো। হাঁফাতে হাঁফাতে বৃদ্ধা বলল, সমাধি-বস্ত্র—সারা গায়ে তালি দেওয়া—আমার ছেলে—

একথা শুনে জনতা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। বড় ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলল, মা, আমি বুঝেছি ঠাকুমা কি চান। উনি চান তাঁর সেই নতুন সমাধিবস্ত্রটি যেটা বাবার পাঠানোর কথা ছিল। উনি তো সব সময়ই বলতেন তাঁর এই জামাটি না ছে'ড়া অবধি বে'চে থাকবেন।

বৃদ্ধার মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সবাই বলল, দেখ বুড়ির প্রাণটা কেমন শক্ত। নির্ভীক এই বুড়িটি তার তৃতীয় সমাধিবস্ত্রটি না নিয়ে ছাড়বেনা।

বৃদ্ধার পে'চারমতো কোটরগত মুখখানির উপর ফুটে উঠলো ক্ষীণ মৃদুমৃদু আনন্দ। হাঁফাতে হাঁফাতে আর একবার বলল, জামাটি তৈরী করে না-পরা পর্যন্ত আমার প্রাণ বেরুবেনা। তাড়াতাড়ি কাপড় কেনা হলো। ভাশুর গেল কাপড় কিনতে। মা তাকে বলল, লাল কাপড়ের মধ্যে বেশ মজবুত অথচ বেশ ভালো কাপড় কিনে এনো। তোমার কাছে টাকা থাকে তো নিয়ে এসো, আমি কালই টাকাটা দিয়ে দেব। বৃদ্ধাকে সবচেয়ে সেরা কাপড় কিনে দেবার সংকল্প ছিল তার। সেই রাত্রিতে নিরালায় সে মাটি খুঁড়ে লুকানো টাকাগুলো বার করলো। বৃদ্ধা-মাকে তৃপ্তির সঙ্গে প্রাণত্যাগ করতে দেবার জন্য যা প্রয়োজন সে-পরিমাণ টাকা তুলে নিল সেখান থেকে। বস্তুতঃ, তার মনে হলো সেই জিনিসটা। গোপন যায়গাটিতে ছুটে যাওয়ার

মুহূর্তের স্মৃতি এই ব্যস্ততায় তার মনে পড়বেনা। কাজ পেয়ে তাই সে আনন্দিত হলো। এই প্রতীক্ষমান স্মৃতি যেন তার আপন-জনের উপর তাকে করলো সদয়, তাদের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্য উৎসুক। যেমন করে হোক, সেই গোপন মুহূর্তটি থেকে সে পেলো অব্যাহতি। যা ভালো মনে করলো, সাবধানের সঙ্গে তা-ই করতে লাগলো। গত দুই রাত্রি ধরে সে একেবারেই ঘুমায়নি, ব্যাকুলভাবে কাজ করে করে হয়রান হয়ে গেছে। ছেলেপিলেদের উপর একবারও রাগ করেনি,—শান্ত, মধুর ব্যবহার করেছে মুমূর্ষু বৃদ্ধার সঙ্গে।

বৃদ্ধা ক্রমশঃ বধিরতর হয়ে উঠেছে, চোখের দৃষ্টি হয়েছে ক্ষীণতর। তাই, ভাশুর কাপড় নিয়ে এলে কাপড়খানি বৃদ্ধার চোখের কাছে তুলে ধরে উচ্চকণ্ঠে মা বলল, জামাটি তৈরী করা পর্যন্ত একটু শক্ত হয়ে থাক, মা।

নিশ্বাস ফেলতে পারছিলনা বৃদ্ধা। তার প্রতিটি শ্বাস একটা কর্কশ শব্দে ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসছিল। শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছিল তার। তবু সাহসের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, আমি মরবোনা।

চক্চকে ও উৎকৃষ্ট সেই কাপড় দিয়ে মা তাড়াতাড়ি সূঁচ নিয়ে তৈরী করতে লাগলো কনের কোটের মতো লাল একটি কোট। মার কোলের উপর ছড়ানো উজ্জ্বল কাপড়টির উপর বৃদ্ধা ক্ষীণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখলো। সে এখন কিছুই খেতে পারেনা, গিলতেও পারেনা। মুমূর্ষু বৃদ্ধাকে খাঁটি দুধ খাইয়ে হয়তো কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে এই ভেবে যদি কোন দয়াবতী স্ত্রীলোক বাটিতে একটু স্তনদুগ্ধ কখনও দেয়, তাও বৃদ্ধা গলাধঃকরণ করতে পারেনা। প্রতীক্ষায় হাওয়ার উপর বেঁচে আছে সে।

মা সেলাই করে চললো। প্রতিবেশীরা তাকে খাবার এনে দিল যেন সে অন্য কোন কাজ না করে একটানা সেলাই করে যেতে পারে। দেড় দিনের মধ্যে সেলাই শেষ হলো। ভাশুর ও বড়-জা জামাটি দেখতে এসে দাঁড়ালো। দু'একজন পড়শীও এলো। সত্যিই ছোট পাড়াটির সবাই জেগে চেয়ে ছিল—কার জিত হয়, মার না মৃত্যুর!

কিন্তু সেই লোহিতবর্ণ সমাধিবস্ত্র তৈরী হলো। ভাশুর বৃদ্ধার জরাজীর্ণ দেহখানি তুললো। বড়-জা মরা গাছের মতো শুকনো পিঙ্গল শীর্ণ সেই

দেহে জামাটি পরিয়ে দিল। এ'কাজ শেষ হয়ে গেলে বৃদ্ধা টের পেলো। কথা বলতে পারছিলনা সে। শুয়ে শুয়ে দু'একটি অন্তিম ঘড় ঘড় আওয়াজ করলো, চোখ দুটি প্রসারিত করে তাকালো, আজন্ম অভীপ্সিত তৃতীয় সমাধিবস্ত্রখানি পাওয়া অবধি বেঁচেছে বলে হাসলো দন্তহীন হাসি। বৃদ্ধা চোখ বুজলো—বিজয় গৌরবের সঙ্গে।

সমাধি-কার্য শেষ হলো। ব্যস্ততার প্রয়োজন ফুরালো। তবু মা ব্যস্ত হয়ে রইলো; মাঠে আগের চেয়ে বেশি কাজ করতে লাগলো। ছেলেটি মার আরব্ধ কোন কাজ করতে এলে বলে, আমায় কাজ করতে দে। মার জন্য আমার মন খারাপ হয়েছে খুব বেশী। সেদিন যখন ঝড় এসে সূর্যকে ঢেকে দিয়েছিল তখন বাড়ি গিয়ে তাঁর ঠাণ্ডা লাগছে কিনা না দেখে কী অন্যায়ই-না করেছি আমি!

সারাটি পল্লীর লোক জানলো বৃদ্ধার মৃত্যুতে শোকার্তা হয়ে মা নিজেকে অভিযুক্ত করছে। এই শোক দেখে অনেকে তার গুণকীর্তন করলো, বলল, ক'জনের ছেলের বৌ এমনি শোক প্রকাশ করে? তাকে এই বলে সান্ত্বনা দিল, দুঃখ করোনা বৌ, ওঁর বয়েস হয়েছিল, মারা গেছেন। কথা বলতে বা হাঁটতে শিখবার আগে যে-মুহূর্তটি আমাদের সকলেরই জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় সেই সময় তাঁর এসেছে। সেজন্য দুঃখ করে কী লাভ? এখনও তোমার স্বামী জীবিত, তোমার দুটি ছেলে রয়েছে। মনে সাহস রাখ, বৌ।

মনের ভয় ও বিপদ ঢাকবার একটা উপলক্ষ্য পেয়ে সে স্বস্তি বোধ করলো। তবু, ভীত হওয়ার কারণ ছিল তার। মাঠে কাজ করতে করতে-ও সেই আসন্ন ঝড়ের দিন থেকে তার মনের কোণে লুকানো ভয় আত্মপ্রকাশ করতে পারে। তাই এ কদিন এমনি ব্যস্ত থেকে সে বরং খুসীই হয়েছিল। বৃদ্ধার মৃত্যুতে সে আনন্দিত হয়েছে, গভীর বেদনার সঙ্গে ভেবেছে, ভালই হয়েছে—বৃদ্ধা মরেছে, যদি কিছু হয় সে আর জানতে পারবেনা।

একটা মাস অতিবাহিত হলো। তার মন আতঙ্কিত হলো। দু'মাস কাটলো। তিনমাস উত্তীর্ণ হলো। ফসল কাটবার দিন এলো। ধান-কাটা শেষ হলো। যে ভয় তার দৈনন্দিন কাজের তলে তলে জেগে ছিল, আজ তা আত্ম-

প্রকাশ করলো। সংশয়ের কিছু নেই আর। সে জানে আজ তার সেই সর্বনাশ ঘটেছে। সন্তানের জননী, পল্লীর সম্মানিতা বধূর জীবনে যা সবচেয়ে কলঙ্কের, তাই হয়েছে। সে অভিসম্পাত দিল্ বিগত ঝড়ের দিনকে, আর নিজের নির্বোধ উত্তেজনাকে। তখন তার তো জানা উচিত ছিল—সেই সময় তার দেহ ছিল তপ্ত, নগ্ন প্রতীক্ষায় ব্যাকুল—মন ছিল-একটি মাত্র ক্ষুধায় জর্জর; বোঝা উচিত ছিল—সেই মুহূর্ত ফলপ্রসূ না হয়ে যায়না। তা'ছাড়া সেই লোকটির দেহও সুগঠিত, সবল, বীর্যবান। এর ব্যতিক্রম সে চিন্তা করলো কেমন করে?

বিচিত্র এই মাতৃত্বকে গোপন রাখতে হবে—পাহারা দিতে হবে রাত্রির নিঃসঙ্গতায়—এমনি ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে। যত অসুস্থই সে বোধ করুক না কেন, সাহস করে তা প্রকাশ করতে পারবেনা। এর আগে সন্তান ধারণের সময় সে কখনও এমন অসুস্থ বোধ করেনি। এখন এক গ্রাস ভাত খেলেই বমি হয়ে যায়। অভ্যন্তরে এই সতেজ ও সুস্থ বীজটির বৃদ্ধিতে দেহখানি যেন একটি অপবিত্র আগাছার বৃদ্ধির মতো নির্মমভাবে আলোড়িত হচ্ছে—অথচ সে তার একটি চিহ্নও প্রকাশ পেতে দিতে পারছেনা।

ঘুমাতে না পেয়ে শয্যায় বসে সে কাটালো রাতের পর রাত, আর্তনাদ করলো অস্ফুটভাবে,—যদি আমি একা থাকতাম, আমার মধ্যে যদি এ জিনিসটি না থাকতো! আমি যদি আগের মতো একা থাকতাম তা'হলেই আমি খুসী হতাম! এ কথা তার মনে প্রায়ই জাগে, তীব্রভাবে জাগে। খাটের পায়ায় হেলান দিয়ে বসে সে রাত্রি যাপন করে। তবু, আত্মহত্যা করতে সে পারেনা। পাশে রয়েছে তার সন্তানেরা। সে দেখে তাদের ঘুমন্ত মুখগুলো। ভাবতে পারেনা তার মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে প্রতিবেশীরা তাকে কি দৃষ্টিতে দেখবে। তাই, বেঁচে থাকা ছাড়া উপায় নেই!

তবু, এই বেদনা সত্ত্বেও, তার কথা ভাবতেই মনে ঘৃণার উদ্রেক হলেও—সেই শহুরে লোকটির উপর মার আকর্ষণ কমে যায়নি। গোপন এক অধিকার তার দেহের অভ্যন্তরে পুষ্ট হচ্ছে; তারই ফলে সে যেন তাকে দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করে রেখেছে। তার কাছে আত্মসমর্পণের জন্য সে অনুতাপ করে, তবু রাত্রিদিন তারই জন্য সে উৎকণ্ঠিত। সত্যিকারের লজ্জা-ও প্রতিরোধ

করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও মা তার জন্য ব্যাকুল হয়। লোকটির খোঁজ করতে সে লজ্জা বোধ করে; ভয় হয় পাছে কেউ তাকে দেখে ফেলে। মনে হয়—লোকটির খোঁজে গেলে তার অনিষ্ট হবে, লোকে কুৎসা রটাবে। তার পুনরাগমন পর্যন্ত মা সুধু অপেক্ষা করতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্য! মার সঙ্গে লোকটির প্রয়োজন শেষ হয়েছে। ফসল তোলার পর তাকে আসতেই হয়। তার আগে—সারাটি গ্রীষ্মের মধ্যে সে একটি-বারও এলোনা। এবারও সে এলো ঠিক আগের মতো কঠিন, কলহ-মূর্তিতে। সে তার পুরো ভাগটি নিল। ছেলেটি অবাক হয়ে বলল, গেল বছর যে এত সদয় ছিল—এবার আমাদের উপর তার এত রাগ হলো কেন? রুষ্টভাবে মা উত্তর দিল, কি জানি? কিন্তু সে জানে। লোকটি যখন তার দিকে তাকায়নি, তখনই সে জানতে পেরেছে।

বাৎসরিক নবান্নের ভোজের দিনেও লোকটি তার পানে তাকালোনা। সেদিন মা ভালো করে গা মাজলো, তেল দিয়ে কেশ বিন্যাস করে ভাল জামা পরলো, বৃদ্ধার সমাধির দিনে তৈরী করা নতুন জুতো জোড়া ও মোজা পায়ে দিল—তবু-ও না। সেদিন সে সেজেগুজে সকলের সামনে ঘুরে বেরালো—ক্ষীণ আশায় ও লজ্জায় রাঙা হলো তার দু'টি গাল, চোখ দু'টি উজ্জ্বল হলো। জোর করে নিজেকে প্রফুল্ল ও মুখর করে এর সঙ্গে ওর সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করলো। তার চক্‌চকে গাল ও জ্বলন্ত চোখ, পুরুষের সামনে এমনি অস্বাভাবিক উচ্চ কণ্ঠ ও হাসি দেখে স্ত্রীলোকেরা অবাক হয়ে গেল। তবু, লোকটি তার দিকে চাইলোনা। সে ভাতের নতুন সুরা পান করলো, খেতে খেতে চাষীকে বলল, বেশি থাকলে আমায় দু'এক হাঁড়ি দিতে পার—মাটি দিয়ে মুখ মুড়ে দিয়ো, যেন মিষ্টিটা নষ্ট না হয়। কিন্তু সে একবারও তার দিকে ফিরে চাইলোনা। সামনে এসে দাঁড়ালেও অপরিচিত গ্রাম্য মহিলাদের দেখে সবাই যেমন চোখ ফিরিয়ে নেয় তেমনিভাবে সে চোখ ফিরিয়ে নিল।

মার তা সহ্য হলোনা। তাকে আর প্রয়োজন নেই জানলেই মা খুসী হতো! তবু মা সইতে পারলোনা। উৎসবের মাঝখানে সে বাড়ি গেল। ওরই দেওয়া গহনাগুলো খুঁজে বার করলো। খুঁজতে খুঁজতে কেঁপে উঠলো তার

দেহ। কানের তার খুলে সে ঝুলালো ইয়ারিং, হাতের কঠিন আঙ্গুলে পরলো আঙটি। তারপর যেখানে দাঁড়িয়ে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের পরিবেশন করছিল তার একধারে দাঁড়িয়ে সে আর একবার লোকটিকে দেখলো। সেই বিধবাটি বসেছিল সেখানে পা দুটো ছড়িয়ে—যেন সবাই তার নতুন জুতো—জোড়া দেখতে পায়। সে বলল, হ্যাঁ-রে বৌ, এসো। তুমি তাহলে শেষকালে গহনা কিনলে। তোমার স্বামী এখনও বিদেশে, সে না ফিরলেও সেই গয়না পরলে? কথাগুলো সে এত জোরে বললো যে স্ত্রীলোকেরা সকলে ফিরে তাকিয়ে হাসলো, পুরুষরা-ও মেয়েদের এই আমোদে মৃদু হাসলো। হাসির রোল ও রসালাপ শুনে খাবারের পাত্র থেকে মুখ তুলে চোয়াল নাড়তে নাড়তে নায়েব দেখলো। তার মুখের ভিতর ভাত ছিল। ঔদাসীন্যের সঙ্গে, কিন্তু মা শুনতে পায় এমন স্পষ্ট করে সে বলল, স্ত্রীলোকটি কে? মার রক্তিম মুখখানির উপর তার দৃষ্টি পড়লো। তাকে চেনেনা এমন ভান করে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে নায়েব আবার আহারে মনোযোগ দিল। মা অনুভব করলো তার মুখের রক্তিম আভা দ্রুত মলিন হয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে বেরিয়ে সে দৌড় দিল। তাদের এই আমোদে লজ্জা পেয়ে মাকে দৌড়তে দেখে সবাই হাসলো খিল খিল করে।

সেইদিন থেকে মা আর কারো সামনে বেরোয়না। সে তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে একা থাকে। তার শরীরের মধ্যে সেই উৎকট জিনিসটার বৃদ্ধি সে গোপন রেখেছে। তবু, দিনরাত সুধু ভাবে কী সে করবে। বাইরে সে ঠিক আগের মতোই কাজ করে, শীতের জন্য শস্য সঞ্চয় করে, সব কিছু গুছিয়ে রাখে। মধ্য-শরতের উৎসবের দিনটি এলো। পল্লী ভোজন-উৎসবে মগ্ন হলো। প্রতিটি গৃহ আনন্দে নেচে উঠলো, সরু পথখানি উৎসব-মুখর হয়ে উঠল, ঘরে ধান চাল ভরলো। মনে আনন্দ না জাগলেও মা তার সন্তানদের জন্য ক'টি "চাঁদি কেক" তৈরী করলো। ভোজের রাত্রিতে যখন চাঁদ উঠলো তখন তারা খামারে বসে "কেক" খেলো, উইলো-গাছের নীচে এসে দেখলো—সূর্যের মতো ভাস্বর পূর্ণচন্দ্র।

তারা তৃপ্তি সহকারে খেলো। তবু মনে হলো সন্তানেরা-ও নিজেদের ও মার আনন্দের অভাবটুকু অনুভব করলো। অবশেষে বড় ছেলেটি গম্ভীরভাবে

বলল, বাবা নিশ্চয়ই মারা গেছে, নইলে আসছেনা কেন?
চম্‌কে উঠলো মা। তাড়াতাড়ি বলল, হতভাগা ছেলে—তোর নিজের বাবার মরণ মুখে আনতে পারলি?
তবু মার মনখানি হলো চিন্তাকুল। ছেলেটি মাকে বলল আবার, এবার গম লাগানো হয়ে গেলে তোমার কাছ থেকে ক'টা টাকা নিয়ে একবার বাবার খোঁজে বেরোবো ভাবছি। তাঁকে খুঁজে পেতে দেরী হ'তে পারে। তাই, কিছু শীতের কাপড়-চোপড় বেঁধে নিয়ে যাবো।
মা ভয় পেলো। তার মন ভোলাবার জন্য বলল, আর একটি কেক খা বাবা, আর একটি বছর অপেক্ষা করে দেখ্। সে যদি না আসে, আর তুইও চলে যাস তা'হলে আমি কি করবো? তোর ভাইটি বড় হয়ে তোর মতো না হওয়া পর্যন্ত সবুর কর্। একগুঁয়ে, জেদী ছোট ছেলেটি জোর গলায় বলল, দাদার সঙ্গে আমিও যাব বল্‌ছি। ছোট্ট, লাল ঠোঁট দুটি খুলে সে সক্রোধে মার পানে চেয়ে রইলো। বড় ছেলেটিকে ভৎর্সনার সুরে মা বলল, দেখ্‌না, অমন কথা বলে তুই ওর মনটিও কেমন চঞ্চল করে তুললি! সে-সম্বন্ধে আর কোন কথা বললোনা।
কিন্তু সেই চিন্তা মার মন থেকে গেলনা। সে আবার ভাবলো—পাঁচটি বছর ধরে সে একা রয়েছে। পাঁচটি বছর—! যদি আসবারই হোত তা'হলে কি অনেক আগেই আসতো না? পাঁচ বছর কেটে গেলো। নিশ্চয়ই তার মৃত্যু হয়েছে। সে হয়তো জানেইনা কখন সে বিধবা হয়ে গেছে। নায়েবের আবার বিয়ে হয়নি। সে বিধবা আর নায়েব বিপত্নীক। নায়েবেরই মুখে মা গত বছর শুনেছে তার স্ত্রী-বিয়োগের কথা। তাতে মার কি? মা কান দেয়নি সে-কথায়। সে তো তখন বিধবা ছিলনা। হ্যাঁ, সন্দেহ নেই সে বিধবা হয়েছে। সে চেয়ে রইলো ঊর্ধ্বে রাতের আকাশের বিশাল চাঁদের পানে। রাত্রি গভীরতর হতে লাগলো। তার সন্তানেরা ঘুমিয়ে পড়লো। বিরাট চাঁদটির পানে চেয়ে চেয়ে, এখানে-ওখানে, কুকুর ঘেউ ঘেউ করছিল। সারাটি পল্লী ছিল সুপ্তিমগ্ন। তার মনে হলো বার বার—সে বিধবা। আর যদি নায়েব তার কাছে প্রস্তাব দেয়—সঙ্গে সঙ্গেই তার বিয়ে হয়ে যায়, তা'হলে খুব শিগ্‌গির করা হবে কি? ছেলেটি তার পরিকল্পনা ভুলে যায়নি। সে প্রাণপণ খেটে জমি চাষ করলো,

গম লাগালো। যেদিন কাজ শেষ হলো সেদিনই সে তার বাবার সন্ধানে বেরোবে। সে এখন প্রায় তার বাবার মতো লম্বা হয়েছে, আর হয়েছে বাঁশের মতো লিক্‌লিকে ও বলিষ্ঠ। সে এখন বারণ শোনবার মতো শিশু নয়। শান্ত তার স্বভাব, কিন্তু খুব জেদী। সে তার সংকল্প ভোলেনি। সে বলল, একবার দেখে আসি বাবা কোথায় গেছে। তিনি কোন্‌ শহরে গেছেন, কোথায় থাকেন, তাঁর ঠিকানাটি আমায় দাও।

তাকে নিবৃত্ত করবার জন্য নৈরাশ্যের সঙ্গে মা বলল, আমি তো সেই চিঠিগুলো পুড়িয়ে ফেলেছি। নববর্ষে আর একখানি চিঠি না-আসা পর্যন্ত সবুর করতে হবে। সে চেঁচিয়ে উঠলো, তুমি তো বলেছিলে—ঠিকানা তুমি জান! মা তক্ষুণি বলল, ভেবেছিলাম, মনে থাকবে, কিন্তু নানা কাজে—তোর ঠাকুমা মারা গেল— এ সব গোলমালে আবার ভুলে গেছি। সত্যিই আমি ভুলে গেছি। তোর ঠাকুমা যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন আমি তার কাছে একখানি চিঠি লিখবো ভেবেছিলাম, কিন্তু ঠিকানা মনে ছিলনা বলে পারিনি। মার কথায় বিশ্বাস না করে সে কটমট করে চাইলো। রোষভরে বলল মা, আমি কি জানতুম, তুই যেতে চাইবি—এত বড় ছেলে হয়ে অপদার্থের মতো সব কিছুতেই আমার উপর নির্ভর করে থাকবি? আমি তো স্বপ্নেও ভাবিনি তুই তোর মাকে ছেড়ে চলে যাবি। তাছাড়া, আমি জানি গতবারের মতো এবারও নববর্ষে চিঠি আসবে।

ছেলেটি তখনকার মতো তার আকাঙ্ক্ষা দমন করে রুষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। পিতৃসন্দর্শনের জন্য উদগ্রীব ছিল তার অন্তরখানি। বাবাকে মনে পড়েনা তার। তবু, মনে হলো—তিনি একজন সাদাসিধা, প্রফুল্ল প্রকৃতির লোক। সে এখন মাকে আর ভালবাসেনা। মা সর্বদাই তার উপর মেজাজ দেখায়, কোন কথা শোনেনা, তাই সে চায় তার বাবাকে পেতে।

অবশেষে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো মা। তাকে শিগ্‌গির একটা কিছু করতেই হবে! নববর্ষে যদি চিঠি না আসে, ছেলে তার উপর বিরক্ত হবে; তাছাড়া একদিন-না-একদিন তাকে সত্য কথা বলতে হবে। কেমন করে সে ছেলেকে জানাবে নারীত্বের গর্ব বজায় রাখবার জন্য উচ্চারিত ছোট্ট একটি মিথ্যা এমনি বিশাল আকার ধারণ করেছে—ক্রমশঃ দৃঢ় হয়েছে তার মূল, তাকে

খণ্ডন করা সুকঠিন।

তারপর সে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো—তার স্বামী মারা গেছে। বেঁচে থেকে কেউ নিজের দেশে, নিজের বাড়িতে, নিজের সন্তানদের কাছে ফিরে আসেনি এমন কোন লোকের কথা কেউ শুনেছে কখনও? তার মৃত্যুই হয়েছে, নিশ্চয় সে মারা গেছে! বার বার একথা বলবার পর প্রতীতি এলো তার মনে। মার দৃঢ় বিশ্বাস—সে আর বেঁচে নেই। এখন ছেলেটাকে ও পাড়ার লোকগুলোকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সুধু একটা বাহ্যিক চিহ্নের প্রয়োজন।

এই পুরানো কাজের জন্য আর একবার সে শহরে গেল। এবার সে একটি নতুন, অপরিচিত লেখক খুঁজে নিল। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তাকে বলল, আমার জা'র কাছে লিখুন, তার স্বামী মারা গেছে। কেমন করে মরলো? চাকরের হাত থেকে ল্যাম্প উল্টে গিয়ে ঘরে আগুন লাগে, আর সেই ঘরেই ঘুমন্ত অবস্থায় সে পুড়ে মারা যায়। তার চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাওয়া যায়নি, তাই বাড়িতে তার শব পাঠানো গেলনা।

পত্রলেখক জা'র নামের জায়গায় লিখলো মার নাম। এই সংবাদ যে দিচ্ছে মা তার একটি ভুয়ো নাম দিল, এই শহরের বদলে বলল আর একটি শহরের নাম। পত্রলেখকের কাছে অদ্ভুত লাগে এ সব। লেখকের এ নিয়ে মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন। তার কাজ সেটা নয়। চুপ করে থাকার জন্য তো সে "ফিস্" পাচ্ছে।

মা তাই রেহাই পেলো। মুক্তির দিন পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে পারছিলনা। নায়েবকে যে-কোন উপায়ে জানাতে হবে! এখানে-ওখানে গিয়ে সে জিগ্যেস করলো, জমিদারের পুরানো বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিল। এখন সেখানে না থাকলেও সে ও-বাড়িতে নিশ্চয় সুপরিচিত। নিষ্কৃতির দুর্বার আগ্রহে মরিয়া হয়ে উঠলো মা। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে গেল সেখানে। সেদিন দেবতারা যেন তার সহায় হলেন। সেখানে নায়েব ছিল একা, বাড়ির দরজায় মার সঙ্গে নায়েবের দেখা হলো। সে তখন কেবল ঘরে ঢুকছে। মা চিৎকার করে ধরলো তার হাত। নিজের হাতখানি মার হাতে দেখে নায়েব তাচ্ছিল্যভরে তার পানে তাকিয়ে বলল, কি-রকম মেয়ে লোক তুমি, অ্যাঁ?

মা অনুচ্চকণ্ঠে বলল, আমি বিধবা হয়েছি—আজই শুনলাম—আমি বিধবা হয়েছি!

ঝাড়া দিয়ে তার হাত ছাড়িয়ে নায়েব বলল, আমার কি তাতে? মা বেদনার্ত-ভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে। নায়েব কর্কশভাবে বলল, আমি তো তোমার দাম দিয়েছি, আর বেশ ভালোভাবেই দিয়েছি! হঠাৎ নায়েবের পরিচিত একটি লোক রাস্তা থেকে ডাক দিল। উচ্চ হাসির সঙ্গে বলল, কি মশায়, সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়েলোক আপনাকে জোর পাকড়াও করেছে দেখছি! ভারী চোখের পাতা না তুলেই সে উত্তরে বলল, কর্কশ পিঙ্গল-বর্ণ আপনার পছন্দ হতে পারে, কিন্তু আমার নয়! সে তার গন্তব্য-স্থানের দিকে চললো। বিস্মিত, লজ্জিত, হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো মা। তার মূল্য কেমন করে দেওয়া হলো? মনে পড়লো অতর্কিতে—সে তাকে গহনা দিয়েছে। এই তার মূল্য! ঐ তুচ্ছ গহনাগুলো দিয়েই সে ভাবছে তার কাজের দায়মুক্ত হয়ে গেছে।

এখন কী করবে? সে স্থিরভাবে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। মৃত্যুর মতো শীতল তার অন্তরখানি। বার বার বলল, এখন কান্নার সময় নয়—পরে কান্নার সময় আসতে পারে। কান্নাকে রুখে রাখলো সে। বিরাট প্রকম্পিত কান্না তার অন্তরে সঞ্চিত হয়েছে। তবু সে কাঁদবেনা। সে নিজেকে শক্ত করলো দু'একদিনের জন্য। তারপর সংবাদ এলো—তারই লেখা চিঠি। চিঠি নিয়ে সে গেল পত্র-পাঠকের কাছে। তাকে চিঠি দিতে দিতে দৃঢ়ভাবে বলল, এ চিঠি সময়ের আগে এসেছে। আমার মনে হচ্ছে, এতে কোন খারাপ খবর আছে। বৃদ্ধ চিঠি নিয়ে মনে মনে একবার পড়লো। বলল, এ তো বড় খারাপ সংবাদ মা, স্থির হয়ে শোন।

মা শান্তকণ্ঠে জিগ্যেস করলো, ওর কি অসুখ করেছে? বৃদ্ধ চিঠি নিচে রেখে চশমাটি চোখের উপর তুলে নিয়ে মার দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বলল—মারা গেছে! মা মাথার উপর চাদরটি ছুঁড়ে দিয়ে কাঁদতে লাগলো। হ্যাঁ, এখন সে কাঁদতে পারে। নিরাপদে সে কাঁদলো। সে কাঁদতে লাগলো যেন সত্যিই তার স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছে। সে কাঁদলো, কারণ—এতদিন সে এমনি সাথীহারা রয়েছে—নিঃসঙ্গ তার জীবন এমনি অসহায়, সঙ্গীহীন। সে

কাঁদলো, কারণ—তার অদৃষ্ট মন্দ, তার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে গেছে, সে আজ ঘৃণিত। তার সন্তানেরা কিংবা প্রতিবেশীরা শুনতে পাবে এই ভয়ে সে এতদিন কাঁদতে পারেনি। এখন সে কাঁদতে পারে। কেউ প্রশ্ন করবেনা—কোন্ দুঃখে সে কাঁদছে।

পাড়ার স্ত্রীলোকেরা এ-সংবাদ শুনে মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ছুটে এলো। প্রবোধ দিয়ে বলল, তার সন্তানরা রয়েছে, কেঁদে কেঁদে সে যেন তার শরীর খারাপ না করে। তারা ছেলে দুটিকে ডেকে এনে পাঠালো তাদের মাকে সান্ত্বনা দিতে। ছেলেরা এসে দাঁড়ালো। বড়টি নীরব—যেন অতর্কিত পীড়ায় ম্লান, ছোটটি মাকে কাঁদতে দেখে নিজেই কান্না সুরু করলো।

এই গোলমালের মধ্যে হঠাৎ একটি উচ্চতর কান্নার ধ্বনি শোনা গেল। জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনায় অধীর হয়ে বিধবাটি কাঁদছে। বড় বড়, তৈলাক্ত অশ্রুবিন্দু ঝরছে তার দু'টি গণ্ড বেয়ে। সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমার দিকে চেয়ে দেখ। তোমার চেয়ে আমার অবস্থা খারাপ। আমার তো সন্তানই নেই। দেখ বৌ, তোমার চেয়ে বেশি ধর্ম-কর্ম আমি করেছি। কিন্তু যে-কোন অভাগীর চেয়ে আমার অদৃষ্ট মন্দ! তার পুরানো শোক উথলে উঠতে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। সকলে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। গোলমালের মধ্যে কাঁদতে কাঁদতে মা বাড়ি চলে গেল। ছেলে দুটি তার অনুসরণ করলো। ঘরের দরজায় বসে সে নীরবে অশ্রুপাত করলো। বড় ছেলেটি-ও হাত দিয়ে চোখের জল মুছতে লাগলো। ছোট ছেলেটি তার বাবার মৃত্যুর মানে না বুঝেও কাঁদতে লাগলো। বাবা কি পদার্থ সে জানে না। দুটি চোখ দুহাতে চেপে ধরে মেয়েটি বলল, বাবা মারা গেছি। আমায় কাঁদতে হবে—যদিও চোখের জল আমায় জ্বালা দেয়। তবু, কাঁদতেই হবে।

কিন্তু মা তো অবিরাম কাঁদতে পারেনা। সে জানে—যতক্ষণ পর্যন্ত কাঁদা উচিত তার বেশি সে কাঁদতে পারেনা। তাই সে আপাততঃ কান্না থামালো তার নীরবতায় সন্তানেরা একটু শান্ত হলো। মা ভাবতে লাগলো কী সে করবে এখন।

মৃত্যু ছাড়া হয়তো তার আর কোন উপায় নেই। কিন্তু হ্যাঁ, এক উপায়

আছে যে-জিনিসের বৃদ্ধি সে দেহে অনুভব করছে তাকে টেনে বার করে ফেলা! কিন্তু একা তা সম্ভব নয়—একজন সহায়ক চাই। বড়-জা ছাড়া আশ্রয় নেবার আর কেউ নেই। এ সম্বন্ধে তাকে না বলতে পারলেই ছিল ভালো। তবু ভেবে পেলোনা—একা কেমন করে করবে এ-কাজ? কর্কশ হলেও বড়-জা বেশ ভাল মানুষ। সে জানে এই পৃথিবীকে, জানে পুরুষের স্বভাব, ভালো করেই জানে—নারী-দেহ উর্বর, যেমন করে হোক্ তা সন্তান ধারণ করবেই। কিন্তু তাকে বলা যায় কেমন করে?

তবু খুব সহজেই হলো কাজটা। দু'একদিন পরে উভয়ের দেখা হলো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দু'জনে আলাপ সুরু করলো। হঠাৎ বড়-জা তার স্বাভাবিক উচ্চ ও দয়ার্দ্র কণ্ঠে বলল, ভালো করে খাও, দুঃখ ভুলে যাও, ভাই। সত্যিই, তোমার মুখখানি একেবারে হলদে হয়ে গেছে, মনে হয় যেন পোকা ঢুকেছে তোমার শরীরে।

মার মনে পড়লো সে-কথা। তিক্ত-কণ্ঠে নিচু গলায় সে বলল, হ্যাঁ আমার মধ্যে একটি পোকা ঢুকেছে। সে আমার জীবনকে নষ্ট করে ফেলেছে।

বড়-জা তার দিকে চেয়ে দেখে। পেটে হাত রেখে একটু থেমে মা বলল, আমার পেটের মধ্যে যেন কী হয়েছে, এ কোন বদ্-বাতাস ছাড়া আর কী যে হতে পারে ভেবে পাচ্ছিনে। বড়-জা বলল, কৈ, দেখি! মা কোর্টটি খুললো। বড়-জা হাত দিয়ে দেখলো তার পেটের স্ফীতি। অবাক হয়ে বলল, এ কি বোন্, এ যে সন্তানের মতো মনে হচ্ছে! তোমার স্বামী থাকলে তো আমি তাই বলতাম।

মা ব্যথাতুরভাবে নীরবে মাথা হেঁট করে রইলো; চোখ তুলতে পারলোনা। বড়-জা তার পেটের মধ্যে একটা স্পন্দন অনুভব করলো। সে ভয়ে চিৎকার করে উঠলো, এ যে সন্তান,—নিশ্চয় সন্তান! কত দিন হোল তোমার স্বামী চলে গেছে, কোন অপদেবতা ছাড়া আর কিসে তোমার এ গর্ভ হতে পারে? শুনেছি কখনও কখনও মেয়েদের এমন হয়। আগে তো প্রায়ই এমন হোত। যারা সন্ন্যাসিনী, দেবতারা স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাদের সঙ্গে সহবাস করতেন। সগৃহিনী হলেও তুমি তো আর সন্ন্যাসিনী নও। সবাই তোমায় শ্রদ্ধা করে। তবু, তোমার মধ্যে তো রাগ-দ্বেষ-লালসা রয়েছে। তা, তুমি

'কি কোনদিন তোমার আশেপাশে কোন দেবতা দেখেছ, কখনও?

আর একটি মিথ্যা বলতে চাইলো মা। বলতে চাইলো—একদিন ঝড়ের সময় যখন রাস্তার ধারে ঐ মন্দিরটায় আশ্রয় নিয়েছিল তখন সে এক দেবতার আবির্ভাব অনুভব করেছিল। এই মিথ্যাকে আকার দেবার জন্য দুটো ঠোঁট খুলতে চাইলো, কিন্তু পারলোনা। প্রথমতঃ, সেই প্রাচীন সুন্দর দেবমূর্তি, যার মুখ সে ঢেকে দিয়েছিল তার সম্বন্ধে এমন একটি জ্বলন্ত মিথ্যা বলবার সাহস হলোনা; দ্বিতীয়তঃ, মিথ্যে বলে বলে হয়রান হয়ে গেছে সে। তাই মাথাটি তুলে বড়-জার মুখের পানে বিষণ্ণভাবে চেয়ে রইলো। লাল হয়ে উঠলো মলিন কুচকানো গাল দুটি। সে হয়তো তার জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হতোনা, যদি বলতে পারতো—প্রতারণামূলক এই মিথ্যে কথাটি। কিন্তু সে তা পারলোনা। সেই ভালো মেয়ে-মানুষটি তার দিকে চেয়ে বুঝলো সবই। কোন প্রশ্ন সে করলোনা, জিগ্যেস করলোনা—কি করে এমন হলো। সুধু বলল, গা'টা ঢেকে রাখ বোন, ঠাণ্ডা লাগবে।

দু'জনে একত্রে বেড়ালো কিছুক্ষণ। মা তিক্ত আবেগের সঙ্গে বলল, কার দ্বারা এ গর্ভ-সঞ্চার হয়েছে—তাতে কিছু যায় আসেনা, আর কেউ একথা জানবেও না। তবে, তুমি যদি বোন্ আমায় এ বিপদে সাহায্য কর, আজীবন তোমার দাসী হয়ে থাকবো। বড়-জা চুপিসারে বলল, আমার যেটুকু বয়েস হয়েছে তার মধ্যে আমি তো এমন কোন স্ত্রীলোক দেখিনি যে তার অবাঞ্ছিত শিশু খালাস করতে পারেনি।

প্রথম আশার সন্ধান পেলো মা। চুপি চুপি জিগ্যেস করল, কিন্তু কেমন করে হবে? বড়-জা বলল, টাকা দিয়ে বনৌষধি কিনে আনতে হবে সে খুব কড়া জিনিস, খেলে পোয়াতি মারা যায়, কখনও কখনও ভ্রূণটিও নষ্ট হয়। সে হচ্ছে প্রসবের চেয়ে কষ্টকর; তবে একটু বেশি মাত্রায় খেলে কাজ হবে।

মা বলল, তাতে যদি ঐ জিনিসটা নষ্ট হয়, তা'হলে আমি মরতেও রাজী। তা'হলে আমার ছেলেরা রেহাই পাবে আর কেউ জানতেও পারবেনা এ কলঙ্ক। বড়-জা মার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাইলো। থমকে দাঁড়িয়ে তার পানে চেয়ে বলল, হ্যাঁ, বোন, এখন তোমার স্বামী মারা গেছে আর কখনও এমন হবেনা তো?

শপথ করে মা বেদনাবিহ্বল-কণ্ঠে বলল, গত গ্রীষ্মের দিনের মতো আর কখনও যদি আমার শরীর গরম হয়, আমি পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে শরীরের জ্বালা জুড়াবো।

রাত্রিতে সে তার সঞ্চিত অর্থের অর্ধেকেরও বেশির ভাগ তুলে নিল মাটি খুঁড়ে। সুযোগমত টাকাটি ওষুধ কিনবার জন্য বড়-জাকে দিল।

ওষুধ সব কেনা হলো। সেগুলো ছেঁচা হলো। অন্ধকারের মধ্যে এলো বড়-জা। মা সেখানে অপেক্ষা করছিল। তাকে চুপি চুপি জিগ্যেস করলো, কোথায় খাবে? এত বড় নোংরামি তো ঘরে বসে করা যায়না।

মার মনে পড়লো রাস্তার ধারে সেই মন্দিরের কথা। বেশ নির্জন জায়গা, ক্বচিৎ দু'একজন পথিক যাতায়াত করে, রাত্রিতে কেউ সেখানে যায়না। দু'জনে মিলে গেল সেই মন্দিরে। ওষুধ পান করে মাটিতে শুয়ে পড়ল মা।

রাত্রি গভীর। তাকে ওষুধে ধরলো আশানুরূপ তীব্রতায়। সে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করে রইলো। যন্ত্রণা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগলো—যন্ত্রণার গ্লানিতে সবই বিস্মৃত হলো মা, ক্রমে সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। তবু, বুঝলো কষ্ট লাঘবের জন্য চিৎকার করে লাভ নেই, হয়তো কেউ যাবার পথে দূর থেকে মন্দিরের এই অনভ্যস্ত আলোকে তাদের দেখে ফেলবে। তাই যথাশক্তি সহ্য করতে হবে তাকে। অঝোরে ঘাম ঝরছে সর্বাঙ্গ বেয়ে। সে একটি হেঁচকা টান অনুভব করলো শরীরের অভ্যন্তরে। কোন্ পশু যেন তাকে ধরে উপ্ড়ে ফেলছে তার জীবনীশক্তি। অবশেষে এমনি এক মুহূর্ত এলো যখন তার মনে হলো প্রাণটুকু সত্যিসত্যিই বুঝি বেরিয়ে গেল। ভয়ে চিৎকার করে উঠল মা। বড়-জা মাদুরটি নিয়ে এলো, তুলে নিল যা নেবার। খেদে ফিস্ ফিস্ করে বলল, এও দেখছি ছেলেই হোত। তুমি সৌভাগ্য-বতী মা, এতগুলো পুত্র সন্তানের জননী!

যন্ত্রণাকাতরকণ্ঠে মা বলল, আর কখনও হবেনা। মা চিৎ হয়ে মাটিতে শুয়ে রইলো, কতক্ষণ বিশ্রাম করল, একটু সুস্থ হয়ে মাটি থেকে উঠে বড়-জার বাহুতে ভর দিয়ে নিঃশব্দে বাড়ি ফিরে এল। পুকুরের ধার দিয়ে যাবার সময় বড়-জা মাদুরের পুঁটলিটি ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এর পর কিছুদিন মা অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে শয্যাশায়ী রইলো। করুণাময়ী

বড়-জা যত রকমে সম্ভব সাহায্য করলো তাকে। তবু, সে-বছর সারাটি শীত ধরে মা অসুস্থ হয়ে রইলো। একটি বোঝা তোলা কিংবা কোন ভারী একটা জিনিস নিয়ে বাজারে যাওয়া তার পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল। তবু, সময় সময় এ কাজ তাকে করতেই হ'ত। অবশেষে, মাঝে মাঝে বেশ স্বাভাবিক-ভাবে শয্যাত্যাগ করে রোদে বসতে সুরু করলো সে। বসন্ত এলো। আগের মতো না হলেও সে একটু সুস্থ। মাঝে মাঝে বড়-জা তার জন্য লোভনীয় খাবার নিয়ে এলে তার হাত বুকে চেয়ে ধরে মা বলে, আমার গলা দিয়ে খাবার যায়না। এখানে ভারী একটা কিছু আটকে আছে। বুকের ভিতর প্রাণটি এত ভারী হয়ে দুলছে যে আমি কিছু গলাধঃকরণ করতে পারিনা। বুকে এমন বেদনা জমে আছে যে কেঁদে লাঘব করতে পারিনা। একবার যদি প্রাণ খুলে কাঁদতে পারতাম, তা'হলে হয়তো আমার অসুখ সেরে যেতো। সে তাই ভাবে, তবু কাঁদতে পারেনা। সারাটি বসন্ত ধরে সে কাঁদতে পারেনা, আগের মতো কাজ করতে পারেনা। বড় ছেলেটি প্রাণপণে একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ করে যায়। ভাশুর তার সামর্থের অতিরিক্ত সাহায্য করে। মা কাঁদতেও পারেনা, কাজও করতে পারেনা।

দিন যেতে লাগলো। যব মঞ্জুরিত হলো। মা উদ্দেশ্যহীনভাবে রোদে বসলো। অবসাদের দরুণ সেদিন চুলটাও আঁচড়াতে পারেনি। হঠাৎ কার পদধ্বনি শোনা গেল। চেয়ে দেখে নায়েব দাঁড়িয়ে আছে। বড় ছেলেটি তার কাছে এগিয়ে এসে বলল, আমার বাবা মারা গেছে, আমি তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছি। অনেকদিন ধরে আমার মার অসুখ কিনা, তাই! ফসল কেমন হোল দেখবার জন্য যদি এসে থাকেন, তবে আসুন আমার সঙ্গে, মা হাঁটতে পারবেনা।

মসৃণ, কোমল ঠোঁটওলা এই শহুরে লোকটি মার দিকে একবার ভাল করে চেয়ে দেখলো। তার কী হয়েছে জানতে বাকী নেই নায়েবের। মাও জানে সেকথা। নীরবে মাথা হেঁট করে থাকে, মা। উদাসভাবে সে বলল, বেশ, তাহলে চল। তারা দুজনে চলে গেল। মা সেখানে বসে থাকে একা।

সে এখন ভালো করেই জানে—এই লোকের কাছে কোন আশা তার নেই আর। এই দুর্বল শরীরে মারও প্রয়োজন নেই তাকে। কিন্তু একবার

শেষ বোঝাপড়া করে নেওয়া দরকার। সে এই স্বার্থপর লোকটিকে বুঝে নিয়েছে। মা নিজেকে কোন মতে সংযত করলো। তার চোখ ভরে উঠল জলে। সেখান থেকে উঠে সরু পথটি ধরে মাঠের ওপারে এলো এক নিকট-বর্তী কবরখানায়। এটি কোন এক অজ্ঞাতনামা যুবক বা যুবতীর নির্জন সমাধিস্থল। কেউ জানেনা—বহু প্রাচীন এই কবরটি কার। মা সেখানে ঘাসে-ঢাকা ঢিবির উপর বসে পড়লো। অবশেষে সে কান্না জুড়লো। মার দু'চোখ বেয়ে ধীরে ধীরে জল ঝরতে লাগলো, অসহ্য ব্যথায় অঝোরে কান্না সুরু করল মা। কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর অশ্রুর বেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কবরের উপর মাথা রেখে সে কাঁদতে লাগলো। এমন কান্না মেয়েরা কেঁদে থাকে। হৃদয় যখন তীব্র বেদনায় নিষ্পেষিত হয়, যখন দেখে—জীবন অকারণে ক্ষয় পাচ্ছে, তখন চোখের জল ফেলে এই দুর্বিষহ ভার লাঘব করাই তাদের একমাত্র কাম্য হয়ে ওঠে। কান্না শুনে গৃহস্থবধূ ও জননীরা পরস্পর বলাবলি করল, কাঁদুক, অভাগী কেঁদে একটু শান্তি পাক। বৈধব্যের পর এতকাল সে এতটুকু শান্তিও পায়নি। ওর ছেলেমেয়েদের বল যেন ওর কান্নায় বাধা না দেয়। তাই তারা কাঁদতে দেয় মাকে। অনেকক্ষণ সে কাঁদলো। মা তার পাশে একটি খস্‌খস্‌ শব্দ শুনলো। সূর্য অস্ত না যাওয়া অবধি কেঁদেছে সে। গোধূলি-আলোকে সে চেয়ে দেখলো। তার মেয়েটি পথ হাতড়ে সেখানে এসে চেঁচিয়ে বলল, জান মা, বৌদি বলে কেঁদে কেঁদে তুমি নিজেকে শান্ত কর। কিন্তু এত কেঁদেও কি তোমার শান্তি হয়নি, মা?

মা উঠলো তখন। তাকালো মেয়েটির দিকে। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসলো, অবিন্যস্ত কেশগুলো ঠিক করে নিল, স্ফীত চোখ দুটি মুছে দাঁড়ালো। মেয়েটি সূর্যাস্তের পর-মুহূর্তের গোলাপী সান্ধ্য-আলোর দীপ্তির জন্য চোখ বুজে মার দিকে হাত বাড়ালো। চিন্তাকুলভাবে বলল, আমায় যেন আর কোনদিন কাঁদতে না হয়! কাঁদলেই আমার চোখ জ্বালা করে।

কথাগুলো শুনে মা প্রকৃতিস্থ হলো, তৎক্ষণাৎ যেন ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল। এমনি দিনের শেষের এই ক'টি কথা, অনুসন্ধানী ছোট্ট সেই হাতখানি, তাকে

দীর্ঘ দিনের হতাশায় ভরা পরিবেশ থেকে ফিরিয়ে আনলো। সে এখন আবার হয় মা, চেয়ে দেখে তার সন্তানের দিকে। বিহ্বলতা পরিহার করে জিগ্যেস করলো, তোর চোখ কি আগের চেয়ে খারাপ হয়ে গেছে, মা?

মেয়েটি বলল, মনে হয়—আগের মতোই আছে, সুধু আলোয় যেন আগের চেয়ে বেশি জ্বালা করে। তাছাড়া, তোমার মুখও আগের মতো তেমন পরিষ্কার দেখতে পাইনা। এখন দাদাও তো লম্বা হয়ে যাচ্ছে। গলার শব্দ না শুনলে বুঝতে পারিনা তুমি এলে, না ও এলো। সস্নেহে মেয়েটির হাত ধরে চলতে চলতে মা ক্ষোভ করতে লাগলো, এতদিন কোথায় ছিলাম আমি? কাল সকালেই তোর জন্য মলম নিয়ে আসবো—নিশ্চয় আনবো—যেমন বলেছিলাম।

সে-রাত্রিতে মেয়ে ওছেলেদের মনে হলো—মা যেন কোন্ দূর দেশ থেকে ফিরে এসেছে—আবার হয়েছে মা। টেবিলের উপর খাবার রেকাবীগুলো রেখে সে কাজ করতে লাগলো। তার মুখখানি মলিন, রিক্ত,—প্রশান্তিতে ভরা নয়। সে তার প্রত্যেকটি সন্তানের পানে এমন ভাবে তাকায় যেন তাদের দেখেনি দু'এক বছর ধরে। ছোট ছেলেটির দিকে চেয়ে সে বলল, দেখ বাবা, তোর কোটটি কাল ধুয়ে দোব, কী নোংরা হয়ে গেছে, ছিঁড়েও গেছে দেখছি। আমি—তোর মা—থাকতে তোর মতো সোনার চাঁদ ছেলে এমন নোংরা কাপড় পরবে কেন? বড় ছেলেকে জিগ্যেস করল, তুই না সেদিন বলেছিলি তোর আঙগুলটি কেটে ঘা হয়ে গেছে? কৈ, আমায় একবার দেখা তো। হাতটি ধুয়ে ক্ষতে একটু তেল মাখাতে মাখাতে বলল, কেমন করে হল রে?

বিস্ময়ে চোখ মেলে সে বলল, তোমায় তো বলেছি মা, যব কাটবার জন্য তাড়াতাড়ি কাচি শান দিতে গিয়ে হাত কেটেছিল। মা তক্ষুণি বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে।

ছেলেরা অনুভব করলো হঠাৎ যেন একটা উৎসাহ এসেছে তাদের ঘিরে। বুঝলো, মার কাছ থেকেই এসেছে তাদের এ আগ্রহ। স্ফূর্তি জাগলো তাদের মনে, তারা মাকে বলতে লাগলো কত শত কথা। ছোট ছেলে বলল, রাস্তায় খেলে আমি দু-আনা জিতেছি, আর আমার এমন ভাগ্য—প্রায়ই আমি খেলায় জিতি।

মা ব্যগ্রভাবে তার দিকে তাকালো। দেখলো কী সুন্দর স্বাস্থ্যবান তার ছেলে। অবাক হয়ে ভাবল, কেন সে তা আগে আবিষ্কার করতে পারেনি। আন্তরিক স্নেহে বলল, মিষ্টি-মিঠাই কিনে খরচ না করে ভাল ছেলেটির মতো পয়সা জমিয়ে রাখ তো দেখি। এ কথায় গম্ভীর হয়ে ছেলে বলল, সুধু আজ, মা—কাল থেকে আমি মিঠাই কিনবো ভেবেছি! এ পয়সাটা রাখবারও কোন দরকার নেই। ইচ্ছা করলে আমি তো রোজই দু-আনা পেতে পারি। সে ভাবলো, মা বারণ করবে। কিন্তু মা শান্তকণ্ঠে বলল, বেশ, তাই কিনিস্, বাবা। ও-পয়সাটা তোর। বড় ছেলেটি নীরব ছিল এতক্ষণ। এবার সে এগিয়ে এলো তার বক্তব্য পেশ করতে। বলল, মা একটি মজার কথা বলবার আছে তোমায়। আজকে আমরা—আমি আর নায়েব—যখন মাঠের উপর দিয়ে যাই, তখন তিনি আমায় বললেন, এ বছরই নাকি তাঁর এ-পাড়ায় আসবার শেষ বছর, তিনি কাজের সন্ধানে অন্য জায়গায় যাচ্ছেন। বললেন, গাঁয়ের পথে পথে ঘুরে, একই চাষী ও তার পরিবার দেখে দেখে বিরক্তি ধরে গেছে। বছরের পর বছর সুধু সেই একই কাজ! তাই এখান থেকে অনেক দূরে—শহরে চলে যাচ্ছেন তিনি। শুনলো মা, শুনে একবার থামলো। টেবিলের উপরে জ্বালানো মোমবাতির অস্পষ্ট কম্পমান আলোকে ছেলের মুখের পানে চেয়ে বসে রইলো নীরব হয়ে। ছেলের কথা শেষ হয়ে গেলে মা এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো—যেন কথাগুলো অন্তরে মিলিয়ে যায়। রিক্ত তৃষিত ভূমিতে বৃষ্টিধারার মতো কথাগুলো মার হৃদয়ে মিশে গেল। চুপি চুপি ব্যাকুল কণ্ঠে জিগ্যেস করলো, সে কি তা-ই বলেছে, বাবা? নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, তা' যাক, এখন আমাদের ঘুমানো আর বিশ্রাম করা দরকার। কাল সকালেই আমি শহরে যাবো কিনা! তোর বোনের চোখের জন্য একটা মলম এনে তাকে ভালো করে তুলতে হবে। পরিপূর্ণ প্রশান্ত তার স্বর। কুকুরটি এলো খাবারের আশায়। সে তাকে ভাল করে খেতে দিল। অবাক হয়ে পশুটি তৃপ্তিভরে খেয়ে নেয়। দ্রুত গলাধঃকরণ করলো সে। তারপর উদর পূর্ণ করে খেয়ে তৃপ্তিতে দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

সেই রাত্রিতে মা ঘুমালো। তারা সবাই ঘুমালো। গভীর নিদ্রা মা ও তার সন্তানদের আচ্ছন্ন করলো।

॥ বারো ॥

পরের দিন।

প্রকৃতি গ্রীষ্মের অসমাপ্ত বৃষ্টিতে ধূসর, স্তব্ধ। বৃষ্টির ভারে আকাশ যেন উপত্যকার উপর নুয়ে পড়েছে; পাহাড়গুলো আড়াল হয়ে আছে। ভোরে উঠে মা মেয়েকে নিয়ে শহরে যাবার জন্য তৈরী হলো। আর একটি দিনও মেয়ের চিকিৎসার দেরী করা যায়না। সে অপেক্ষা করেছে অনেক—এমনকি, কয়েকটি বছরও গেছে কেটে। এখন—এই নব-মাতৃত্বে, চোখের জলে ধুয়ে নির্মল হয়ে গেছে। নিজের জন্য সে আর খুব বেশি অসহিষ্ণু বা ব্যস্ত হয় না।

ছোট মেয়েটি তার লম্বা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে উত্তেজনায় কাঁপছিল। একটি রঙীন দড়ি দিয়ে সে চুল বাঁধলো, নীলের উপর শাদা ফুল-তোলা একটি কোট পরলো। পাড়ার বাইরে সে কোথাও যায়নি কোনদিন। তৈরী হয়ে সকলকে সাগ্রহে বলল, আমার চোখ দুটি যদি আজ ভালো থাকতো-- শহরের কত সব অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেতাম!

একথা শুনে ছোট ছেলেটি তক্ষুণি বিজ্ঞের মতো বলল, হ্যাঁ, কিন্তু চোখ ভাল থাকলে তোমার তো যেতেই হোতনা।

তার চপল উক্তি শুনে মেয়েটি যথারীতি হাসলো। কোন কথা বললোনা। ছেলেটির মত সে চট্‌পটে নয়। সে ধীরে-সুস্থেই সব কাজ করে। একটু চিন্তা করে বলল, তা'তে কী? চোখ দুটো ভাল থেকে শহর না-দেখাই বরং ভালো ছিল। চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার থাকলেই ছিল ভালো।

ছেলের কথার অনেকক্ষণ পরে সে কথা বলল। এ-কাজ থেকে ও-কাজে, এ-খেলা থেকে ও-খেলায় মত্ত চঞ্চল ছেলেটি ততক্ষণে ভুলেই গেছে কী সে বলেছে। তিনজনের মধ্যে তাদের বাবার সঙ্গে ছোট ছেলেটির সাদৃশ্যই সব চেয়ে বেশি।

ছেলে-মেয়ের কথায় মা কান দিলনা। সে নিজে পোষাক পরে তৈরী হতে লাগলো। একবার ড্রয়ার খুলে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করলো। তারপর

একটি পঁুটলি বার করে কাগজের মোড়কটি খুলে দেখলো সেই গহনাগুলো। ভাবল, এগুলো রাখবো—না, বিক্রি করে টাকা নিয়ে আসবো? ক্ষণকাল চিন্তা করলো সে। আবার ভাবল, আমায় তো বিধবা বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে, আমি তো গহনা পরতে পারবোনা—সইতে পারবোনা সেগুলো পরে। তবে, মেয়ের বিয়ের জন্য গহনাগুলো রাখা যায়। সে গহনাগুলো হাতে নিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে তেমনিভাবে চিন্তা করতে লাগলো। হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটি কথা। ঘৃণায় স্ফীত হয়ে উঠলো তার কণ্ঠ। গহনা-গুলোও সকল স্মৃতি থেকে মুক্তির জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। প্রকৃতিস্থ হয়ে বলে উঠলো, না,—না—এগুলো রাখবোনা আমি। সে—আমার স্বামী—এক-দিন বাড়ি আসতে পারে। সে আমায় এ গহনা পরতে দেখবে—বললেও বিশ্বাস করবেনা যে আমি নিজে কিনেছি! মা তার বুকের মধ্যে পুঁটলিটি ফেললো, তারপর মেয়েকে ডেকে বলল, এবার যাত্রা করতে হবে।

ভোরের কর্মব্যস্ততা সুরু হবার আগে তারা চললো গাঁয়ের রাস্তা বেয়ে পাড়ার ভিতর দিয়ে। অনেকদিন পরে আবার সবল হয়ে, কুয়াশা-মাখা বাতাসে মাথা তুলে ধীরগতিতে চললো, মা।

সে মেয়ের হাত ধরেছিল। মেয়ে দ্রুত চলবার চেষ্টা করছিল প্রাণপণে। সে বুঝেনা তার দৃষ্টি কত ক্ষীণ। বাড়ির চারদিকের রাস্তায় সহজ-ভাবে তার পা দু'খানি চলে। সে জানেনা—সেখানে সে চলে স্পর্শ ও গন্ধে, দৃষ্টিশক্তির বলে নয়। কিন্তু অপরিচিত এ পথ, কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, মাঝে মাঝে পাহাড়গুলো নীচের দিকে ধসে গেছে। মার হাত না ধরলে কতবারই না সে পড়ে যেতো। দেখে দেখে মা ভয় পায়। একটি নতুন বিপদে বিব্রত হলো তার অন্তর। ভীত হয়ে সে বলল, তোকে হয়তো বড্ড দেরীতে নিয়ে এলুম। কিন্তু তুইও তো আমায় কোনদিন বলিস্‌নি যে তুই দেখতে পাস্‌না। আমি ভেবেছিলাম চোখে জল পড়ার জন্যই তুই দেখতে পাস্‌না।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে মেয়েটি বলল, আমারও মনে হোত, মা, বেশ দেখতে পাই আমি। (কথাটা হয়তো ঠিকই)। তবে, রাস্তাটি এত উঁচু-নীচু—আর আমি যেমন চলতে অভ্যস্ত তার চেয়ে তাড়াতাড়ি যাচ্ছ তুমি!

মা তার বেগ কমালো, কথা বললোনা। আর একটু ধীরে চললো তারা। কিন্তু মা অত্যন্ত ব্যগ্র ছিল। ঔষুধের একটি দোকান দেখেই অজ্ঞাতে গতি বাড়িয়ে দিল আবার। তখনও সকাল। তারাই প্রথম খদ্দের, দোকানী সবেমাত্র দোকানের কাঠগুলো তুলে নিচ্ছে ধীরে ধীরে। সে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে হাই তুলছিল আর অবিন্যস্ত চুলের ভিতর হাত বুলিয়ে চুলগুলো ঠিক করছিল ও মাথা চুলকোচ্ছিল। গ্রাম্য মহিলাকে তার মেয়ে নিয়ে সেখানে দাঁড়াতে দেখে বিস্মিতভাবে জিগ্যেস করল, এত সকালে কি চাই, তোমাদের?

লোকটি মেয়েটির পানে তাকালো। দেখলো—তার চোখ দু'টি বিবর্ণ, চোখের কোণা লাল ও আঁচড়-কাটা। সে চোখ দুটো প্রায় খুলতেই পারেনা। বলল, এর চোখ এমন হোল কি করে?

উত্তরে মা বলল, আগে ভেবেছিলাম ধোঁয়া লেগে এমন হয়েছে। আমার স্বামী মারা গেছে। পুরুষের মতো আমাকে মাঠে কাজ করতে হয়। আমার ফিরতে দেরী হলে প্রায়ই ওকে উনুন ধরাতে হয়। কিন্তু এই ক'বছর আমি তাকে ধোঁয়ায় যেতে দিইনি, তাই মনে হচ্ছে—আমার ধারণা ঠিক নয়। মনে হয়—একটা উত্তাপ কোথা থেকে এসে তার চোখ দু'টি পুড়িয়ে দিয়েছে। সে যে কী আগুন জানিনা। মেয়েটি এত শান্ত যে কোনদিন অধৈর্য হয়না।

শির-সঞ্চালন করলো লোকটি, হাই তুললো আবার। মুখব্যাদান করে তেমনি-ভাবে বলল, এমনি চোখ অনেকেরই হয়ে থাকে, আর এ রোগ অনেক রকমের হতে পারে। এ প্রদাহ কমাবার কোন ওষুধ নেই। এ ক্রমশঃ বাড়তেই থাকবে। এ-রোগের ওষুধ হয়না।

কথাগুলো দু'জনের অন্তরে লোহার হাতুড়ির আঘাতের মতো বিঁধলো। মা মৃদু মিষ্ট কণ্ঠে বলল, কিন্তু হয়তো—নিশ্চয়—কোন ডাক্তার আছেন! আপনার কি কোন ডাক্তার জানা আছে? গরীব মানুষ আমরা। কোন ভালো—অথচ বেশি টাকা চান না এমন—ডাক্তার কি আপনার জানা আছে?

লোকটি আবার ঘাড় নেড়ে ছোট্ট একটি কাঠের বাক্স থেকে একটা ওষুধ আনতে গেল। যেতে যেতে বলল, জানি, এর চোখ ভালো করবার কোন উপায় নেই। এমনি চোখ আমি কত দেখেছি। রোজ কত লোক এমনি চোখ নিয়ে আসে,

বলে, অন্তর্জ্বালার কথা। বিদেশী ডাক্তারেরাও নাকি সত্যিকারের ভালো ওষুধ আবিষ্কার করতে পারেনি। তাঁরা চোখ কেটে ঈশ্বরের নাম নিয়ে আজব পাথর দিয়ে ঘসে দেন। তবু অন্তর্দাহ প্রকাশ পায়, চোখ দুটোকে জ্বালায় আবার। সে-আগুন কেউ নিভাতে পারেনা। সে-যে জীবনের মূলে বসে পোড়ায়! তবে, একটি ঠান্ডা পাউডার আছে, তাতে রোগ না সারলেও খানিকটা উপশম হয়।

সে গুঁড়ো গমের মতো একটা পাউডার নিয়ে এলো। কালো গমের মতো রঙ। একটি রাজহাঁসের পালকের খোলের ভিতর পাউডার পুরে চর্বি লাগিয়ে সে মুখটি বন্ধ করলো। বলল, দেখুন মা, এ অন্ধ! মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো—একথা শুনে তাকে এক অপ্রত্যাশিত কঠিন আঘাতে হতভম্ভ শিশুর মতো দেখাছে। তখন একটু দয়ার্দ্র হয়ে আবার বলল, তা দুঃখ করে কী লাভ? এ ওর অদৃষ্ট। গত জন্মে হয়তো ও কোন পাপ করেছে কিংবা নিষিদ্ধ কিছু একটা খেয়েছে, তাই এ অভিশাপ। তার বাবা কিংবা আপনি হয়তো কোন পাপ করেছেন। মনের খবর কে রাখে? সে যাহোক্, অভিসম্পাতটা এসে পড়েছে মেয়ের উপর। দৈবকে তো কেউ খন্ডাতে পারেনা! এই করুণাটুকু দেখিয়ে আবার হাই তুললো সে। তারপর স্ত্রীলোকটির দেওয়া আনিটা তুলে নিয়ে ভিতরের একটি ঘরে ঢুকে পড়লো। ক্ষুব্ধা জননী জোর দিয়ে বলল, ও অন্ধ নয়। চোখের ক্ষতে কে কবে অন্ধ হয়েছে? আমার শাশুড়ীর চোখ দু'টো ছিল আজন্ম ক্ষত। কিন্তু মরবার দিন পর্যন্ত তিনি চোখে দেখতে পেতেন। লোকটি উত্তর দেবার আগেই সজোরে মেয়েটির কম্প্রমান হাতটি ধরে সে চলে গেল এক স্যাক্রার দোকানে। আগের সেই দোকানদারের কাছে সে গেলনা। বুকের ভেতর থেকে পুঁটলিটি বার করে সে দাড়িওলা দোকানীকে দিল। নীচু গলায় বলল, আমার এ জিনিসটা রেখে দামটা দিন্। আমার স্বামী মারা গেছে, আমি আর এগুলো পরতে পারিনা।

বুড়ো দোকানী নিক্তিতে ফেলে জিনিসগুলো ওজন করে দেখতে লাগলো। মা দাঁড়িয়ে রইলো। মেয়েটি তখনও হাঁফাচ্ছিল। জোরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল, মা, আমি সত্যিই বিশ্বাস করতে পারিনা—আমি অন্ধ। ঐ যে নিক্তির

উপর চক্‌চকে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি। অন্ধ হলে আমি কি তা দেখতাম? চক্‌চক্‌ করছে ওটা কি?

মা বুঝলো, সত্যিই তার মেয়েটি অন্ধ অথবা অন্ধেরই সামিল। উজ্জ্বল গহনাগুলো এত কাছে রয়েছে, অথচ তা-ই সে দেখতে পাচ্ছেনা। ব্যথায় সিক্ত হয় মার অন্তর। বলল, ঠিক বলেছিস্‌ মা, এ আমার রুপোর আংটি। এখন তো আর আমি ওটা পরতে পারবোনা, তাই বদলে টাকা নিচ্ছি। এই নবাগত বেদনায় মা ভাবলোনা তার গহনাগুলোর কথা; যখন সেগুলো হাত থেকে চলে গেল তখন একবার চিন্তা করলোনা তাদের রহস্যের বিষয়। সুধু ভাবলো—এই উজ্জ্বল রৌপ্যদীপ্তিও দেখতে পায়না তার মেয়েটি! বুড়ো দোকানী গহনাগুলো নিয়ে চুড়ি, আংটি, ছোট ছেলেমেয়েদের গলার হার ও অন্যান্য রকমারি জিনিসের সঙ্গে তার "শো-কেস্‌"-এ ঝুলিয়ে রাখলো। মেয়েটি অন্ধ, এই উজ্জ্বল পদার্থটিও সে চোখে দেখতে পায়নি—সুধু একথা ছাড়া আর সবই ভুলে গেল, মা।

হ্যাঁ, আর একটি কাজ আছে করবার। যদি সত্যি-সত্যিই মেয়েটি অন্ধ হয়ে থাকে তবে যে এ-কাজ তাকে করতেই হবে! মেয়ের হাত ধরে সে চললো। রাস্তা এখন লোকে ভর্তি, কেনা-বেচা করতে বেরিয়েছে অনেকে। কৃষকেরা ও মালীরা তাদের সবুজ তাজা শাকসব্জীর ঝুড়ি রাস্তার ধারে বিছিয়েছে, জেলেরা মাছের খাঁচা পেতে রেখেছে। মা একটি দোকানের কাছে এলো। মেয়েটিকে দরজার পাশে রেখে সে একা দোকানে ঢুকলো। সে কি চায় জানতে দোকানী এগিয়ে এলো। একটি জিনিসের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে মা বলল, ওটা—! জিনিসটা হচ্ছে পেতলের একটি পেটা-ঘড়ি ও ছোট্ট কাঠের হাতুড়ি। পথে চলবার সময় পথিককে সতর্ক করে দেবার জন্য অন্ধেরা এই জিনিসটা ব্যবহার করে থাকে। সেটি বেঁধে দেবার আগে দোকানী দু'একবার বাজিয়ে তার উপকারিতা দেখিয়ে দিল। শব্দ শুনে ঘাড় তুলে মেয়েটি বলল, একটি অন্ধ এসেছে, মা। ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি।

মেয়েটিকে অন্ধ দেখে দোকানী খুব এক চোট হেসে বলল, অন্ধ আর কেউ নয়—

বাধা দিয়ে তীব্র গর্জন করে উঠলো মা। অসমাপ্ত রয়ে গেল তার কথা। সে তাড়াতাড়ি মার হাতে জিনিসটা দিয়ে নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। দেখলো—মা চলে যাচ্ছে, বুঝতে পারলোনা—কী সে করবে।

তারপর ওরা দু'জনে বাড়ি ফিরে এল। বাড়ি ফিরে মেয়েটি খুশী হলো। সকাল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শহর কলরব-মুখর হয়ে উঠেছিল। অনভ্যস্ত, ভীতিকর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। মেয়েটি শুনছিল দরকষাকষির শব্দ, রাস্তায় যাদের সে দেখতে পাচ্ছিলনা, তাদের সঙ্গে তার গায়ে ধাক্কা লাগছিল। অনভ্যস্ত পা দুখানি এখানে-ওখানে পড়ছিল। বেদনায় স্মিতহাস্যে চলতে হয়েছিল তাকে। মার মনও বেদনাপ্লুত। সে এক হাতে ধরেছিল মেয়েকে, অন্য হাতে শক্ত করে ধরেছিল তারই জন্য কেনা অন্ধত্বের নিদর্শন সেই ঘণ্টা আর হাতুড়ি।

নিজের হাতে থাকলেও সে সেটি মেয়ের হাতে দিতে পারলোনা। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনা তার মেয়েটি সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনা। সারাটি গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা করলো সে। আবার ফসলের সময় এলো। নতুন নায়েব—এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে জমিদারের প্রাপ্য দেওয়া হোল। শরৎ এলো; তবু, মা মেয়েটিকে সেই ঘণ্টা দিতে পারলনা। এখনও একটি কাজ করবার আছে। দেবতার কাছে ধন্না দিতে হবে। অন্ধ মেয়েটির দিকে চেয়ে প্রতিদিন মার মনে পড়ে ওষুধওলার সেদিনকার কথা ঃ হয়তো তার মা-বাবা কোন পাপ করেছে। মনের খবর কে রাখে?

মা ঠিক করলো—সে তারই পরিচিত কোন দেবালয়ে যাবে। রাস্তার ধারের সেই মন্দিরে কিংবা যাদের মুখ সে পাপকার্যের সময় ঢেকে দিয়েছিল সেই দেবতাদের কাছেও নয়। অনেক অনেক দূরে, দশ মাইলেরও বেশি দূরে কোনো একটি মন্দিরে সে যাবে। সে শুনেছে—সদয়, জাগ্রত দেবতা রয়েছেন সেখানে। তিনি শোনেন—স্ত্রীলোকের আকুল আবেদন। মা সেখানে যাবার কারণ ছেলে দু'টিকে জানালো। বিষণ্ণ, গম্ভীর, ভীত হলো তারা—বোনের এ বিপদের কথা শুনে। বয়ঃপ্রাপ্তের মতো বড় ছেলেটি বলল, অনেকদিন থেকে আমার আশঙ্কা হচ্ছিল—ওর একটা কিছু হয়েছে। কিন্তু ছোটটি বিস্মিত হয়ে বলল, আমি তো স্বপ্নেও ভাবিনি তার চোখ খারাপ, রোজই তো

তাকে দেখ্‌ছি।

মা মেয়েটিকেও বলল, আমি দক্ষিণে সেই জাগ্রত-ঠাকুরের মন্দিরে যাচ্ছি। আজীবন বন্ধ্যা হয়ে থাকবার পর যখন ষষ্ঠ-লীর স্ত্রীর সন্তান হবার সময় চলে যাচ্ছিল আর তার স্বামী অধৈর্য হয়ে আবার বিয়ে করতে যাচ্ছিল, সেই-সময় এই ঠাকুরের কৃপায় "লী"র বউ সন্তান প্রসব করেছিল। ঐ মন্দিরে ধন্না দিয়েই সে ছেলে পেয়েছিল।

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ মা, আমার বেশ মনে আছে। ঠাকুরের জন্য সে তো এক-জোড়া জুতো তৈরী করেছিল। ছেলে হবার পর সেগুলো ঠাকুরের মন্দিরে দিয়ে এসেছিল। হ্যাঁ, মা, শিগ্‌গির যাও, ঐ ঠাকুর সত্যিই খুব জাগ্রত।

মা তাই একা যাত্রা করলো, বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করলো সারাদিন। সারাটি মাস ধরে অবিশ্রান্তভবে চলেছে এই বাতাস। উত্তরের মরুভূমি থেকে ভেসে-আসা হিমেল হাওয়ায় গাছের পাতা কাঁপছে, রাস্তার ধারের ঘাসগুলো কুঞ্চিত, শুষ্ক হয়েছে, ক্ষয় ও মৃত্যু ঘটছে সব কিছুরই। কিন্তু বাতাসের চেয়েও প্রচণ্ড, ভয়ংকর ছিল মার মন। তার ভয়—নিজের পাপই বুঝি এসে পড়েছে তার সন্তানের উপর! অবশেষে সে এসে পেঁাছলো সেই মন্দিরে। একবার দেখলোনা—কী বিশাল, কেমন সুন্দর এ মন্দির; গোলাপী, লাল রঙে বিচিত্র তার প্রাকার, মূর্তিগুলো ঝলমল করছে, ইতস্ততঃ কত লোক আসছে পূজার উদ্দেশ্যে। সে ক্ষিপ্রপদে ভেতরে ঢুকলো, খুঁজলো সেই ঠাকুরকে। দরজায় যেখানে ধূপ বিক্রি হয় সেখান থেকে একটু ধূপ কিনল। গেরুয়া কাপড় পরা পূজারীর সঙ্গে প্রথম দেখা হতেই জিগ্যেস করলো, জাগ্রত ঠাকুরটি কোথায়?

যারা নিয়ত এখানে সন্তান কামনায় আসে, তাকে তাদেরই একজন ভেবে তিনি দেখিয়ে দিলেন একটি অন্ধকার কোণ—যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছেন দু'জন সহচরী-পরিবেষ্টিতা একটি কৃষ্ণকায়া দেবী-মূর্তি। মা সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। দেখলো, এক বৃদ্ধা দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে তার ছেলের জন্য। ছেলেটি অনেকদিন থেকে চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়ে আছে, আর এমনি শয্যাগত থাকার দরুণ তার সন্তানাদি হচ্ছেনা। প্রার্থনার সুরে বৃদ্ধা বলল, আমায় বলে দাও, ঠাকুর! যদি আমাদের ঘরে কোন পাপ ঢুকে থাকে

যার জন্য আমার ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো—আমি নিজে তার প্রায়শ্চিত্ত করবো!

তারপর উঠে, কেশে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল। মা নতজানু হয়ে জানালো তার কামনা। বৃদ্ধার প্রার্থনাটি সে ভোলেনি তখনও। মার মনে হলো—দেবী তীব্র ঘৃণাভরে চেয়ে আছেন, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি এমনি এক পাপীয়সীর প্রার্থনায় অবিচল দেবীর মসৃণ কনকময় চোখের দৃষ্টি যেন নীচের দিকে নিবদ্ধ।

মা উঠলো গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সে বুঝতে পারেনা—কী মূল্য তার এ আবেদনের। ধূপটি জ্বালিয়ে দিয়ে সে চলে এলো। শীতার্ত, শ্রান্ত হয়ে দশ মাইল হেঁটে বাড়ি ফিরে এসে বেঞ্চির উপর শুয়ে পড়লো। ছেলেরা এসে জিগ্যেস করলো—কী হলো তার আবেদনে। উত্তরে বলল, বিধাতার ইচ্ছা আমি কেমন করে জানবো? আমি ঠাকুরের কাছে আমার আর্জি পেশ করে এসেছি। বিধি যা করেন তাই হবে—আমি সুধু অপেক্ষা করে দেখতে পারি—কি হয়!

মনে মনে গোপনে সে ভাবলো—যদি সে পাপ না করতো! যতই ভাবে—ততই বিস্মিত হয়—কেমন করে এ পাপ সে করলো? সেই মসৃণ-মুখ লোকটির উপর বিষিয়ে উঠলো তার মন, এ পাপের জন্য ঘৃণা হলো তার উপর। যা হয়ে গেছে তা তো আর খণ্ডন করা যায়না। তার যৌবন নেই আর। নির্ভর করবার মতো পুরুষ বলতে দুনিয়ায় কেউ নেই। আছে—সুধু দু'টি পুত্র সন্তান, আর একটি অন্ধ মেয়ে!

॥ তের ॥

মা এখন বিগতযৌবনা। বয়স হয়েছে তেতাল্লিশ। মাঝে মাঝে সে আঙ্গুল গুণে দেখে—ক'বছর হলো তার স্বামী ঘর ছেড়ে গেছে। দু'হাতের আঙ্গুলের সমষ্টির চেয়ে আরো দুই বেশি। এমনকি, এক হাতের আঙ্গুলের বেশি বছর হলো—স্বামীর মৃত্যুর খবর পল্লীবাসীদের জানানো হয়েছে।

তবু সে সোজা হয়ে চলে, এখনও সে আগের মত তন্বী রয়েছে, শরীরে মেদ

বাড়েনি এতটুকু। অপর স্ত্রীলোকেরা হয়তো তার জায়ের মতো বছরের পর বছর স্থূলকায়া কিংবা কুঞ্চিতচর্ম হয়ে চলেছে। সেই প্রগল্‌ভা বিধবাও বেশ মোটা হয়ে গেছে, কিন্তু মা আগের মতো কৃশাঙ্গী ও সুস্থ আছে। তবে, তার বুক ছোট ও শুষ্ক হয়েছে। প্রখর সূর্যালোকে গোটা মুখখানি দেখলেই চোখের চারধারে কয়েকটি রেখা দেখা যায়। বহু বর্ষ ধরে মাঠের রোদে পুড়ে তার গায়ের চামড়া কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেছে। আগের চেয়ে মন্দ হয়েছে তার গতি, শরীর আর তেমন পাতলা নেই। সেই প্রচণ্ড জীবনটুকু তার ভেতর থেকে ছিঁড়ে বার করে দেবার পর থেকে সে আর আগের মতো হতে পারেনি। এখন সে বিধবা, তরুণীদের দলের বাইরে। তাই, পাড়ায় কারো প্রসবের সময় উপস্থিত হলে তার ডাক পড়ে। কখনও বা যতটুকু তাড়তাড়ি প্রয়োজন ততটুকু ক্ষিপ্রগতিতে যাওয়া তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। দু'এক ক্ষেত্রে তরুণী প্রসূতিকে নিজে নিজেই সন্তান ধরতে হয়েছে। মা একবার একটি নবজাত শিশু-পুত্রকে মেঝেয় ফেলে মাথায় চোট দিয়েছিল। ভাগ্যিস্, ছেলেটির কোন অনিষ্ট হয়নি। শিশুটিও বেশ শক্ত ও সতেজ হয়েছিল।

তার ছেলেরা বড় হয়েছে। মাকে বৃদ্ধা মনে করে তারা। বড় ছেলেটি সর্বদা তাকে বিশ্রাম নিতে বলে; লাঙ্গল দেবার পর মাটির আলগুলো না ভেঙে তার জন্য রেখে দিতে অনুরোধ করে, বলে—তার দেহে নবযৌবনের শক্তি রয়েছে, সে সহজেই একাজ করতে পারবে। মাকে জানায়, সে যেন অল্প পরিশ্রমের ছোটখাটো কাজ করবার চেষ্টা করে। গরমের দিনে মা যখন ছায়াতলে বেঞ্চির উপর নীরবে বসে সেলাই করে, আর তাকে একাকী মাঠে যেতে হয় তখনই সবচেয়ে বেশি খুসী হয় ছেলেটি।

তবু, আসলে তার ছেলে যেমন মনে করে তেমন বুড়ো হয়নি, মা। অন্য যে-কোন কাজের চেয়ে মাঠের কাজই তার বেশি প্রিয়। সারাদিন মাঠে কাজ করে ঘর্মসিক্ত দেহে, মধুর বাতাসে শ্রান্ত তনুখানি শীতল করে, বাড়ি ফিরতে সে ভালবাসে। মাঠ, পাহাড় ও বড় বড় জিনিস দেখতে অভ্যস্ত তার দুটি চোখ সূঁচের মতো অপরিসর সরু জিনিসের মধ্যে সহজে সীমাবদ্ধ থাকতে চায়না।

সত্যিই চোখে ভালো দেখতে পায় এমন কোন স্ত্রীলোক তাদের বাড়িতে নেই!

এ অভাব তারা অনুভব করে। সবাই জানে—মেয়েটি অন্ধ। সে-বেচারী নিজেও তা জানে। যেদিন মার সঙ্গে সে শহরে গিয়েছিল সেই-দিন থেকে, তার মা যেমন জানে তেমনি, সেও এ-কথাটি জানে মনে মনে। ঠাকুর দেবতার উপর দু'জনের কারো বিশ্বাস নেই আর। মা ভাবে—এ তার সেই পুরানো পাপের ফল; মেয়েটি মনে করে—তার এ দৃষ্টিহীনতা বিধিলিপি! সেদিন মা জিগ্যেস করলো, সেই হাঁসের পালকভরা সবটুকু ওষুধই কি ব্যবহার করে ফেলেছিস? সিঁড়ির কাছে দরজায় বসেছিল মেয়েটি। এখন ভালোর মধ্যে এটুকু হয়েছে যে চোখে আর আলো লাগেনা, আলোকে সে দেখতেই পায়না। সে শান্তভাবে উত্তর দিল, সেটা তো অনেকদিন হলো শেষ হয়ে গেছে, মা।

মা আবার বলল, ওষুধটা আরও কিনতে হবে। এতদিন আমায় বলিসনি কেন?

ঘাড় নাড়লো মেয়েটি। তার শূন্য দৃষ্টিতে মার বুকের স্পন্দন থেমে গেল। মেয়েটির প্রশান্ত ঠোঁট দু'টি থেকে বেরিয়ে এলো, মা আমি যে অন্ধ! আমি জানি—আমি অন্ধ। এখন আর তোমার মুখখানি একটুও দেখতে পাইনা, উঠান পেরিয়ে বাইরে গেলে খামারে যাবার রাস্তাও ঠিক করতে পারিনা। তুমি কি দেখতে পাওনা মা, আমি এখন ঘরের বাইরে যাইনা, এমনকি মাঠেও না? ঠোঁট দুটো কামড়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো সে। কাঁদলে যন্ত্রণা অনুভব করে সে। তাই অপরিহার্য না হলে সে চোখের জল ফেলেনা।

মা কিছুই বললোনা। কি আছে এই অন্ধ মেয়েটিকে উত্তর দেবার? কিন্তু একটু পরে সে উঠলো। ঘরের ভিতর যে ড্রয়ারটিতে আগে গহনা থাকতো, সেই ড্রয়ারটি খুলে পেটা-ঘড়িটি বার করলো। তারপর মেয়েটির কাছে গিয়ে বলল, এটি কিনেছিলাম, মা, সেই দিনের জন্য—যেদিন—

সে কথাটি শেষ করতে পারলোনা—মেয়ের হাতে জিনিসটি দিল। সেটি হাতে নিয়ে হাত দিয়ে অনুভব করে জোরে মুঠোর মধ্যে নিয়ে সে বলল, হ্যাঁ মা, আমার এটি দরকার।

সেদিন সন্ধ্যায় বড় ছেলেটি বাড়ি ফিরে এলে মা তাকে বলল—যেন

একটি শক্ত গাছের ডাল কেটে পালিশ করে লাঠি তৈরী করে তার বোনের হাতে দেয়, যাতে এক হাতে ছোট ঘণ্টা সংকেতটি ও আর এক হাতে লাঠিটি নিয়ে আর-আর অন্ধের মতো সে সহজভাবে, নির্ভয়ে চলতে পারে। তাহলে যদি তার কোন অনিষ্ট হয়,—কেউ অসাবধানে ধাক্কা দেয় আর সে মাটিতে পড়ে যায়, যাকে দোষ দেবেনা কেউ। সকলের দেখবার জন্য সে তো তার মেয়েটিকে অন্ধত্বের নিদর্শন দিয়েছে!

এর পর মেয়েটি বাইরে যাবার সময় এই দুটো জিনিস নিয়ে যায়—লাঠি আর ছোট পেটা-ঘড়িটি। ধীর অথচ স্পষ্টভাবে ঘড়িটি বাজাতে শিখেছে সে। শান্ত, অচঞ্চলভাবে পথ চলে সুন্দরী মেয়েটি। ছোট্ট, বিষাদপূর্ণ তার মুখের উপর অন্ধের স্থির দৃষ্টি!

ঘরের কাজে অদ্ভুত রকমের চতুরা সে। বাড়িতে কোন নিদর্শনী বা লাঠির দরকার হয়না তার। সে চাল ধুয়ে রান্না করতে পারে। তার মা তাকে আগুন ধরাতে দেয়না সুধু। কিন্তু সে ঘর ও খামার ঝাঁট দিতে পারে, পুকুর থেকে জল আনতে পারে, মুরগী নির্দিষ্ট জায়গার বাইরে ডিম পাড়লে ডিম-গুলো খুঁজে নিতে পারে, গন্ধ ও শব্দে পশুদের অবস্থান বুঝতে পারে, তাদের সামনে খাবার রেখে আসতে পারে। সুধু মাঠের কাজ ও সেলাই করা ছাড়া সব কাজই সে করতে পারে। মাঠে কাজ করবার মতো শক্তি নেই তার দেহে। আশৈশব ভুগে ভুগে সে যেন ঠিকমত বাড়তে পারেনি, শরীরের গঠন তেমন শক্ত হয়নি।

মেয়েটিকে ঘরের আশেপাশে ঘুরতে দেখে মার অন্তর বেদনাবিহ্বল হয়ে পড়ে। ভাবে—যখন কোথাও এর বিয়ে হবে তখন তার অদৃষ্টে কি ঘটবে কে জানে? মার মৃত্যুর পর কে দেখবে? সুতরাং বিয়ে দিতেই হবে তার। কার কাছে সে থাকবে? স্ত্রীলোক তো প্রধানতঃ স্বামীগৃহেরই অধিবাসিনী হয়ে থাকে—যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানকার নয়। মা প্রায়ই ভাবে একথা। ভেবে পায়না—কে নেবে অন্ধ এই কুমারীকে? পরিণাম কি হবে—যদি কেউ তার পাণি গ্রহণ না করে? কখনও সে-সম্বন্ধে কথা তুললে বড় ছেলে বলে, যতদিন পর্যন্ত সে আমার কাছে থাকতে চায় ততদিন আমিই তার দেখাশোনা করবো। এ কথায় মা একটু আশ্বস্ত হয়। তবু,

সে জানে—পুত্রবধূটি কেমন হবে না-জানা পর্যন্ত পুরোপুরি ছেলেকে বোঝা সম্ভব নয়। ভাবে, এমন একটি বৌ ঘরে আনবো—যে আমার অন্ধ মেয়েকে দেখাশোনা করবে, তার প্রতি করুণাময়ী ও ক্ষমাশীলা হবে। বধূ-নির্বাচনের সময় আমি এমন একটি মেয়ে বেছে নেব—যে তার স্বামী ও বোন দু'জনেরই তত্ত্বাবধান করবে।

ছেলের বিয়ে করবার সময় হয়েছে। এরই মধ্যে তার বয়েস কখন উনিশ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু সে কখনও বিয়ের কথা বলেনি বা এমন ভাব দেখায়নি যে তার স্ত্রীর প্রয়োজন। শান্ত, সুবোধ, আদর্শ-ছেলের মতো কিছু যাচ্ঞা না করেই সে নীরবে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। বিনা প্রয়োজনে সে শহরে যায়না। ক্বচিৎ কোন উৎসবের দিনে কিংবা অবসরে, চায়ের দোকানে অথবা শহরে গেলেও কোন অশ্লীলতায় অংশ গ্রহণ করেনা। দূর থেকে দেখা ছাড়া জুয়া খেলায় পর্যন্ত যোগ দেয়না, বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে কোন কথা বলেনা।

সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক, চরিত্রবান ছেলে! শৈশবের ছেলেমানুসি কেটে গেছে। সুধু দোষের এই যে—সে ছোট ভাইয়ের উপর বিরূপ। ছেলেটি সকলের কাছে অতি শান্ত ও ন্যায়পরায়ণ, এমনকি পশুদের উপরও সদয়। সে এত গম্ভীর যে নিজের জন্য কোন্ রঙের জামা কিনবে—সেকথাটিও মাকে বলেনা। কিন্তু আশ্চর্য! সে তার ছোট ভাইয়ের প্রতি নির্দয়। ছোট ভাইকে কাজে একটু ঢিল দিতে কিংবা খেলতে দেখলেই সে তার সঙ্গে কোন্দল করে, মাঠের নানা কাজে তাকে অনর্থক আটকে রাখে। ঘরে এসে দু'জনে ঝগড়া করে, ছোট ছেলেটি চেঁচামেচি করে, গালমন্দ পাড়ে। বড় ছেলেটি চুপ করে থাকে। অবশেষে, সইতে না পেরে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতে যা কিছু থাকে তা'ই নিয়ে—কিছু না থাকলে খালি হাতেই—তাকে মারতে থাকে। ছোট ছেলেটি নিজেকে মুক্ত করে উচ্চৈঃস্বরে গালি দিতে দিতে বাইরে ছুটে গিয়ে তার জেঠার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সত্যিই, অবস্থা এমন হয় যে পাড়ার সকলেই এ নির্মমতার জন্য বড় ছেলের উপর দোষারোপ করে, ছোট ছেলেকে আগ্লাতে এগিয়ে আসে। প্রশ্রয় পেয়ে ছোট ছেলেরও সাহস বেড়ে যায়। সে প্রায়ই কাজ পালিয়ে জেঠার বাড়িতে সময় কাটায়, সে-বাড়ির ছেলেমেয়ের

দলে মিশে। দাদাকে কাজে যেতে দেখলেই নির্বিবাদে বাড়ি ফিরে আসে। মাঝে মাঝে বড় ছেলে রুষ্ট হয়ে অসময়ে বাড়ি ফিরে আসে। ছোট ভাইকে ধরে তার মাথাটি বগলে চেপে মারতে থাকে। মা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বলে, থাক্ থাক্ হয়েছে—ছিঃ-ছিঃ, তোর কি লজ্জা করেনা ছোট ভাইকে এমনি করে মেরে বোনটির মনে ভয় লাগিয়ে দিতে?

যুবক তিক্তভাবে উত্তর দেয়, বাবা বাড়ি নেই। আমি তার বড় ভাই, আমি তাকে শাসন করবোনা? আল্‌সে, ইতর কোথাকার—! সারাদিন—যখনই পারে তখনই—সুধু খেলা আর খেলা! আর তুমিও তো তা' বেশ ভাল করেই জান, মা। তবু তুমি তাকেই বেশি ভালবাসো।

সত্যিই, মা ছোট ছেলেকে সবচেয়ে ভালবাসে। আর দুটি সন্তানের চেয়ে সে-ই তার অন্তর বেশি নাড়া দিয়েছে। মার মনে হয়—বড় ছেলে তাড়াতাড়ি সাবালক হয়ে উঠেছে। সর্বদাই চুপ করে থাকে সে, কোন কথা বলেনা। এতদিন মা তা লক্ষ্য করেনি। প্রায়ই শ্রান্ত থাকে সে। বেশি শ্রান্ত হলেই তাকে অপ্রসন্ন মনে হয়। মা ভাবে—এ সুধু অবসাদ-জনিত। মেয়েকে-ও মা ভালবাসে খুব। কিন্তু তার দৃষ্টিশক্তিহীনতা-অভিশাপের আঘাত বাজে বুকে। সে ভুলতে পারেনা—দেবী তার প্রার্থনায় কর্ণপাত করেননি। পুনরায় তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাবার ইচ্ছে নেই তার। তার নিজেরই পাপ বুঝি এমনি ভয়ানক দুর্বিষহ হয়ে এসে পড়েছে সন্তানের উপর। তাই, অন্তর করুণাসিক্ত হলেও মেয়েকে দেখে সে আনন্দ বোধ করেনা। এমনকি, মেয়েটি যখন সস্নেহে, স্মিতাননে মার কণ্ঠস্বর শুনতে কাছে এসে বসে, তখন মা কোন অজুহাতে উঠে গিয়ে কাজ আরম্ভ করে। মুদ্রিত, শূন্য সেই চোখ দুটি সে সইতে পারেনা।

এই ছোট ছেলেই স্বাস্থ্যবান, পূর্ণাঙ্গ ও প্রফুল্ল। তাকে তার বাবারই প্রতিচ্ছবি মনে হয়। মা তাই তাকে ভালবাসে আরও বেশি। স্বামীর প্রতি তার সকল ভালবাসা এই ছেলের উপর এসে পড়েছে। মা তাকে ভালবাসে, এসে দাঁড়ায় বড় ছেলে ও তার মাঝখানে। বড় ছেলে ছোট ছেলেকে ধরলে তাড়াতাড়ি ছুটে আসে, প্রতিরোধ করে আঘাত। মার গায়ে লাগবে আশঙ্কায় বড় ছেলে নিবৃত্ত হতে বাধ্য হয়, আর ছোটটি ছুটে পালায়।

এমনিভাবে প্রায়ই পালায় ছোটটি। জেঠার বাড়িতে লুকিয়ে থাকা থেকে আরম্ভ করে সে এখন এখানে-ওখানে, এমনকি শহরেও ঘুরে বেড়ায়। মাঝে-মাঝে দু'একদিন বাড়িতেই আসেনা। দৌড়ে জেঠার বাড়িতে যায়, দেখায় যেন সারাক্ষণ সেখানেই ছিল। লক্ষ্য করে দাদার মেজাজ। বড় ছেলে বেরিয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত মা তার অপেক্ষায় থাকে, ভাশুরের বাড়িতে গিয়ে তাকে সেধে সেধে এটা-ওটা খাইয়ে আসে। কিন্তু মা এখন বড় ছেলেকেও কম ভয় করেনা। মাঝে মাঝে সে নিজে তার সঙ্গে মাঠে যায়। তাড়াতাড়ি ফিরে আসে আবার। ছোট ছেলেকে খাওয়ায় তার দাদার আগে, ভাল ভাল জিনিসগুলো তুলে দেয় তার পাতে। সে এমনি ভালবাসে তার এই ছেলেকে! মার ভালো লাগে তার চালচলন, সুন্দর কথাগুলো। ভালো লাগে—তার মসৃণ গোল মুখ—ঠিক তার বাবারই মতো দীর্ঘ, নমনীয় দেহ। পরিশ্রমে বড় ছেলে এরই মধ্যে বেঁকে গেছে। কঠিন, অচঞ্চল তার হাত। কিন্তু এই ছেলেটি ক্ষিপ্রগতি, পিঙ্গল, মসৃণ-চর্ম; মার্জার শিশুর মতো নিঃশব্দ, চঞ্চল তার গতি। মা তাই তাকে ভালবাসে।

বড় ছেলেটি তার ছোট ভায়ের প্রতি মার এ গভীর ভালবাসা অনুভব করে, আর ভাবে। তার মনে পড়ে যায়, প্রতিটি দিনের পরিশ্রমের কথা, মাকে কাজ থেকে অব্যাহতি দেবার কথা। মনে হয়—তার মার মতো নিষ্ঠুর আর কেউ নেই এ দুনিয়ায়। আশৈশব তার জন্য সে যা করেছে তার কোন মর্যাদাই সে দেয়না। ধীরে ধীরে তার মনে বিদ্বেষ গভীরতর হতে থাকে। ক্রমে ক্রমে ভাইকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করলো সে।

॥ চৌদ্দ ॥

কোন অজ্ঞাত উৎস থেকে বেরিয়ে-আসা জলে স্ফীত হয়ে নদী যেমন একদিন বাঁধ ভেঙে ছুটে আসে, আর যারা তাকে বরাবর একইভাবে দেখে আসছে তাদের সকলকে বিস্ময়াপ্লুত করে দেয়, ঠিক তেমনি অতর্কিতে আত্মপ্রকাশ না করলে বড় ছেলের অন্তরে সঞ্চিত এই গভীর বিদ্বেষের কথা মা জানতেই পারতোনা।

গ্রীষ্মের শেষের দিকে, শস্য-সংগ্রহের সময়, যখন কাজের জন্য লোক রাখবার সামর্থ যাদের নেই তাদের সকলকেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে কাজ করতে হয়—সেই সময়কার কথা। প্রায়ই বাইরের কি একটা কাজের কথা ভাবলেও ছোট ছেলেটি সারাদিন মাঠে খেটেছে সেদিন। মা তাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে রেখেছে, গোপনে তার বলিষ্ঠ বাহুতে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছে, ফসল তোলার এই ক'টা দিন মন দিয়ে কাজ কর, বাবা। কাজে তোর দাদাকে যদি সন্তুষ্ট করতে পারিস্ তো কাজ শেষ হলে তোকে একটি সুন্দর জিনিস কিনে দোব—তুই যা চাস্।

তার ঘাড়ে কঠিন কাজ চাপানো হলো ভেবেও ছেলেটি রাজী হলো। খুব ভালো না হলেও সে মোটামুটি বেশ কাজ করলো—তার উপর দাদার চোখ পড়লে অন্ততঃ রেহাই পাবার মতো।

ধানের আঁটিগুলো ঘরে তুলবার আগেই বৃষ্টির আশঙ্কা দেখা গেল। সকলেই কাজ করলো দৈনন্দিন নিয়মের বেশি। মা-ও যতক্ষণ পারলো কাজ করলো। আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্য সেই অন্ধকার রাত্রিতে তিক্ত ওষুধ সেবন করার আগে কখনও সে এমন ক্লান্ত হয়ে পড়তোনা। পিঠটা একবার টানা দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মা বলল, আমি বাড়ি গিয়ে খাবারটা গরম করে নিইগে—তোরা মাঠ থেকে ফিরেই যেন খেতে পারিস্। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—গায়ে ব্যথা ধরে গেছে।

বড় ছেলে মাকে তার নিজের যা খুসী তার বেশি কাজ করতে বলেনা কোনদিন। সে একটু কর্কশভাবেই যেন বলল, তাহলে বাড়ি যাও না! মাঠে দুই ভাইকে রেখে মা বাড়ি ফিরলো। তখন বেলা হয়েছে অনেক, মাঠে যে ধান-কুড়ুনিরা তাদের অনুসরণ করে চলেছিল, তারাও গেছে ফিরে।

সবেমাত্র খাবারটা উনানের উপর তুলে দিয়েছে। মেয়েটি খামার থেকে চিৎকার করে বলল, সে তার ছোট ভায়ের কান্না শুনতে পাচ্ছে। দৌড়ে হেঁসেলের বাইরে এলো মা। সত্যিই তো! সে মাঠের দিকে ছুটলো। দেখলো—বড় ছেলে ছোটটিকে কাটা ধান গাছের উপর ফেলে কাঁচির বাট দিয়ে নির্মমভাবে মারছে, ছোট ছেলে চিৎকার করছে, দু'হাতে আঘাত প্রতিরোধ করে দাদার কবল থেকে ঘাড়টি মুক্ত করবার চেষ্টা করছে

আর বড় ছেলে তাকে বেদম মার দিচ্ছে। মা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলো সেখানে, ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ক্রুদ্ধ জ্যেষ্ঠপুত্রের উপর। অনুনয় করলো, দেখ বাবা, ও এখনও ছোট—ও এখনও ছেলেমানুষ! আগলে ধরে রাখলো ছেলেকে। ছোট ছেলে দাদার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে খরগোসের মতো দ্রুতগতিতে মাঠের উপর দিয়ে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল সন্ধ্যার অন্ধকারে। সেখানে রইলো তারা দু'জনে—মা ও তার ক্রুদ্ধ ছেলেটি। মা ভয়ে ভয়ে বলল, দেখ বাবা, ও এখনও একেবারে ছেলেমানুষ—সবেমাত্র চোদ্দ বছর বয়েস—এখনও খেলায় মতি।

উত্তরে বড় ছেলে বলল, আমি কি চোদ্দ বছর বয়সে ছেলেমানুষ ছিলাম? আমি কি চোদ্দ বছর বয়সের সময় এই ধান-কাটার দিনে খেলে বেড়াতাম—না নিজের উপার্জনের অতিরিক্ত একটি আঙটি, একখানা নতুন জামা কিংবা এটা-ওটা আমায় ঘুষ দিতে হোত তোমার?

মা বুঝলো, চঞ্চল এ বালক মার কাছে যা পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়েছে তারই গর্ব প্রকাশ করেছে দাদার কাছে। তার নিজের দোষ ধরা পড়েছে। তাই মা নির্বাকভাবে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলো বড় ছেলের মুখের দিকে। সে তেমনি তিক্ততার সঙ্গে বলে যেতে লাগলো, তুমিই টাকা রাখ, যা উপার্জন করি সবই তোমায় এনে দিই। নিজের জন্য আমি এক পয়সাও নিইনা কখনও—একটা বিড়ি খেতে, মদ খেতে, কিংবা সকল যুবকই যেমন চায় তেমনি কোন প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে। তবু, আমি যা কোনদিন পাইনি, তুমি তাকে তা' দেবার প্রতিশ্রুতি দাও। কিন্তু কেন? যে-কাজ ওরই করা উচিত, সে-কাজও আমি করি বলে? এ কি তার খাওয়া-পরার দক্ষিণা নাকি?

মা বিব্রতভাবে নীচু সুরে বলল, আমি তো তাকে আঙটি আর জামা দেব বলিনি। শান্ত গম্ভীর প্রকৃতির ছেলের এমন অপ্রত্যাশিত রাগ দেখে মা ভীত, বিচলিত হয়ে পড়লো।

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ছেলে বলল, তুমি বলেছ! তা' যদি নয়—তবে তারও বেশি! সে আমায় বলেছে—ধানের টাকা পাওয়া গেলে খাজানা দেবার পর সে যা চায়, তুমি তাকে তা'ই দেবে। তুমি নাকি তাকে কথা দিয়েছ!

লজ্জিত হয়ে মা বলল, আমি বলেছি—দু'এক পয়সা দামের একটা খেলনা

কিংবা অন্য কিছু দোব।

সে কি তার ছেলে নয়? মা তাই সাহস সঞ্চয় করে বলল, তারপর, আমি যদি তাকে কিছু দেব বলে থাকি, তো বলেছি—তোর-এ রোষ থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যই। সে যা'ই করুকনা কেন, তুই তার উপর সর্বদাই নিষ্ঠুরের মতো আচরণ করিস্—তাকে মারিস্!

আর কিছু বললোনা, ধানের আঁটিগুলোর উপর ঝুঁকে পড়ে দানবের বিক্রমে কাজ করতে লাগলো। মা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো। সে ছোট ছেলের উপর নির্মম আচরণ করেছে। তবু, মা নিজেও যেন একটি ভুল করেছে। মা দেখলো—ছেলের চোখ দুটি অশ্রুসজল হয় উঠেছে, ফোঁপানি বন্ধ করবার জন্য সে চোয়াল চেপে রেখেছে। স্বাভাবিক, তৃপ্ত, আপাত-স্পৃহাশূন্য ছেলের এমনি আবেগ দেখে তাকে তুষ্ট করবার জন্য মা বলে উঠলো, জানি বাবা, আমি ভুল করেছি। তোর জন্য আমি কিছুই করিনি তেমন, লক্ষ্য করিনি কেমন করে তুই মানুষ হলি। এখন দেখছি তুই বড় হয়েছিস, তোর বাবার জায়গা তুই-ই তো দখল করবি। তোর কাছেই থাকবে টাকা-পয়সা—সকল কাজে সবার আগে থাকবে তোর নাম। দেখছি—সাবালক হয়েছিস তুই। এতদিন ধরে যা স্থগিত রেখেছি, এখন ঠিক তা'ই করবো। ঘরে একটি বৌ আনবো তোর জন্যে, এবার হবে তোদের দু'জনের পালা। আগে খেয়াল করিনি, আজ তা বেশ বুঝতে পারছি।

এমনি করে সে তার ভুল সংশোধন করলো। মা শুনতে পেলোনা—বিড় বিড় করে সে কি বলল। তারপর সে পেছন ফিরে কাজ করতে লাগলো। মা একটু স্বস্তি অনুভব করলো। মনোভাব গোপন করে চতুরতার সংগে স্বাভাবিকভাবে বলে গেল, ভাতটা সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল—যাঃ—!

বাড়ি ফিরে শ্রান্তি ভুলে সে টুক্‌টাক্ কাজ করতে লাগলো। মেয়েটি জিগ্যেস করলো, কি হয়েছিল মা? তাড়াতাড়ি মা উত্তর দিল, কিছুনা—তোর দাদা বলল, ভাইটা কাজ করতে চাইছিলনা। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া তো সর্বদাই হয়। মুলো চাকা চাকা করে কেটে তার উপর একটু "ভিনিগার" দিয়ে, তিল-তেল আর খানিকটা চাট্‌নি মেখে সে তাড়তাড়ি ছেলের প্রিয় আর একটা আলাদা তরকারী করলো। কাজ করতে করতে ভাবলো—কী প্রতীকার সে

করতে পারে? মনে হোল, সত্যিই ছেলের বিয়ে দেওয়া দরকার। স্বামীর উপর সে যেমন নির্ভর করতো ছেলের উপর তেমনি করেনি বলে দোষী করলো নিজেকে। আর—সে তো এখনও পুরুষের পুরস্কার পায়নি!

মা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলো—কথা মতো কাজ সে করবে। বড় ছেলে বাড়ি ফিরে এলো আর-আর দিনের চেয়ে দেরীতে। অন্ধকার হয়েছে পুরোপুরি। টেবিলের উপর রাখা মোমবাতির আলোর সামনে না আসা পর্যন্ত সে তার মুখ দেখতে পায়নি। মা ভাল করে দেখলো—ছেলেটি তাকে দেখতে পেলোনা। দেখলো—সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে, সন্তুষ্ট হয়েছে মার কথায়, তার রাগ পড়েছে। তার এ প্রশান্তি দেখে মা ছোট ছেলেটিকে ডাকলো। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হলেও দাদার মেজাজটা লক্ষ্য করে ঘরে ঢুকবার সাহস হলো না তার। মা ডাকল, আয় বাবা!

সে ভিতরে এলো, চোখ রইলো দাদার উপর। বড় ছেলে সেদিকে তাকালোনা। তার রাগ পড়ে গেছে। মা তৃপ্তি বোধ করলো। সে ঠিকই করেছে! স্থির করলো—শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে সে।

সামান্য বিপদের সময়ও সে বড়-জার পরামর্শ নেয়। আজও তাই তার কাছে গেল। কোন মেয়ে জানা নেই মার। সে-পাড়ার কোন মেয়ের সঙ্গেও ছেলের বিয়ে দেওয়া যায়না—সকলেই আত্মীয়, সকলেরই সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ রয়েছে। শহরের কোন মেয়ের সংবাদ সে রাখেনা। শহরে যে-দু'একটি ছোট দোকানে ছোট-খাটো জিনিস বিক্রী করেছে, সে-সব দোকানদারের সঙ্গে সামান্য পরিচয় আছে মাত্র।

তখন সন্ধ্যা। শরতের দেরী নেই আর; তবু গরম ছিল বেশ। ওরা সবাই বসে গল্প করছিল, বড়-জা কোলের ছেলেটিকে স্তন দিচ্ছিল। মা বলল তার বক্তব্য। জিগ্যেস করলো, তোমার বিয়ের আগে তুমি যে-গাঁয়ে থাকতে সেখানে তোমার জানা কোন মেয়ে আছে কি? তোমার মতো ঠান্ডা মেজাজ, স্বাস্থ্যবতী, পরিশ্রমী মেয়েই আমার পছন্দ। আরো কতদিন এ সংসারকে আমায় চালাতে হবে! বৌ যদি ভাল না হয়, পারবো কেন?

মা'র কথা শুনে বড়-জা হাসলো। স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, জানিনা তোমার ছেলে আমার মতো স্ত্রী পাওয়াকে কী মনে করবে,—অভিশাপ না আশীর্বাদ!

ভাশুর ধীরেসুস্থে চাইলো। বসে বসে একটি ধানের খড় চিবোতে চিবোতে সে শুনছিল। একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দিল, ও হ্যাঁ—বেশ—ভালই! স্বামীর এই উৎসাহহীন উক্তিতে আবার হাসলো বড়-জা। বলল, বেশ, আমি একবার গিয়ে দেখে আসতে পারি! সেই গ্রামে প্রায় আড়াইশো ঘর লোক বাস করে, সেটাকে ছোটখাটো একটি শহর বলা যায়। সেখানে বিয়ে দেবার মতো একটি মেয়ে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

এ বিষয়ে তারা আলোচনা করলো। মা খোলাখুলিভাবে বলল, খুব বেশি খরচ করতে পারবোনা। সব রকমে সেরা মেয়ে পাবার আশা আমি করিনি। আমি গরীব মানুষ, আমার ছেলের বেশি জমি-জমা নেই। যেটুকু জমি আছে খাজানা দিতে হয় তার চেয়ে বেশি।

ভাশুর বলল, তোমার তো তবু কিছু জমি আছে। সেটাও কম নয় আজকালকার দিনে। একেবারে কিছুই নেই এমন লোকই তো এখন বেশি। আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হলে আমি নিজে তো যার পয়সা আছে অথচ দাঁড়াবার জায়গা নেই এমন লোকরে চেয়ে যার কিছু জমি আছে অথচ টাকা নেই সেই লোককেই পছন্দ করতাম। ভাল লোক আর ভাল জমি—মেয়ের জন্য এ দুটো জিনিসই—আমি চাইতাম। বড়-জা বলল, তা বেশ। এখন তুমি যদি যেতে দাও, আমি দু'একদিনের জন্য সেখানে গিয়ে খোঁজ করে দেখতে পারি। ভাশুর সহজভাবে বলল, ও হ্যাঁ—স্বচ্ছন্দে। তোমার মেয়েদের এখন বয়েস হয়েছে, ওরা সময় সময় তোমায় ছুটি দিতে পারে।

একটু পরেই বড়-জা ফর্সা পোষাক পরলো। বাপের বাড়িতে দেখাবার জন্য কোলের ছেলেটি আর ছোট দুটি বাচ্চাকে সঙ্গে নিল, আর তাদের সাহায্যের জন্য বড়দের দু'তিনজনকে নিল। একটি তিন চাকার গাড়ি ভাড়া করে বাচ্চাদের তা'তে উঠালো, নিজে চড়লো তার স্বামীর ধুসর গাধাটার উপর। এখন ধান-কাটা শেষ হয়ে গেছে, গাধাটার দরকার হয়না আর, ধান ছাড়াতে ষাঁড়টিকে ব্যবহার করলেই চলে। এমনি করে যাত্রা করে তারা কাটালো তিনদিন, কি তারও বেশি। তারপর ফিরে এলো—সেখানে যত মেয়ে দেখেছে সকলের খবর নিয়ে। বড়-জা ফিরে এসেছে শুনে মা ছুটে এলো। বড়-জা মাকে বলল, সেই গ্রামে কুমারীর সংখ্যা অনেক। নবজাত শিশু মেয়ে হলে যেমন

কোন-কোন শহরে তাকে মেরে ফেলা হয়, ওখানে তেমন হয়না। অনেকেরই মেয়ে আছে। গ্রামটি তাই কুমারীতে ভর্তি। আমি নিজে তো আমার পরিচিত ডজন-খানেক দেখেছি—সকলেই সুস্থ, সুগঠিত, প্রত্যেকেরই গায়ের রং ভালো। আমার মতে, তাদের যে-কোনটি তোমার ছেলের উপযুক্ত হবে। তবে, আমাদের দরকার তো সুধু একটির। চোখ দুটি গুটিয়ে বেশ ভাল করে দেখে নিয়ে তার ভেতর থেকে তিনটিকে আমি পছন্দ করেছিলাম। দেখলাম, তিনজনের মধ্যে একটির কাশি আছে, নাকটিও খাদা, আর একটির চোখের ব্যামো আছে, তৃতীয়টি একেবারে নিখুঁত—খুব চালাক-চতুর, কথায় ও কাজে বেশ সংযত। সবাই বলে, সারা শহরে সে-ই হচ্ছে সব চেয়ে বেশি কাজের। তাদের বাড়ির সব জামা সে নিজে তৈরী করে, অপরকেও তৈরী করে দিয়ে কিছু আয় করে। তোমার ছেলের চেয়ে ওর বয়স সামান্য একটু বেশি হবে। একবার মেয়েটির বিয়ের কথাবার্তা সব ঠিক হয়েছিল, কিন্তু ভাবী স্বামী হঠাৎ মারা যায়। নইলে এতদিনে তার বিয়ে হয়ে যেতো। এটা দোষের কিছু নয়। তার বাবা মেয়েটির বিয়ে দিতে উৎসুক, বিশেষ দাবী-ও নেই। অপর দুটির মতো এ মেয়েটি তেমন সুন্দরী নয়, অতিরিক্ত সেলাই কাজ করে একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখখানি, কিন্তু চোখ দুটি খুবই সুন্দর, পরিষ্কার। মা তৎক্ষণাৎ বলল, আমাদের বাড়ির সবারই চোখের অসুখ। আমার নিজের চোখও এখন আগের মতো নেই। আমাদের দরকার—এমন একটি মেয়ে—যে সেলাই জানে, পছন্দ-ও করে। তা' দিদি, সেই মেয়েটির সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে ফেল। মেয়েটি আমার ছেলের চেয়ে পাঁচ বছরের বেশি বড় না হলেই হলো।

তা-ই করা হলো। এক বুড়ো গণকের টেবিলের উপর দু'জনের জন্মলগ্ন, দিন, মাস ও বছর বিচার করা হলো। সবই ভাল দেখা গেল। বরের লগ্ন চিহ্ন অশ্ব আর মেয়ের মার্জার—এরা একে অপরের বৈরী নয়। তাই বলা হোল—বিবাহে যোটকের মিল হয়েছে। সবই আকস্মিকভাবে ঠিক হলো। আশীর্বাদী যা দেবার দেওয়া হলো।

মা তার গোপন ভাণ্ডার থেকে কিছু রুপোর টাকা ও তামার পয়সা নিয়ে ভালো সুতোর কাপড় কিনে নিজেই তৈরী করলো কনের দুটি পোষাক।

দেশের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সে জামাগুলো কোন সৌভাগ্যবতী, স্বামী-পুত্রবতী গৃহিণীকে দিয়ে কাটাবার ইচ্ছা করলো। বড়-জার চেয়ে সৌভাগ্যশালিনী মহিলা কে আর আছে? কাপড়টি নিয়ে সে তার কাছে গেল। বলল, তোমার হাতখানি এটাতে একটু লাগাও—যেন আমার ছেলের বৌ তোমার মতো ভাগ্যবতী হয়।

বড়-জা তা-ই করলো। মা পোষাকটি পেটের দিকটায় একটু চওড়া করে কাটলো—বৌ গর্ভবতী হলেও সহজে পরতে পারবে, অনর্থক ফেলে রাখতে হবে না।

মা আর কয়েকটি টাকা নিয়ে ভাড়া করে আনলো লাল বিয়ের চেয়ার, মালার মুকুট, নকল মুক্তোর ইয়ারিং—বিয়ের দিনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম—বিশেষ করে,—সে-অঞ্চলে প্রত্যেক কনেকেই যেমন পরতে হয় তেমনি লাল পাজামা। বিয়ের দিন স্থির হলো। অবশেষে এল শীতের নির্মল শীতল প্রভাত।

মার পক্ষে এই দিনটি অভিনব। আজ একটি নবীনা তরুণীকে বরণ করে নিতে হবে সেই গৃহে—যেখানে এতদিন সে-ই ছিল কর্তা ও গৃহিনী দুই-ই। ভালো পোষাক পরে সে দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষায়। কনেকে নিয়ে বিয়ের লাল চেয়ারখানি সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। অতর্কিতে তার মনে হলো—কিছুক্ষণ আগে সে নিজেই সেই চেয়ারে বসে এসেছে—যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে দাঁড়িয়েছে মৃতা বৃদ্ধা, আর তার ছেলের জায়গায় রয়েছে তারই স্বামী। আজকাল সে ক্বচিৎ স্বামীর কথা ভাবে, তাকে সত্যিই মৃত মনে হয় তার। কিন্তু সেখানে অপেক্ষা করতে করতে তার মনে জেগে উঠলো—বিচিত্র এক লালসা। এ দেহের লালসা নয়, আজ তা' মরে গেছে—এ লালসা তার নিজের জীবনের সম্পূর্ণতারই লালসা! সে নিজেকে সম্পূর্ণ একা মনে করলো।

মা নতুন করে দেখলো তার ছেলেকে। সে তার ছেলে নয় সুধু, আজ সে একজনের স্বামী। ঘাড় নিচু করে কালো পোষাকটি পরে ওই সে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তার পায়ের জুতো জোড়া প্রায় খোলা। কালো পোষাকের নিচে তার হাত দুখানি কাঁপতে না দেখা পর্যন্ত মার মনে হচ্ছিল সে

অবিচলিতই আছে। আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। স্বামীকে মনে পড়লো আবার। মনে পড়লো—চেয়ারের পর্দার ভিতর থেকে উঁকি মেরে সে কেমন করে দেখেছিল স্বামীকে, সুন্দর-কান্তি এমনি রূপবান লোকটিকে দেখে কেমন আনন্দে দুলে উঠেছিল তার মনখানি! হ্যাঁ, আজকে তার এই ছেলের চেয়ে অনেক সুন্দর ছিল তার স্বামী। মনে হলো—যত লোক সে দেখেছে তাদের সকলের চেয়ে সে লাবণ্যময় ছিল।

এমনি করে মনে আরও বেশি ব্যথা বোধ করবার আগেই শোভাযাত্রার প্রথম দল এলো। বিয়ের ছোট্ট ফলের ঝাঁকা এলো; যে-মোরগটি সে কনের বাড়ি পাঠিয়েছিল আর সেখানকার রীতি অনুসারে তারা যার জুড়ি মিলিয়ে একটি মুরগীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে, সেটিও এলো। তারপরে কনে চেয়ারখানি এনে দরজার সামনে রাখা হোল। বড়-জা, সেই বিধবাটি আর পাড়ার অন্যান্য বয়স্কা স্ত্রীলোকেরা কনের হাত ধরে টেনে বার করবার চেষ্টা করলো। কনে নিজেই বেরিয়ে এলো অনিচ্ছাস্বত্ত্বে। চোখ দুটো নিচু করে রইলো, কারো পানে তাকালোনা একবারও। মা চলে গেল ভাশুরের বাড়ি। সেখানকার নিয়ম—পুত্রবধূকে সহজে তার শাশুড়ীকে দেখতে দেওয়া হয়না; তাহলে নাকি পরে পুত্রবধূ শাশুড়ীকে ভয় করেনা। মা সারাদিন বড়-জার বাড়িতে রইলো। কিন্তু নতুন বৌ সম্বন্ধে লোকে কি বলে শোনবার জন্য সে দরজার কাছেই রইলো। একজন বলল, খুব ভালো দেখতে, সুন্দরী! আর একজন বলল, সবাই বলে, ও ভাল সেলাই জানে। তা যদি হয়, তার পায়ের জুতো জোড়াটিও নিশ্চয় সে নিজেই তৈরী করেছে। তার দশটি আঙুলই চমৎকার—

স্ত্রীলোকদের কেউ-কেউ বিয়ের লাল জামাগুলো হাতে নিয়ে দেখলো। নিখুঁত-ভাবে সেগুলো তৈরী। দৌড়ে মার কাছে গিয়ে তারা বলল, খুব স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী বৌ হয়েছে তোমার! কিন্তু পুরুষদের মধ্যে ক'জন বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করলো। একজন বলল, অত্যন্ত রোগা ও হলদে, আমার পছন্দ হয়না। আর একজন বলে উঠলো, কয়েকমাসের মধ্যেই ভাই, এই কৃশতা চলে যাবে, কুমারীকে মোটা করতে পুরুষের মতো আর কিছু নেই!

এমনি সব আনন্দজনক ও অশ্লীল মন্তব্যের মধ্যে কনে বিনীতভাবে চললো তার নতুন গৃহে। বিয়ে হলো তার।

এবার মাকে ছাড়তে হবে সেই শয্যা যেখানে সে এতকাল ঘুমিয়েছে। সেখানকার নিয়ম-মত সেই রাত্রিতেই পুত্রবধূ যখন মার বিছানা করতে এলো, তখনই মা তার নিজের শয্যা নিয়ে গেল মশারীর পেছনে—যেখানে ঘুমাতো তার শাশুড়ী আর, তার পরে বড় ছেলেটি। মার পাশে রইলো তার অন্ধ মেয়েটির শয্যা। বাড়িতে থাকলে ছোট ছেলেটি হেঁসেলেই ঘুমোয়।

নবোঢ়া পত্নীর সঙ্গে তার বড় ছেলে ঘুমালো—সত্যিকারের সেই শয্যায় নব-দম্পতীকে তার নিজের ও স্বামীর স্থানটি ছেড়ে দেওয়া মার পক্ষে সহজ হলোনা। সেই রাত্রিতে বৃদ্ধার শয্যায় শুয়ে শুয়ে মার মনে হলো সে যেন জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। দিনে কর্মব্যস্ততায়, সকলের উপর খবরদারী করে, শাসন করে, ভুল শুধরে দিয়ে, সে স্বাভাবিক থাকে; কিন্তু রাত্রিতে সে বৃদ্ধ হয়ে যায়, প্রায়ই ঘুম থেকে জেগে ওঠে। মনে হয়, এ হতেই পারেনা—সে এখানে শুয়ে আছে আর বিছানায় রয়েছে এক দম্পতী! বিস্মিত হয়ে ভাবে, আমি যখন এ বাড়িতে আসি তখন যে মা ছিল, সেও হয়তো আমারই মতো এমনি অনুভব করেছিল। কনের বেশে এসে আমি তাকে তার শয্যা থেকে নামিয়ে দিয়েছিলাম, নিজে সেখানে তারই ছেলের সঙ্গে শুয়েছিলাম; আর আজ—আমারই ছেলের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে আর একজন। এই অদৃশ্য রথচক্রের আবর্তন, এই অনন্ত শৃঙ্খলের একটি গ্রন্থির সঙ্গে অপরটির সম্বন্ধ এমনি বিচিত্র, এমনই সীমাহীন মনে হয় যে ভাবতে ভাবতে সে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। সে ভাবেনা—সামনে যা হচ্ছে, কী তার মানে। সকল ঘটনাকে সে তাদের প্রকৃত রূপে গ্রহণ করে। সেদিন থেকে নিজের কাছেও তার দাম কমে গেছে। সুধু নামে—সে সকলের বয়োজ্যেষ্ঠা, সকলের কর্ত্রী-স্থানীয়া নিজের কাছে সে যেন সবার আগে নয়!

মা দেখে—তার এই পুত্রবধূটিকে। বধূ কর্তব্যপরায়ণা। দিনের পর দিন সে তার শাশুড়ীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। মা শ্রান্ত হয়ে বলে, যথেষ্ট হয়েছে!—তার কোন দোষই আবিষ্কার করতে পারেনা। এই নির্দোষিতাই তার একটি দোষ। মনে মনে মা বলে, নিশ্চয় এর কোন গোপন ত্রুটি রয়েছে যা আপাতদৃষ্টিতে আমার চোখে পড়ছেনা।

কতগুলো মেয়ে যেমন সহজে অভ্যাস ছাড়ে তেমনি পুত্রবধূ তার পুরানো

সকল অভ্যাস একসঙ্গে ছাড়লোনা। পরিশ্রমী সে; সহজেই, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ সেরে নেয়। কাজ শেষ হলে স্বামীর জন্য কিছু সেলাই করে। কিন্তু সে যা করে সবই করে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে।

কোন একটি কাজ একই নিয়মে করে এমন দু'জন স্ত্রীলোক পৃথিবীতে পাওয়া যায়না—মা জানেনা একথা। সে জানে—সে যেমন করে, সকলে তেমনিই করে। পুত্রবধূটির কাজে তার একটা নিজস্ব ধারা আছে। ভাত রান্না করার সময় সে হাঁড়িতে একটু বেশি জল দেয়—অন্ততঃ, মা হয়তো তাই মনে করে। ভাতটা মা যেমন খেতে পছন্দ করে তার চেয়ে একটু নরম হয়ে যায়। মা বৌকে বলে একথা। সে তার মলিন ঠোঁট দুটো বন্ধ করে বলে—কিন্তু আমি তো চিরদিন এমনিই করে আসছি!

পরিবর্তন হয়না তার। প্রত্যেকটি কাজই এমনি। বেশ ধীরে-সুস্থে, সতর্কতার সঙ্গে ঘরের এটা-ওটা সে নিজের পছন্দমত গুছিয়ে নিল। রাত্রিতে ঘরের মধ্যে পশুর গন্ধ তার সহ্য হয়না। এ সম্বন্ধে শাশুড়ীকে না বলে স্বামীকে জানালো। তার স্বামী একটি ঘর তৈরী করতে লাগলো যেন তারা দু'জনে সুখে ঘুমোতে পারে। মা এসব নতুন চালচলন দেখে অবাক হয়ে যায়।

অন্ধ মেয়েকে মা বলেছিল—সে পুত্রবধূর উপর রাগ করবেনা। তাছাড়া, এত শিগ্‌গির রাগ করাও তো সহজ নয়। তরুণী বধূ সাবধানতার সঙ্গে ঘরের কাজ করে। তাই বলা কঠিন—এটা ভুল হয়েছে কিংবা এ কাজটি তুমি ঠিক করনি। তবু, মার পছন্দ হয়না অনেক কিছুই। নরম ভাত সে পছন্দ করেনা—এ সম্বন্ধে প্রায়ই অনুযোগ করে, মা। শেষে একদিন একটু মেজাজ দেখিয়ে বলল, এমনি নরম ভাত খেয়ে আমার কোনদিনই পেট ভরেনা। এই জলের মতো ভাত—চিবোবার কিছুই নেই—হাওয়ার মতো পেট ভর্তি করে দেয়, গোলার ধানের ভাতের মতো মনেই হয়না! পুত্রবধূ তার কথায় কর্ণপাত করলোনা। তাই, সেদিন সে গোপনে ছেলের কাছে গেল মাঠে, যেখানে সে কাজ করছিল। বলল, দেখ্ বাবা, বৌমাকে বলিস্ না কেন—ভাতটা আর একটু শুকনো আর শক্ত করে রাঁধতে? আমার তো মনে আছে—তুইও ওরকম ভাতই পছন্দ করতিস্।

কাজ থামিয়ে মুহূর্তেক তার নিড়ানীর উপর ভর দিয়ে ছেলে শান্ত-ভাবে বলল, ও যেমন রান্না করে আমি তেমনিই পছন্দ করি।

মা অনুভব করলো—তার অন্তরে রাগ বাড়ছে। বলল, তেমন পছন্দ করতিস্‌না তুই। এর মানে—তুই আমায় ছেড়ে ওর সঙ্গে যোগ দিয়েছিস্‌। ওকে তোর এত পছন্দ হয়েছে যে তুই তোর মার বিরুদ্ধে যাচ্ছিস্‌—ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—

লাল হয়ে উঠলো যুবকের মুখ। সে সুধু বলল, হ্যাঁ, আমি ওকে খুব পছন্দ করি। সে আবার নিড়ানী নিয়ে কাজ আরম্ভ করলো।

সেদিন থেকে মা বুঝলো—ওরা দু'জনেই এখন ঘরের কর্তা ও কর্ত্রী। ছেলে আগের মতো দয়ালুই আছে। যোগ্যতার সঙ্গে সে তার কাজ করে, নিজের হাতে টাকাটা নেয়। অবশ্যি, সে কিংবা তার স্ত্রীর—দু'জনের কেউই টাকা খরচ করেনা, দু'জনেই সঞ্চয়ী। কিন্তু তারা স্বামী ও স্ত্রী—বাড়ি ও জমি তাদেরই। মা বাড়ির "বৃদ্ধা স্ত্রীলোক" মাত্র। মা তার চিরপরিচিত মাঠ, বীজ কিংবা মাঠের অন্য কোন কাজের কথা বলে যায়। তারা তাকে বাধা দেয়না। কিন্তু নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে—যেন সে কিছুই বলেনি। মার মনে হয়, সে আজ আর কিছু নয়—যে-গৃহ তার নিজেরই ছিল, আজ সেখানে সে নিষ্প্রয়োজন, মূল্যহীন!

এ কি বরদাস্ত করা যায়?

একটি নতুন ঘর তৈরী হলো। স্বামী-স্ত্রী দুজনে চলে গেল সেই ঘরে। মা তার অন্ধ মেয়ের কানে কানে বলল, এমন বাড়াবাড়ি আমি কখনও দেখিনি, পশুর গায়ের গন্ধ যেন বিষ! আমি দিব্যি করে বলতে পারি, ওরা ঘর তৈরী করেছে—শুধু আমাদের কাছ থেকে সরে থেকে গোপন পরামর্শ করবার জন্য যেন আমরা তা'—শুনি। আমায় কোন কথাই বলেনা ওরা। পশু-টশু কিছু নয়, তোর দাদা ওকে বেহায়ার মতো ভালবাসে। আমি জানি—ওরা তোদের কথা একবারও ভাবেনা। এমনকি—আমার কথাওনা। মেয়েকে নিরুত্তর দেখে সে বলল, তুই-ও কি তা মনে করিসনে, মা? আমার কথা কি সত্যি নয়? ইতস্ততঃ করে মেয়েটি। একটু পরে অন্ধকারের ভিতর থেকে বলল, হ্যাঁ মা, আমার একটা কথা বলবার আছে, কিন্তু তোমায় বলিনি, পাছে তোমার মনে কষ্ট হয়।

মা বলল, তা বল্, মা। মনে হয় আমি দুঃখ সইতে অভ্যস্ত।
মেয়ে বেদনাপ্লুতকণ্ঠে মাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি অন্ধ মা, আমায় নিয়ে তুমি কি করবে?
মা কোনদিন মুহূর্তের জন্যও ভাবেনি—মেয়ে তার কাছে ছাড়া আর কোথাও থাকবে। অবাক হয়ে শুধাল, একি বলছিস্ তুই, মা!
মেয়ে বলল, বলছিনা, বৌদির দয়া-মায়া নেই। সে নিষ্ঠুর নয় মা; কিন্তু ও বোধ হয় স্বপ্নেও কল্পনা করেনা—তুমি শিগ্গির আমার বিয়ে দিচ্ছনা। সেদিন দাদাকে জিগ্যেস করতে শুনেছি—কোথায় আমার বিয়ের ঠিক হয়েছে। কোথাও হয়নি জেনে আশ্চর্য হয়ে বলেছে, এত বড় মেয়ের শাশুড়ী হলোনা এখনও?
মা বলল, তুই যে অন্ধ, মা; অন্ধ মেয়ের বিয়ে দেওয়া তো সহজ নয়! শান্ত-কণ্ঠে সে বলল, জানি, মা। তারপর উষ্ণ নিশ্বাস ফেলে শুষ্ককণ্ঠে বলল, কিন্তু, তুমি তো জান, মা, আমি অনেক কাজই করতে পারি। কত গরীব লোক—হয়তো কোন বিপত্নীক কিংবা তেমনি কোন নিঃস্ব ব্যক্তি—আমি যেটুকু কাজ করতে পারি, বিনি পয়সায় সে-কাজটা পেয়ে খুসী হবে। তখন আমি আমার নিজের ঘরে থাকতে পারবো। তোমার মৃত্যুর পর সেবা করবার একটি লোক পাবো আমি। আমার মনে হয়না, মা, বৌদি আমায় চায়।
উত্তেজিতভাবে মা বলল, তা'বলে তোকে যে-কোন লোকের ঘর করতে পাঠাতে পারিনা! জানি—আমরা গরীব, তবু, তোকে খাওয়াতে পারি। আমি জানি—বিপত্নীকেরা প্রায়ই নিষ্ঠুর ও অতিরিক্ত কামুক হয়ে থাকে। এখন ঘুমোগে। ও কথা আর ভাবিস্নি। আমার স্বাস্থ্য এখনও বেশ ভালই আছে, আরও অনেকদিন বাঁচবো। তোর দাদাও কোনদিন তোর উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করেনি—সে যখন শিশু ছিল তখনও করেনি।
দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েটি বলল, তখন তার বিয়ে হয়নি! সে নীরব রইল তারপর—যেন ঘুমাচ্ছে।
মা রোজ অঘোরে ঘুমোয়। আজ এক মুহূর্তও ঘুমোতে পারলোনা। শুয়ে শুয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো। বিগত দিনগুলো এক-একটি করে মিলিয়ে দেখতে লাগলো—মেয়েটির কথা সত্যি কিনা! একটি কথাও মনে

করতে পারলোনা। তবু, মনে হলো—তার বৌমা সহানুভূতিশীলা নয়, সে তার ছোট ছেলেটির উপরও খুব বেশি সদয় নয়, স্বামীর অন্ধ বোনটির উপরও এতটুকু সহানুভূতি নেই তার।
মাকে এই নতুন মনোবেদনা-ও সইতে হবে!

॥ পনের ॥

মা রোজই লক্ষ্য করে—তার মেয়ের উক্তি সত্যি কিনা। দেখে—ঠিকই বলেছে সে। তরুণী পুত্রবধূটি রূঢ় নয়। মোলায়েমভাবে, শিষ্টাচারের সঙ্গে সে কথা বলে; কিন্তু মেয়েটির সঙ্গে নানা কারসাজি করে, মার মনে হয়—তার অন্ধ মেয়েটিকে সে পেট ভরে খেতে দেয়না, ভাল কিছু রান্না করলে তাকে দেয়না। অন্ধ মেয়েটি দেখতে পায়না, তাই জানতেও পারেনা। মার দৃষ্টি যদি তীক্ষ্ন না হোত, আর সে মেয়েকে জিগ্যেস না করতো,—শুয়োরের কলিজার "সুপ্" হয়েছে আজ, তুই খাবিনা? তা'হলে সত্যিই সেদিন যে-যার নিজের খাওয়ার ব্যস্ততায় ব্যাপারটা কেউ টেরই পেতোনা।
মার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে মেয়ে শান্তভাবে জবাব দিল, আমি তো জানিনা, সে তো আমি খুব ভালবাসি! মা তার কাছে গিয়ে পুত্রবধূর সামনেই চামচ কেটে কিছু মাংস ও "সুপ্" মেয়ের পাতে তুলে দিল। তখন পুত্রবধূ তার পুরু ঠোঁট দুটি একটু নেড়ে সহজভাবে, সৌজন্যের সঙ্গে বলল, আমার ভুল হয়ে গেছে মা, আমার খেয়ালই ছিলনা ওর তরকারী ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু মা বুঝলো—সে মিথ্যে বলছে।
বাড়ির সকলের জন্য জুতো তৈরী করা পুত্রবধূরই কর্তব্য। তবু, সে মেয়েটির জন্য জুতো সেলাই করতে বসে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এতটুকু সময়ও ব্যয় করলোনা। জুতোর তলাটি পাতলা করলো, সামনে ফুল তোলার পরিশ্রমটা এড়িয়ে গেল। তাই দেখে মা বলল, আমার মেয়ের জুতোয় তোমাদের আর সকলের জুতোর মতো ফুল গেল কোথায়?
পুত্রবধূ তখন তার ছোট কালো ফ্যাকাশে চোখ দুটো মেলে বলল, যদি বল

তো করে দিচ্ছি, মা। আমি ভেবেছিলাম, ও অন্ধ, দেখাতে পাবেনা—এছাড়া, এতগুলো লোকের জুতো করতে হয় আমার! তোমার ছোট ছেলেটি তো খেলবার জন্য শহরে ছুটে-ছুটে ফি-মাসেই একজোড়া করে জুতো ছিঁড়ছে। উঠানে বসে রোদ পোহাচ্ছিল অন্ধ মেয়ে। ছোট ভায়ের বিরুদ্ধে এই নালিশ শুনে একটু ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই সে বলল, বৌদি ঠিকই বলেছে, সত্যিই আমার ফুলের দরকার নেই। অন্ধের কাছে আবার ফুল কি?

এ তাই কলহ মনে হলোনা। এমনি আরো সব ছোট-খাটো ব্যাপার ঝগড়ার মতো বোধ হয়না। তবু, সেদিন মা শুয়োরের গর্তটার মধ্যে খাবার দিতে গেছে এমন সময় বড় ছেলে এলো মার কাছে। বলল, আমার একটি কথা বলবার আছে, মা। কথাটি—বোনটিকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া বা তাকে কোন জিনিস থেকে বঞ্চিত করা নয়। তবে, নিজের কথা তো মানুষের চিন্তা করা উচিত! বোনটির এখনও বেশি বয়স হয়নি, সামনে পড়ে আছে তার সারাটি জীবন। আমি কি আজীবন তাকে খাওয়াবো? আমি তো কোথাও শুনিনি—খাওয়ার অভাবে নেই এমন ধনী লোক ছাড়া কেউ তার বোনকে এমনি করে খাইয়েছে! পুরুষের কর্তব্য—নিজের মা-বাবা, স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণ করা। কিন্তু বোনের বয়স এখনও অল্প, আমি যতদিন বাঁচি ততদিন সে বাঁচবেই। বিয়ে না হলে তার নিজেরও খারাপ হবে। স্ত্রীলোক মাত্রেরই বিয়ে হওয়া ভালো।

মা ছেলেটির পানে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করলো। তাকে অভিযুক্ত করলো, তোর বৌ-ই তোর মনে-এ চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে! ওখানে—ওই ঘরে—তুই একা তার সঙ্গে থাকিস্, দুজনে পরামর্শ করিস্। রাত্রিতে সে তোকে যা বলে তাতে নিজের লোকের উপর তোর মন বিষিয়ে যায়। আর আর পুরুষের মতো স্ত্রীলোকের সঙ্গে এক শয্যায় শুয়ে তুই গর্তের মাটির মতো নরম হয়ে যাস্। গভীর দুঃখের সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে গর্তের মধ্যে খাবারটা ছুঁড়ে দিয়ে সে দাঁড়িয়ে দেখলো—শূকরটি কেমন লুফে নিল খাবারটা। কোন পশুকে প্রাণভরে খেতে দেখলে সে আনন্দ অনুভব করে, কিন্তু আজ সে যেন দেখতে পেলোনা এই দৃশ্য। বেদনার্তকণ্ঠে বলল, কে নেবে তোর বোনকে? কোন দীনতম লোক, যার বৌ পালিয়েছে কিংবা সুস্থ মেয়েকে বিয়ে করবার মতো

যার সামর্থ নেই—এমন লোক ছাড়া অন্য কারুকে কি আমরা তার জন্যে আশা করতে পারি?

ছেলে সংগে সংগে উত্তর দিল, আমিও ভাবি তার কথা। ভাবি, তার নিজের একটি লোক থাকা দরকার—যদিও সুস্থ থাকলে যেমন পাওয়া যেতো তেমন লোক তার জন্য জুটবেনা। অধিকতর বেদনার সংগে মা বলল, এ-ও তোর বৌ—ওরই কথা।

কিন্তু ছেলে দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল, এ বিষয়ে আমরা দুজনে একমত। মা বলল, আমি তো দেখছি সব বিষয়েই! ভয় হয়!—

বৃথা বাক্যব্যয় না করে ছেলে তেমনিভাবে মাঠে চলে গেল। তবু, মা অনেক-দিন পর্যন্ত মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধের কোন চেষ্টা করলোনা। সে নিজেকে, মেয়েকে, ছোট ছেলেকে, বড়-জাকে, আর যারা তার কথা শোনে তাদের সকলকে, বলল—তেমন বয়স না হলেও সে ইচ্ছামত চলতে পারেনা, বাড়িতে স্থান তার নেই, তাকে শিশুর মতো হুকুম করা হয়—এটা-ওটা কিংবা যা সে করতে চায়না তা করতে! এই ব্যাপারে সে ছেলের ও ছেলের বৌ-এর বিরুদ্ধে লাগলো। মেয়েকে সে চোখে-চোখে রাখতে লাগলো যেন কেউ তার কোন অনিষ্ট করতে না পারে, আর সবাই যা পায় তা থেকে সে বঞ্চিত না হয়!

কিন্তু আরো অভ্যস্ত হবার সংগে সংগে পুত্রবধূর কথাবার্তা আরও পরিষ্কার, অভিযোগপূর্ণ হলো, সৌজন্য রইলোনা আর। মেয়েরা যখন কারো ঘরের দরজায় রোদে বসে গল্প করে অথবা একসংগে সেলাই করে, কিংবা যখন স্ত্রীলোকদের প্রিয় কোন জটলা হয়, তখন সে প্রায়ই সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, আমার নিজের ছেলেপিলে জন্মালে কেমন করে সেলাই করবো জানিনা! মা'র বয়েস হয়েছে; জানি, তাঁর দেখাশোনা করা আমারই কর্তব্য। তাঁর হাত পা, চোখ সবই হওয়া উচিত আমারই। এ শিক্ষাই আমি পেয়েছি, আর করিও তাই। আমার বিশ্বাস, আমার কর্তব্য সম্বন্ধে আমি সর্বদাই সজাগ। সেই ক্ষুধার্ত দ্বিতীয় ছেলেটি রয়েছে—কোন কাজই করেনা। মার চেয়ে ওর চিন্তাটাই হয়েছে বেশি! একদিন অবশ্যি সে বিয়ে করবে, আর তার স্ত্রীই তাকে রোজগার করে খাওয়াবে। আর এই অন্ধ আইবুড়ো মেয়ে! মা

তার বিয়ে দেবেনা। জানিনা, সারাটি জীবন আমারই গলগ্রহ হয়ে থাকবে কিনা।

এমনি সব কথা সে বলে, আর সকলেই তা উপভোগ করে। অন্ধ মেয়েটি কাছে থাকলে শ্রোত্রীরা তার দিকে এমন কটাক্ষপাত করে যে সেও তাদের দৃষ্টি অনুভব করে। গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকার লজ্জায় সে মাথা নীচু করে। কেউবা কখনও বলে, অন্ধ তো পৃথিবীতে অনেক রয়েছে। কোন কোন পরিবারে অন্ধ মেয়েকে ভবিষ্যদ্বাণী করা—কিংবা এমন কোন কাজ—শেখানো হয় যেন সে মাঝে মাঝে কিছু আয় করতে পারে। প্রায়ই অন্ধদের একটা দিব্যদৃষ্টি দেখা যায়; আমরা যা দেখিনা, তাই তারা দেখে—আর, এই দৃষ্টি শক্তির অভাব যেন তাদের একটা শক্তি—যার জন্য লোকে তাদের ভয় করে। এই মেয়েটিকে ভবিষ্যদ্বাণী করা, নয় ত—অন্য কোন একটা কাজ শেখালেই তো হয়।

আবার কেউ বলে, এমন গরীব পরিবারও তো রয়েছে—যাদের ছেলে আছে অথচ বিয়ে দেবার পয়সার অভাব। একেবারে না পাওয়ার চেয়ে বিনি পয়সায় পাওয়া গেলে বোকা, আঁধা, খোঁড়া কিংবা বোবা মেয়েকেও তারা স্বচ্ছন্দে ছেলের জন্য নেবে। তখন অতৃপ্তভাবে পুত্রবধূ বলে, আমি যদি তেমন কাউকে জানতুম! আচ্ছা, দেখো, যদি তেমন কোন খবর পাও তো দয়া করে আমায় জানিয়ো। কৃপা করে তারা তাকে প্রতিশ্রুতি দেয়, স্বীকার করে—এই অর্থাভাবের দিনে, এই দুঃসময়ে একটি অপর লোককে খাওয়ানো কঠিন। সেদিন প্রগল্‌ভা বিধবাটি মার কাছে এসে বলল, তোমার অন্ধ মেয়েটির বিয়ে দিতে চাও যদি—আমি উত্তরের পাহাড়ে একটি পরিবারকে জানি। তাদের সতের বছরের একটি ছেলে আছে। দুর্ভিক্ষের সময়ে উত্তরপ্রদেশ ছেড়ে এখানে এসে পাহাড়ের গায়ে—অবশ্যি একটু উঁচু জায়গায়, তারা বসতি স্থাপন করে। কিছুদিন পরে আসে তার এক ভাই। এখন সেখানেই তারা বাস করছে। সেখানকার জমি উর্বর নয়, তাই তারা গরীব; কিন্তু বৌ, তুমিও তো গরীব। তোমার মেয়ে অন্ধ। আমায় যদি যাতায়াতের খরচটা দাও তো একবার তোমার খাতিরে সেখানে গিয়ে দেখতে পারি। আর, অনেক-দিন ধরে ইচ্ছে করেছি—বাপের ভিটেটা একবার দেখে আসবো। কিন্তু

দেওরের কাছে হাত পাতবার প্রবৃত্তি হয়না। বিধবা হয়ে পরের বাড়িতে থাকা কী যে কষ্টকর!

মা তখন গ্রাহ্য করলোনা তার কথা। উচ্চকণ্ঠে বলল, আমার অন্ধ মেয়েটিকে আমি চালাতে পারি।

পরে সে কথাটি বললো বড়-জাকে, এমনকি ভাশুরকে। মুহূর্তেক গম্ভীর থেকে—ভাশুর বলল, তুমি যদি চিরকাল বেঁচে থাকতে, তা'হলে এমনি করে তার ভরণপোষণ চালাতে পারতে। কিন্তু তুমি যখন মারা যাবে, আর ধর—আমরাও মারা যাবো কিংবা আরো বুড়ো হবো—ছেলেদের কাছে সুধু নামে মাত্র কর্তা হয়ে থাকবো, তখন কে চালাবে তাকে? সুধু তা'ই নয়। যদি এমন দুর্বছর কখনও আসে যখন মা-বাপকে সুধু নিজেদের সন্তানের কথাই আগে ভাবতে হয়—আর, তুমি তখন বেঁচে না থাক?

নীরব হয়ে গেল মা। কিন্তু পরক্ষণে এই সত্য আবিষ্কার করলো—সে চিরকাল বাঁচতে পারেনা, তার জীবনের সমাপ্তি ঘটবেই। তার খুব বেশি দেরীও নেই হয়তো—কারণ, সেই কাল রাত্রি থেকে দেহের হারানো শক্তি সে ফিরে পায়নি।

সেবার গ্রীষ্মে হাওয়া থেকে বেরিয়ে এলো এক পেটের অসুখ, আর সেই রোগে তাকে ধরলো। চিরদিন সে খেতে ভালবাসে, প্রাণভরে খেতে চায় সবটুকু নিঃশেষ করে। কিন্তু সেই বছর অস্বাভাবিক গরম পড়লো। মাছির উপদ্রব আরম্ভ হলো। সর্বত্রই এত বেশি মাছি বেরোল যে হাওয়ায় ভেসে এসে খাবারের উপর পড়ে খাবারের সঙ্গে মিশে যেতে লাগলো। মা বলল, অবশেষে, মাছি আসে—আসুক্, ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে, ওদের মেরে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। সেই বছর তরমুজ ফললো প্রচুর, কাটলেই দেখা যায়—জাত অনুযায়ী কোনটি ঘন লাল কিংবা শাদা, কোনটির রং হলদে। তরমুজ এর চেয়ে ভাল আর কখনও হয়নি।

এই ফলটি মা খুব ভালবাসে। যেগুলো বিক্রি করা যাবেনা, কিংবা রোদে বেশি পেকে গেছে, সেগুলো অযথা নষ্ট হবে ভেবে মা পেট ভর্তি হয়ে গেলেও খেতে লাগলো। সে বুঝতেই পারলোনা—এই তরমুজের প্রাচুর্য অথবা কোন খারাপ বাতাস তাকে পেয়ে বসলো কিনা। সে জানেনা—তার পাপ যিনি

অনুমান করেছেন সেই ছোট্ট দেবতাটি ছাড়া আর কেউ তাকে ঘৃণা করে। তবু, সে স্থির করতে পারলোনা কেউ তাকে অভিশাপ দিল কিনা। সে টের পেলোনা—এটা কি। তার দাস্ত আরম্ভ হলো। সেই অসুখ তার অন্ত্রটিকে টেনে বার করে ফেললো। সে দিনের পর দিন রোগশয্যায় পড়ে রইলো, এত দুর্বল হলো যে এক চুমুক চা-ও গলাধঃকরণ করতে পারেনা।

রুগ্ন, যন্ত্রণাতর হয়ে পড়ে রইলো, মা। শাশুড়ীর জন্য যা করা দরকার, পুত্রবধূ সবই করলো, সামান্যতম ত্রুটিও করলোনা তার কর্তব্য-পালনে। অন্ধ মেয়েটিও করলো তার যেটুকু সাধ্য। সে তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারেনা, কোনটি কখন দরকার দেখতে পায় না। তাই, পুত্রবধূ তাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বলে, আমায় পথ ছেড়ে দিয়ে কোথাও গিয়ে চুপ করে বোস তো, বোন্; তাতেই আমার কাজের সাহায্য হবে বেশি।

তার এই দুর্বল অবস্থায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও মা এই চতুরা ও সতর্ক তরুণীর উপর নির্ভর করতে বাধ্য হোল। সে এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে আর অন্ধ মেয়ের পক্ষ সমর্থন করতে পারেনা। আজকাল ছোট ছেলে মাঝে মাঝে এসে দেখে যায়—তার মা কেমন আছে। মা দুর্বলতার জন্য তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পারেনা, তাই সে আবার কোথায় চলে যায়। এই রুগ্নতায় এইটুকু সুধু মার ভরসা যে তার নিপুণা, সাবধানী পুত্রবধূ তার রোগশয্যা ঘিরে রয়েছে। অবশেষে, রোগ তাকে ছেড়ে অন্য কারো কাছে চলে গেল। মা শয্যা ছেড়ে উঠলো। তখনও সে রইলো পুত্র-বধূর উপর নির্ভর করে—তাকে সে ভালবাসে বলে নয়, প্রয়োজন বলে।

একটু সুস্থ হয়ে উঠতে অনেক সময় লাগলো মার। সম্পূর্ণ সুস্থ সে হলোনা আর। তার প্রিয় খাদ্য শক্ত কপি, সে আর খেতে পারেনা, কোন রকমের তরমুজ তার পেটে সয়না, যে বাদাম মাটি থেকে তুলে কাঁচা চিবিয়ে খেতে সে ভালবাসতো—তাও আর খেতে পারেনা সে। যা খায়, সেটা পেটে সইবে কিনা ভেবে দেখতে হয়। এই বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে সে বলে—তার যা খুসী আর যা সে খেতে পারে তা'ই খাবে, পেটকে তা সইতে হবে! ফলে পেটের অসুখ করে আবার। বেশি কাজ করলে কিংবা একটু ঠান্ডা হাওয়ায় বসলে সেই দুরন্ত রোগ তাকে আক্রমণ করে, অসহায় করে রাখে

তাকে।

এই অসহায়তায় তার মনে হলো—অন্ধ মেয়েটির কোথাও বিয়ে দেওয়া দরকার, এখানে সে সমাদৃত নয়। শরীরের দুর্বলতার জন্য মা প্রতিবাদ করতে পারেনা, মেয়েটি অস্বস্তি বোধ করে, অনুভব করে—সে অবাঞ্ছিত। একদিন তার মাকে একা পেয়ে সে বলল, দাদার সংসারে আমি আর থাকতে পারিনা, মা। আমার বোধ হয়, শিগ্‌গিরই কোথাও আমার বিয়ে হওয়া দরকার—যেন যেখানে আমি অবাঞ্ছিত নই সেখানেই থাকতে পারি।

মা প্রতিবাদ করলোনা আর। দু'একটি কথায় মেয়েকে সান্ত্বনা দিল।

এখন সে গরমের চেয়ে শীতের দিনেই একটু ভাল থাকে। সে-বছর শীতের সময়। মা সেদিন শরীরে আগের চেয়ে একটু বেশি শক্তি অনুভব করলো। সে সেই প্রগল্‌ভা বিধবার কাছে গেল। সে তার ঘরের দরজায় বসে এক টুকরো কাপড়ের উপর ফুল তুলছিল। নিজে সেকথা স্বীকার না করলেও আগের মতো চোখে দেখতে পায়না সে। মোটা সুতো দিয়ে সে এমন ফুল তুলছিল যে তার নমুনা দেখে হাসি পায়। তার সঙ্গে দেখা হলে মা শ্রান্তভাবে তাকে বলল, তোমার কথাই সত্যি, দেখছি আমার মেয়েটির বিয়ে দেওয়া ভালো হবে। তুমি যে-ছেলেটির কথা বলেছিলে সেই ছেলেটির সঙ্গেই হোক্‌ না কেন। আমি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছি। এখানে-ওখানে খোঁজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার সেই অসুখটার পর থেকে শরীরটা সর্বদাই অবসন্ন থাকে।

নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করতে হবেনা এমন একটা নতুন কাজ পেয়ে বৃদ্ধা বিধবাটি খুসী হলো। একখানি ঠেলাগাড়ি ভাড়া করে দশ মাইলের কাছাকাছি রাস্তা অতিক্রম করে সে চলে গেল—সেই উপত্যকায়। সেই পল্লীতে তার বাপের বাড়ি। সেখানে কিছুদিন থেকে সেদিন রাত্রিতে সে ফিরে এলো। সেই রাত্রিতেই মার বাড়িতে গিয়ে মাকে একান্তে ডেকে কানে বলল, সব ভালোয় ভালোয় হয়েছে বৌ, মাসখানেকের মধ্যেই কাজটা সেরে ফেলা যেতে পারে। তবে, হ্যাঁ, আমার বড্ড পরিশ্রম হয়েছে। তবু, সুধু তোমারই খাতিরে এতটা করেছি। আমরা দু'জনেই এখন বৃদ্ধা, সই!

এই সময়টার জন্য যে টাকাটি তার বুকের ভিতর রেখেছিল সেটি বার করে

মা বৃদ্ধা বিধবার হাতে গুঁজে দিল। সে তার হাত ঠেলে দিয়ে বলল, সে দিব্যি করে বলেছে—ওটাকা সে নেবেনা, দু'জনে যখন বন্ধু, তখন টাকার দরকার নেই। নানা কথা বলে অবশেষে সে টাকাটি নিল।

সব ঠিক হয়ে যাবার পর মা ছেলের বৌকে একথা জানালো। পুত্রবধূ খুসী হলো, তার আনন্দ প্রকাশ করলো। তবু, বলল, এত তাড়াহুড়োর কি দরকার ছিল, মা? আমি তো ওকে অপছন্দ করিনা, আরও দু'এক বছর এখানে আমার কাছে সে অনায়াসে থাকতে পারতো—আর যদি ক'জন লোককে খাওয়াচ্ছি মুখ গুণে দেখবার মতো গরীব না হতাম, তা'হলে জীবন-ভর থাকলেও আমার কোন আপত্তি ছিলনা।

সে দরদী হয়ে উঠলো। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মেয়েটির নতুন জামা কাপড় সেলাই করতে লেগে গেল। সে তিনটি পোষাক সেলাই করতে লাগলো—একটি নতুন কোট, নীল রংয়ের একটি পা'জামা, আর বিয়ের দিনের জন্য একটি লাল পাজামা। নিতান্ত গরীব কুমারীও এমনি পোষাক পেয়ে থাকে। সে একজোড়া নতুন জুতো তৈরী করে তার উপর একটি ছোট ফুল ও একটি লাল পাতা তুললো। মেয়েটিকে বিনা পণে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে—তবু, যার সংগে বিয়ে হচ্ছে তার পক্ষে এ সওদা পছন্দসই নয়; তাই ঘটা করে বিয়ে দেবার দিন স্থির করা হলোনা—বিয়েতে কোন উপহার দেওয়া হলোনা।

মেয়েটি সেই দিনটি সম্বন্ধে কোন কথা বললোনা। মার মুখে সব কথা শুনে সে নীরব রইলো। রাত্রিতে, একবার হাত বাড়িয়ে মার মুখখানি কাছে টেনে আনন্দে বলল চুপি চুপি, কিন্তু মা, জায়গাটি এত দূরে যে সেখানে আমি কেমন থাকি, তুমি তো মাঝে মাঝে গিয়ে একবার দেখে আসতেও পারবেনা। আমি এমনি অন্ধ যে পাহাড়-উপত্যকা পেরিয়ে অচেনা পথ ধরে তোমার কাছে আসতে পারবোনা।

মাও তার হাতখানি প্রসারিত করলো। সে অনুভব করলো—মেয়েটি গোপনে কাঁদছে ও অন্ধকারের মধ্যে লেপ দিয়ে চোখের জল মুছছে। মা বার বার বলল, হ্যাঁ মা, আমি যাবো, নিশ্চয় যাবো। যখন যাবো তখন তুই আমায় সব কথা বল্‌বি। ওরা যদি তোর সংগে ভাল ব্যবহার না করে, তখন আমি দেখবো। তোর সংগে ওরা খারাপ ব্যবহার করবেনা। তারপর অতি

মৃদুকণ্ঠে মেয়েটিকে বলল, তুই তো আজকের সারাটি রাত না ঘুমিয়েই কাটালি।

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ, রোজই তো কতক্ষণ এমনি জেগে থাকি, মা।

মা স্নেহভরে বলল, ভয়ের কোন কারণ নেই। অন্ধের মধ্যে তোর মতো ভালো, চট্‌পটে মেয়ে আমার তো চোখে পড়েনি। ওরা জানে, তুই চোখে দেখিস্‌নে। সেজন্য, তারা দোষ দিতে পারবেনা, বলতে পারবেনা—আমরা সে কথা গোপন করেছি।

অনেকক্ষণ পরে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হলো মেয়েটি। মা শুয়ে শুয়ে নিজের অদৃষ্টের উপরই দোষারোপ করলো। মনে হলো—অজ্ঞাত কোন পাপ রয়েছে তার নিজের মধ্যে, মেয়েটি তারই শাস্তি ভোগ করছে। সে সুধু সুস্থ থাকলেই মা খুসী হতো। নিজেকেই দোষী মনে হয় মার,—কাছাকাছি কোথাও মেয়েটার বিয়ে দিতে পারলোনা। তাহলে, সে অন্ততঃ বছরে একবার গিয়ে দেখে আসতে পারতো, কিংবা কিছু পয়সা খরচ করে লোক পাঠিয়ে তার খবর নিতে পারতো। পরক্ষণেই আবার মনে প্রশ্ন জাগলো তার ছেলে ও ছেলের বৌ, সেই সামান্য ব্যয়ভার বহন করতেও রাজী হোত কিনা! এখন যে টাকা তাদের কাছেই থাকে। গভীর বেদনার সঙ্গে সে আশা করলো—তার উপর ওরা কোন দৈহিক উৎপীড়ন করবেনা। ভাবল—স্বামী বা শাশুড়ী নব-বধূকে প্রহার করে, এমন গৃহস্থ নেই। আমার এই অন্ধ মেয়েটিকে মারতে দেখলে আমার বুকখানি ফেটে যাবে। কাছে হলে আমি তা শুনতে পাবো নইলে দৌড়ে বাড়ি এসে আমায় বলবে। কিন্তু একবার বিয়ে হয়ে যাবার পর আমি হবো নিরুপায়—আমি তা সইতে পারবোনা। দৃষ্টির অনেক দূরে, যেখানে আমি দেখতে পাইনা সেখানে থাকাই বরং ভালো। তাহলেই দুঃখকে প্রতিরোধ করা যায়—দেখতে পাবোনা, তাই মনে আশা রাখা যায়।

সে কিছুক্ষণ শুয়ে রইলো। অনুভব করলো—তার জীবন যেন দুর্বিষহ হয়েছে। ভাবল—একটি কাজ সে করতে পারে—বাড়ি ছেড়ে আসার সময় তার মা তাকে যেমন দিয়েছিল তেমনি সেও তার নিজের তহবিল থেকে কিছু টাকা মেয়েটিকে দিতে পারে। তাই, সে ভোর হবার আগে অন্ধকার থাকতে শয্যা ত্যাগ করলো। তারপর তার টাকা রাখবার জায়গাটিতে গেল

অতি সন্তর্পণে—যেন পশু আর মুরগীগুলো ভয় না পায়। মাটি খুঁড়ে ন্যাকড়া থেকে খুলে সে পাঁচটি মুদ্রা নিল। টাকাগুলো বুকের মধ্যে ফেলে আবার গর্তটি ভরিয়ে দিল। বুকের মধ্যে সেই ক'টি টাকা রেখে সে একটু তৃপ্তি বোধ করলো। ভাবল, গরীব মা-বাবার ঘর থেকে যে-সব মেয়ে স্বামীগৃহে যায়, তারা সকলেই তো নিজস্ব তহবিল নিয়ে যায়না। কিন্তু আমার মেয়ের তো এই ক'টি টাকা থাকবে!

সামান্য এই তৃপ্তিটুকু আঁকড়ে ধরে সে ঘুমালো।

এমনি করে দিন কেটে গেল—একটি দিনও আনন্দে কাটেনি। তার ছোট ছেলেও এখন আর তাকে আনন্দ দিতে পারেনা। মা আর ভাবেনা—সে এলো, কি এলোনা। সুধু দেখে—সে আছে—কি একটা কাজ সে হাসিমুখে করছে। ক্রমে দিন এগিয়ে এলো—মেয়েটির চলে যাবার দিন। সে তাকে নিতে আসবে তাকে দেখবার গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে মা বেদনার্ত হৃদয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। যে এসে তার মেয়েটিকে নিয়ে যাবে সেই লোকটি কেমন হবে? ভেবে ভেবে হায়রাণ হয়ে গেল মা।

তখন নবীন বসন্ত। একদিন সেই লোকটি এসে পেঁছিল। বসন্ত তখনও সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করেনি। সুধু, গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা খাবার জন্য মাটি খুঁড়ে যে ক'টি শক্ত বুনো গাছ তুলে নিয়েছে তারই মধ্যে, কচি উইলো গাছ-গুলোর সবুজ আভায়, পীচ্ গাছের পিঙ্গল মুকুলে, বসন্তের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। মাঠ তখনও শীতে শস্যহীন, তখনও গম জন্মায়নি—ভিজে মাটির মধ্যে ওরা গজিয়ে উঠেছে মাত্র; বাতাস শীতল।

লোকটি এলো—ধূসর একটি গাধার পিঠে চড়ে এলো—দেখা গেল লোকটি বৃদ্ধ। জীর্ণ ভাঁজ-করা কোটটি পশুটার পিঠের উপর রেখে সে তার উপর বসেছিল। মার বাড়িতে এসে সে তার পরিচয় দেয়। তাকে দেখে মার হৃৎ-স্পন্দন থেমে গেল। বৃদ্ধের দৃষ্টি বিসদৃশ ঠেকলো তার চোখে। দাঁত বার করে লোকটি হাসলো, ঠোঁটে কোমলতা আনতে চাইলো; কিন্তু সেই বুড়ো খেঁকশেয়ালের মুখে, তার কোটরাগত তীক্ষ্ন চোখ দুটিতে ও হাসিতে বক্র-সরু, ঠোঁটহীন মুখগহ্বরের উপরকার কয়েকটি শাদা কেশে, করুণার লেশমাত্রও

ছিলনা। তার পরণের পোষাককে ন্যাকরাও বলা চলে—পরিষ্কারও নয়, তালি-মারাও নয়। গাধার উপর থেকে নেমে এলো সে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই যেমন থাকে, তেমনি সাধারণ শিষ্টাচার ছিলনা তার আচরণে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছেঁড়া পোষাকটি কোমরে জড়িয়ে সে খামার পেরিয়ে এলো। তার একটি পা অপরটির চেয়ে খাটো। এসেই কর্কশকণ্ঠে বলল, আমি তোমাদের মেয়েটিকে নিতে এলাম। কোথায় সে?

লোকটির উপর ঘৃণা এলো মার। বলল, কিন্তু আপনিই যে সেই লোক, তার প্রমাণ কি?

আবার মুখব্যাদান করে লোকটি বলল, আমার ভাইপোর জন্য মেয়েটিকে বিনা পণে পেতে পারি একথা যে মোটা স্ত্রীলোকটি আমাদের বলে এসেছে, সে আমায় চেনে।

মা বলল, আপনি একটু দাঁড়ান তা'হলে, আমি তাকে ডাকছি। সে তার ছোট ছেলেটিকে পাঠানো বিধবাটির কাছে। সেদিন সে মার বাড়ির আশে-পাশে অলসভাবে ঘুরছিল। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে এলো। লোকটির দিকে চেয়ে সে হেসে বলল, এ যে দেখছি বরের খুড়ো! তা আপনি কেমন আছেন, আপনার খাওয়া হয়েছে তো আজ?

দন্তহীন দাঁতের পাটি দেখিয়ে স্মিতমুখে সে বলল, হ্যাঁ, তবে তেমন ভালো হয়নি।

মা স্থিরভাবে লোকটির দিকে চেয়ে ছিল। চুপি চুপি বিধবাকে বলল, লোকটার দৃষ্টি ভাল লাগছেনা আমার। মেয়েটির জন্য এর চেয়ে ভালো আশা করেছিলাম আমি।

হোঃ হোঃ করে হেসে উচ্চকণ্ঠে বিধবা বলল, ও তো আর বর নয়! তাঁর ভাইপোটি খুব শান্ত-শিষ্ট ছেলে—এমন তুমি দেখনি কোথাও।

ইতোমধ্যে বড়জা-ও এলো। এলো তার ছেলে, ছেলের বৌ, ভাশুর, পাড়ার অন্য সব লোক। সবাই দাঁড়িয়ে বৃদ্ধের দিকে চাইলো। তার দৃষ্টি ও আদব-কায়দা সত্যিই পছন্দ হলোনা তাদের। তবু, পাকা কথা হয়ে গেছে! কেউবা বলল, তোমার মেয়েটি অন্ধ একথা তোমার মনে রাখা উচিত, বৌ।

পুত্রবধূ বলল, সব পাকাপাকি হয়ে গেছে, মা; এখন অমত করা কঠিন

তা'হলে আমাদের বিপদ হতে পারে। স্ত্রীর কথা শুনে তার স্বামী নীরব রইলো।

মা করুণ চোখে চাইলো ভাশুরের দিকে। চোখাচোখি হতেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সে মাথা চুলকালো, বুঝতে পারলোনা কি বলবে। শাদাসিধা ভাল মানুষটি সে। বৃদ্ধের দৃষ্টিতে খুব বেশি আস্থা স্থাপন করতে পারলোনা সে। তবু, দারিদ্র্য ও পাপ একই বস্তু কিনা বলা কঠিন হয়ে থাকে কখনও কখনও। ছেঁড়া পোষাকেই হয়তো তাকে এমন খারাপ দেখাচ্ছে। সবই ঠিক হয়ে গেছে, এখন 'না' বলাও যায়না। সুতরাং কি বলবে ঠিক করতে না পেরে কিছুই বললোনা সে। ঘাড় ফিরিয়ে একটি তৃণখন্ড তুলে নিয়ে চিবোতে লাগলো।

বিধবা দেখলো—তার সম্মান বিপন্ন। সে বারংবার বলল, এ তো বর নয়, এখন কাজটা না হলে তাকে লজ্জা পেতে হবে। তাই বৃদ্ধাকে সম্বোধন করে বলল, দেখুন আপনার ভাইপোটি একেবারে শিশুর মতো সরল। কেমন, না?

লোকটি মুখব্যাদান করে ঘাড় নেড়ে ক্ষীণ হাসি হাসলো। হাসির চোটে কাশতে কাশতে বলল, হ্যাঁ-হ্যাঁ, একেবারে শিশুর মতো সরল। তারপর অধৈর্য হয়ে বলল, সন্ধ্যার মধ্যেই ওকে নি বয়াড়ি পেঁছতে হলে আমাকে এখনই যাত্রা করতে হবে।

অগত্যা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মা নতুন পোষাক-পরিহিতা মেয়েটিকে গাধার পিঠের উপর বসিয়ে দিল। হাতের মুঠোর মধ্যে রুপোর ছোট্ট থলেটি দিয়ে তার কানে কানে বলল, এটা তোর জন্য দিলুম মা, ওদের দিস্নি। বৃদ্ধ গাধার পায়ে লাথি মেরে পশুটিকে চালিয়ে দিল। সহসা বেদনায় চিৎকার করে উঠলো মা, আমি শিগ্গিরই আসবো মা, দেখে আসবো ওরা তোর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছে। সবই মনে রাখিস্—আমায় যেন বলতে পারিস, কিছু খারাপ হলে আমি তোকে নিয়ে আসতে ভয় করবোনা নিশ্চয়।

মেয়েটির শুষ্ক, কম্পিত ওষ্ঠের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এলো ক'টি কথা, হ্যাঁ মা, তোমার কথায় আমি সাহস পেলুম।

তবু, মা তার মেয়েটিকে সহজে যেতে দিতে পারলোনা। মরিয়া হয়ে মনের

আনাচে-কানাচে অনুসন্ধান করলো—শেষ কথাটি কি বলবে? সে তাকে আর একটু আটকে রাখলো। মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধকে বলল, দেখুন, মেয়েটি আমার আগুনের কাছে যেতে পারেনা, ওকে উনান ধরাতে দেবেননা, ওর চোখে ধোঁয়া লাগে—

মুখ ফিরিয়ে চাইলো বৃদ্ধ। কথাটি হৃদয়ঙ্গম করে বলল, হ্যাঁ, তাই হবে—আমি তাদের বলবো। সে পশুটিকে লাথি মারলো আবার। গাধা চলতে লাগলো, তার পাশে পাশে চললো লোকটি।

মেয়েটি চলে গেল। অন্ধত্বের নির্দশনটি সে হাতে চেপে রেখেছে, তার পেছনে গাধার পিঠের উপর পোষাকের পুঁটলিটি রয়েছে বাঁধা। মা দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলো মেয়েটির দিকে। তার অন্তরে জেগেছে সীমাহীন গভীর বেদনা, দুচোখ বেয়ে অবিরাম অশ্রু-ধারা ঝরছে। সে বুঝতে পারেনা—আর কীই বা সে করতে পারতো!

যতক্ষণ পর্যন্ত না পাহাড় তার মেয়েটিকে তার দৃষ্টির আড়াল করে দিল ততক্ষণ পর্যন্ত সে সেই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

॥ ষোল ॥

মার মন আতঙ্কিত। যেখানে তার অন্ধ মেয়েটি বসতো সেই স্থানটি আজ শূন্য। এই আতঙ্কের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য, মনের শূন্যতা দূর করবার জন্য, সারাদিন কাজে মগ্ন থাকা প্রয়োজন তার। নিস্তব্ধ মনে হয় ঘরখানি। রাস্তায় বেরুলেই মেয়েটি সেই ছোট্ট ঘণ্টাটি বাজাতো, সে শুনতো তার বিষাদমাখা শব্দ। আজ সেই পথ নীরব। অসহ্য বোধ হলো মার।

বড় ছেলের আপত্তি সত্ত্বেও সে আবার মাঠে গেল। তাকে নিড়ানীটি নিতে দেখে ছেলেটি বলল, তোমায় কাজ করতে হবেনা, মা। তুমি এখন বুড়ো হয়েছে। তোমায় মাঠে কাজ করতে দোব, আর লোকে তাই দেখবে— এ আমার পক্ষে লজ্জাকর। ক্রুদ্ধস্বরে মা বলল, আমি তেমন বুড়ো হইনি, কাজ করে আমায় একটু শান্তি পেতে দে। দেখছিস্ না, মনের শান্তি আমার কতো প্রয়োজন?

ছেলেটিও দৃঢ়কণ্ঠে বলল, আমার মনে হয় মা, তুমি মিছিমিছি মন খারাপ করছো। যে-অমঙ্গল কোনদিনই হতে পারেনা, তারই আশঙ্কা করে কী লাভ? তেমনি গভীর ঔদাসীন্যের সঙ্গে মা উত্তর দিল, তুই বুঝ্‌বিনা। তোরা ছেলেমানুষ, কিছুই বুঝিস্‌ নি।

যুবক মার দিকে সবিস্ময়ে চাইলো, বুঝতে পারলোনা তার কথার মানে। মা আর বাক্যব্যয় না করে নিড়ানীটি নিয়ে মাঠের উপর দিয়ে চললো, নীরবে। সত্যিই, সে এখন বেশি পরিশ্রম করতে পারেনা। যখন ঘাম বেরোল, গরম হাওয়া গায়ে লাগলো, তখনই তার ঠাণ্ডা লেগে গেল। আবার অসুস্থ হয়ে পড়লো সে। এ আলস্য তাই সইতে হবে তাকে। পুনরায় সুস্থ হবার পর সে আর কাজ করতে বেরুল না—কুঁড়ে হয়ে বসে রইলো ঘরের দরজায়। ঘরের কোন কাজেই তার হাত দিতে হয়না, পুত্রবধূই সতর্কতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করে সব।

মার মনে পড়লো—এখনও কোন সন্তান হয়নি তার পুত্রবধূর। দোষের মধ্যে শুধু এ-ই! আর সবই সে ভালভাবে করে। সেখানে শূন্যমনে বসে মা অস্থির-ভাবে উনানের দিকে চাইলো। এখানে বসেই সে তার ছেলেমেয়েকে খেলাচ্ছলে ধূলোয় গড়াগড়ি দিতে দেখতো। সারাদিন বসে রইলো সে। মনে পড়লো অতীত দিনগুলোর কথা। মনে পড়ে গেল—একদা কেমন করে যৌবনে ও পরিপূর্ণ জীবনে—যখন সে তরুণী বধূ—সে সেখানে বসে কাজ করতো, তার কাছে থাকতো স্বামী ও শিশুরা, আর থাকতো সেই বৃদ্ধা মা। তারপর স্বামী চলে গেল, কোন সংবাদই পাওয়া গেলনা তার! মনখানি সঙ্কুচিত হয়ে গেল, মনের গতি ফিরে গেল অন্যদিকে। আবার ভাবলো—এখন কেমন শূন্য মনে হয় তার। বড় ছেলেটি সারাদিন মাঠে থাকে কিংবা খাজানার ধান দেওয়া নিয়ে নায়েবের সঙ্গে বাদানুবাদ করে। মা নায়েবকে কোনদিন দেখেনি। লোকে বলে—লোকটি জমিদারের দূর সম্পর্কিত আত্মীয়। অন্ধ মেয়েটিও চলে গেছে। ছোট ছেলেটি হামেশাই শহরে থাকে, বাড়িতে থাকে ক্বচিৎ।

হ্যাঁ, তবু ছোট ছেলেটি রয়েছে। প্রায় তার কথা মনে পড়ে। সন্তানদের মধ্যে সে এখনও তাকেই সব চেয়ে বেশি ভালোবাসে। মার মনের এই রিক্ততায়

সে মাঝে মাঝে আসে। সে এলেই মা নিরানন্দ অবস্থায় উঠে আসে, ছেলের প্রশান্ত দৃষ্টি দেখে মৃদু হাসে। সে-ই তার সন্তানদের মধ্যে সব চেয়ে সুদর্শন—ঠিক তার বাবার মতো। এখন সে নিশ্চিন্তে আসে, বড় ভাইকে আগের মতো আর ভয় করেনা। শহরে একটি কাজ পেয়েছে সে, টাকাও কিছু পাচ্ছে। কিন্তু কী কাজ—স্পষ্ট করে বলেনা। মাঝে মাঝে অগুনতি টাকা পায়। আবার কখনও একেবারেই পায়না। তার পরণের দামী পোষাক দেখে তা' অনুমান করতে পারলেও দাদাকে এ টাকা দেখায়না সে। সময়-সময় উত্তেজনাবশে মার হাতে ক'টা টাকা গুঁজে দিয়ে বলে, টাকাটা তোমার কাছে থাক্ মা, তুমি খরচ করো।

মা টাকাটি নেয়, প্রশংসা করে ছেলেটিকে, ভালবাসে। বড় ছেলেটি কর্তা হবার পর নিজের কাছেই রাখে সব টাকা। কোনদিন একটি টাকাও সে মার হাতে দেয়নি। খেতে ভালবাসে মা। তাই যতটুকু পারে পেট ভরে খায়। পুত্র-বধূই তার পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরী করে দেয়। পুত্রবধূর আমলে আগের চেয়ে অনেক সুখে আছে সে। সুদূর ভবিষ্যতে মৃত্যুর চিন্তা মার মনে না এলেও তার সমাধি-বস্ত্রটি পর্যন্ত তৈরী করে রাখা হয়েছে। যে-কোন জিনিস—যেমন আরামের জন্য একটি পাইপ, ভাল তামাকু, গরম, হলদে এক চুমুক মদ—চাওয়া মাত্রই তারা তাকে দেয়। কিন্তু হাতে একটি টাকা দিয়ে একটি দিনও বলেনি, টাকাটা তোমার খুসীমতো খরচ করো। সে জানে—টাকা যদি সে কখনও চাইতো, তখন তার ছেলে-বৌ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতো, দু'জনের একজন জিগ্যেস করতো, টাকা দিয়ে তুমি কি কিনবে? আমরা কি তোমার যা দরকার সবই দিচ্ছিনা? তাই, ছোট ছেলেটি যখন তাকে টাকাটি দেয় তখন সে তাকে ভালবাসে। পুত্র ও পুত্রবধূ তাকে যা দেয় তার চেয়ে যে টাকাই বেশি প্রিয় তার কাছে! সে টাকাটি বুকের ভিতর রেখে দেয়, রাত্রিতে গর্তের মধ্যে লুকিয়ে রাখে।

কিন্তু যেখানে থাকলে মা তাকে সর্বদাই দেখতে পায়, সেখানে সে থাকেনা। শূন্য সেই খামার ঘরে বসে থাকে দু'টি স্ত্রীলোক—মা ও পুত্রবধূ। মার কাছে গৃহখানি পরিত্যক্ত মনে হয়। সে বসে বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ও পাইপ্ টানে। সুধু নিজের জীবনের কথা চিন্তা করা ছাড়া এখন আর কোন কাজ

নেই তার। ইচ্ছে করেই এ জিনিসটা সে ভাবেনা। ভাবতেই মনে পড়ে অন্ধ মেয়েটিকে। সে আজো নিঃসন্দেহ হতে পারেনি—দেবতাদের সঙ্গে তা'রা দু'জনেই সম্পর্কহীন। মনের শান্তির আশায় মাঝে মাঝে সে দেবালয়ে যেতো। কিন্তু সেই পুরানো পাপ? মনে হয়—ক্ষমা প্রার্থনার সময় নেই আর। সে তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মাঝে মাঝে দুঃখের সঙ্গে বলে—অন্ধ মেয়েটির কথা।

পুত্রবধূ একখানি কাপড় সেলাই করছিল। সেটি—ঠিক হ'লো কিনা দেখবার আমাদের সকলের সৌভাগ্য! উত্তেজিতভাবে মা বলে, মেয়েটিও আমার খুব চতুরা। কতটুকু কাজ সে করতে পারে, তা' তুমিও বিশ্বাস করতেনা, বৌমা! তুমি তাকে করতে দাওনি এমন অনেক কাজই সে তোমার বিয়ের আগে করতো। তুমি জাননা, কী সুন্দরভাবে সে কাজগুলো করতো।

পুত্রবধূ একখানি কাপড় সেলাই করছিল। সেটি ঠিক হ'লো কিনা দেখবার জন্য যেন—চোখের সামনে তুলে ধরে বলে, হ্যাঁ, তা হতে পারে। তবে আমি কাজ করতে অভ্যস্ত, যে-কোন কাজ আরম্ভ করে শেষ করতে পারি। একটি অন্ধ মেয়েকে সে-কাজ করতে বেগ পেতে হবে।

ফাঁকা উঠানটির দিকে চেয়ে মা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, তোমার যদি একটি ছেলে হোত, মা! ঘরে দু'তিনটি ছেলে মেয়ে থাকা দরকার। এমনি নির্জন ঘরে থাকতে অভ্যস্ত নই আমি। তা' না হয় তোমার না-ই হোল! আমার ছোট ছেলেটি যদি বিয়ে করতো। কিন্তু সে বিয়ে করবেনা।

তরুণী বধূর একমাত্র দুঃখ—পাঁচ বছর হলো তার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু একটি সন্তান হয়নি। এমনকি, সন্তান হবার কোন লক্ষণও প্রকাশ পাচ্ছেনা। সে গোপনে দেবালয়ে ধন্না দিয়েছে, নিজে যা জানে—সবই করেছে। তবু, তার দেহখানি রয়ে গেছে তেমনি অনুর্বর। সে গর্বিতা, তাই এ দুঃখ প্রকাশ করেনা। শান্তভাবে বলে, সময় হলেই হবে। বিরক্তিভাবে মা বলে, কিন্তু এই তো সময়। স্বামী কাছে থেকেও সন্তান হয়নি এমন স্ত্রীলোক আমাদের গাঁয়ে কেউ আছে-- আমি তো শুনিনি। বিয়ে হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ছেলেরা বাবা হয়। তোমার কোন একটা গোপন রোগ আছে, নিশ্চয়। তাই তুমি এমনি অনুর্বর, অস্বাভাবিক। তোমার ঐ জামাগুলো বড় করেই করেছিলাম। কী

লাভ হয়েছে তা'তে?

মা বড়-জার কাছে অনুযোগ জানায়। তার কানের উপর মুখটি রেখে বলে, আমি জানি, গলদ কোথায়। বিবর্ণ, পিঙ্গল একটি পদার্থ সে। দিনের পর দিন যায়, কোন উত্তেজনাই আসেনা তার ভেতর থেকে। তাই, তুমি তার জামাটা কেটে দিয়েছে—তবু, তার শৈথিল্য ছাড়িয়ে তোমার ভাগ্যটা ফুটে উঠ্‌তে পারছেনা।

ঘাড় নেড়ে হেসে বড়-জা বলে, সত্যিই! বিবর্ণ ও রক্তহীন স্ত্রীলোকদের সন্তান-ধারণে দেরী হয়। অর্থ পূর্ণ হয় তার দুটি আঁখি। বলে, তোমার বয়সে তোমার মধ্যে যে উত্তাপ ছিল সকলের তেমন থাকতে পারেনা, বোন্। তুমিও তো বেশ জান, মেয়েদের পক্ষে এটা সব সময় ভালো লক্ষণ নয়।

মা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়, হ্যাঁ, আমি তা জানি। একটু পরে অনিচ্ছার সঙ্গে বলে মানি—সে খুব সতর্ক, অত্যন্ত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন, বাসনটা প্রায়ই চেঁচে সাফ্ করে, তেলের কলসীটা ও এট-সেটা বার বার ধুয়ে খাবার জিনিস নষ্ট করে, কতবার নিজের গা ধোয়। এজন্যই হয়তো তার ছেলেপিলে হচ্ছেনা। বেশি গা-ধোওয়া সব সময়ে ভাল নয়। বড়-জার মতো সহৃদয়া কেউ নেই আর। এই দীর্ঘ ক'টি বছরের মধ্যে কখনও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। মা জানেনা—সে তার স্বামীকে সেকথা জানিয়েছে কিনা। তবু, পাছে সে তার পুরানো পাপটির কথা তোলে এই ভয়ে, মা আর তার শারীরিক উত্তাপের কথা বললোনা। যদি তার এ দুটি দুঃখ না থাকতো—মেয়েটি দৃষ্টিহীনা ও ছেলেটি সন্তানহীন না হোত, তা'হলে যৌবনের সুদূর দিনগুলির কথা সে নিজেই হয়তো ভুলে যেতো। যদি সেই পাপকে পাপ বলে ভয় না হোত, আর এই দু'টি দুঃখকে পাপের শাস্তি মনে না করতো, তা'হলে সব ভোলা তার পক্ষে সহজ হ'ত।

কিন্তু সে বেঁচে আছে! তার মেয়েটি অন্ধ, এখন সে চলে গেছে; বাড়িতে ছেলেপিলে নেই, তাকে ঘিরে রয়েছে এই পশুগুলো আর এই কুকুরটি। এদের খাওয়াবার সাহসও সে করেনা। তবে, মনে হয়, ভালোর মধ্যে এই হয়েছে যে তার ছেলে দু'টি এখন আর তেমন কোন্দল করেনা। বড় ছেলেটি বাড়ির কর্তা হয়ে সুখে আছে, ছোট ছেলেটি থাকে আর কোথাও। যখন সে বাড়ি

এসে আবার চলে যায়, তখন বড় ছেলেটি বড় জোর ক্ষীণ বিদ্রূপের সঙ্গে বলে, ভেবে পাইনে, আমার ভাইটি এত সব ভালো পোষাক কোথায় পায়, কি কাজ করে? সারাদিন পরিশ্রম করেও তো আমি তার মতো পোষাক পরতে পারিনা। যেমন করে হোক্, নিশ্চয় সে টাকা পাচ্ছে। শহরের কোন চোর কিংবা অন্য কোন দলে মিশিছে কিনা কে জানে, ধরা পড়ে শেষে আমাদেরও হয়ত বিপন্ন করবে। মা যথারীতি ছোটছেলেটির পক্ষ সমর্থন করবার জন্য এগিয়ে যায়। বলে, তোর ছোট ভাইটি খুব ভালো, বাবা। ওকে তোর প্রশংসা করাই উচিত। সে গেছে, একটা কাজও পেয়েছে—তোর জমির ভাগ নিতে এখানে বসে নেই। তোর তো তাই খুসী হওয়া উচিত!

ব্যঙ্গের সঙ্গে বড় ছেলে উত্তর দেয়, হ্যাঁ, মাঠের কাজে ফাঁকি দেবার জন্য অন্য যে-কোন কাজ সে করতে পারে।

ছেলের বৌ বলেনা কিছুই। সমস্ত বাড়িটাই এখন তার, তাই সে সন্তুষ্ট। ঐ যুবক কী করে না করে, তাতে তার যায় আসেনা কিছুই। সে নিজেই এখন তার প্রয়োজনীয় পোষাক কিনে নেয়, তৈরী করে দিতে হয়না আর।

এমনি করে সময় কাটে। বসন্ত আসে, চলে যায়। আবার আসে নতুন গ্রীষ্মের দিন। তবু, মা তার মেয়েটির কথা ভুলতে পারেনা।

সেদিন মা বসে বসে আঙগুলে গুণে দেখলো—ক'দিন হোল ঐ পাহাড় তার মেয়েটিকে দৃষ্টি আড়াল করে দিয়েছিল। তার দু'হাতের সবগুলো আঙগুলের বারগুণের বেশি হবে। তারপর গণনা ভুল হয়ে গেল তার। বিমর্ষভাবে ভাবল—আমায় যেতে হবে তার কাছে? পুরানো বোঝাটি নিজের উপর চাপিয়ে রেখেছি। অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল আমার। মেয়েটি যদি সুস্থ হোত, তা'হলে আর সব মেয়েদের মতো নিজেই তার পুরানো ঘরবাড়ি দেখতে আসতো। তাকে জিগ্যেস করতে পারতাম—কেমন আছে? তার হাত, বাহু ও চিবুক স্পর্শ করতে পারতাম, পরখ করতে পারতাম তার মুখের রঙ। মা দেখলো—চারদিকের পাহাড়গুলো। দেখলো—কেমন করে গ্রীষ্ম এসেছে তার পরিপূর্ণতায়। প্রত্যেকটি পাহাড়ের সানুদেশ সবুজ হয়ে আছে, মাঠের সবগুলো শস্যের গাছ উঁচু হয়েছে। সারাদিন অলসভাবে থাকা সত্ত্বেও অবসন্ন দেহখানি জোর করে তুলে সে ভাবল, এবার মেয়েকে দেখতে যাবো, মাঠের

কাজে আমার প্রয়োজন নেই, কুঁড়ে হয়ে বসে আছি। বেশি গরম পড়বার আগেই যাবো। নইলে হঠাৎ যদি সেই অসুখটি হয়? হ্যাঁ কালই যাবো। আকাশে—এই নীল আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্রও নেই এখন। সে আকাশের দিকে তাকালো, দেখলো—আকাশখানি কেমন নীল! মাঝে মাঝে যেমন মনে পড়ে তেমনি অতর্কিতে মনে পড়লো—দীর্ঘ দিনের ফেলে-আসা জীবনের স্মৃতি। মনে পড়ে গেল—তার স্বামী এমনি নীল পোষাক পরে এসেছিল একদিন, আর সেই পোষাকটি পরে চলে গিয়েছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে; বেদনাভরা মনে সে ভাবে—এমনি একটি দিনে সে তার পোষাকটি এনেছিল, দুজনে ঝগড়া করেছিলাম—ঠিক এমনি সুন্দর একটি দিনে। আমার মনে আছে—পোষাকটিতে ছিল এই দিনের আকাশেরই রঙ।

মনকে চিন্তামুক্ত করবার জন্য সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বড় ছেলেটি এলে অধীরভাবে বলল, ভাবছি—কালই দেখতে যাবো তোর বোন্‌টি কেমন আছে, কেমন করছে শ্বশুরবাড়িতে। ও তো আসতো পারছেনা আমায় দেখতে। চিন্তাকুল হয়ে ছেলেটি বলল, এখন তো আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারবোনা—কাল যে কাজ রয়েছে। ফসলটা ঘরে তোলা অবধি অপেক্ষা কর, আমার একটু ফুরসৎ হোক।

কিন্তু মা অপেক্ষা করতে পারবেনা। একবার যা ভাবে তা' করবার মতো যথেষ্ট শক্তি এখনও রয়েছে তার। নিষ্কর্মা হয়ে বসে থেকে থেকে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বলল, না, আমি কালই যাবো।

ছেলে আরো বেশি চিন্তিত হলো। হঠাৎ কিছু হলে কিংবা স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখলে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। বলল, কিন্তু তুমি কেমন করে যাবে, মা?

সে উত্তর দিল, কেন? ভাশুরের কাছে থেকে গাধাটা চেয়ে নেব। তুই তাঁর একটি ছেলেকে পাঠিয়ে দিবি তোর ভাইকে ডেকে আনতে। সে-ই গাধাটি চালিয়ে আমার সঙ্গে যাবে। আমরা দু'জনে বেশ নিরাপদেই যেতে পারবো। শহরের সেই নতুন ধরণের ডাকাত—যাদের "কম্যুনিষ্ট্‌" বলা হয়, যারা গরীবদের কোন অনিষ্ট করেনা তারা ছাড়া আর কোন ডাকাত—এদিকে আছে বলে তো শুনিনি।

ছেলেটি রাজী হলো অবশেষে। তার স্ত্রী শান্তভাবে বলল, হ্যাঁ, ঠাকুরপো যদি ওর সংগে যায়, তা'হলে আমি কোন বিপদ দেখিনা।

তাই তারা মাকে বাধা দিলনা। ছোট ছেলেকে খুঁজে আনতে ভাশুরের ছেলেকে পাঠানো হলো। সে ফিরে এসে বলল, খুড়তুতো ভাই—তোমার ছোট ছেলে আসবে, কাকিমা। তারপর একটু ভেবে কোটের বোতাম আটকে নিয়ে আবার বলল, এমন অদ্ভুত, গোপন একটি জায়গায় ও থাকে—খুঁজে বার করাই মুস্কিল! একটি দোকানের উপরে লম্বা একখানি ঘর—সেখানে প্রায় কুড়িটি বিছানা! ঘরের মধ্যে বই আর কাগজ ভর্তি। আমি তো জানতুম না, কাকিমা, ও পড়তে জানে। ও-সব বই যদি সে পড়ে, তবে তো সে ভয়ানক পণ্ডিত লোক!

সবিস্ময়ে মা বলল, সে পড়তে পারেনা। সে আমায়ও তো বলেনি—বই পড়েই দিন কাটায়। এ-তো সত্যিই আশ্চর্যের। তা'কে একথা জিগ্যেস করতেই হবে।

পরের দিন। মা গাধার পিঠে চড়ে চলেছে। উপত্যকার ভিতর দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে চলেছে তারা। একা পেয়ে মা ছেলেকে জিগ্যেস করলো, দেখ্, তোর জেঠাতো ভাই বলল—যেখানে তুই থাকিস্ সেই ঘরে নাকি অনেক বই-পত্র রয়েছে। ওগুলো কী বই রে? তুই তো আমায় কোনদিন বলিসনি, তুই পড়তে পারিস—কিংবা বই পড়ে টাকা উপায় করিস্। আমি তো বাবা, তোকে একটি বর্ণও পড়তে দেখিনি কখনও।

যেতে যেতে গুন্ গুন্ করে গান করছিল ছেলেটি। মধুর তার কণ্ঠস্বর। গান গাইতে ভালবাসে সে। গান থামিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমি এক-আধটু লেখা-পড়া শিখেছি। তাকে আরো চেপে ধরলো মা। মাকে এড়াবার জন্য সে বলল, এখন আমায় জিগ্যেস করোনা, কিছুদিন বাদে সময় হলে সবই জানতে পারবে। সে এক মহা-দিন, মা। আমি যেখানে কাজ করি, সেখানে আমরা সবাই মিলে সেই দিনের যে-গান গাই, সেই গানটি এখন গাইছিলাম। সেই দিন আমাদের সকলের সুখ হবে, গরীব-বড়লোক থাকবেনা, সমান হবে সকলের অধিকার! এমন অদ্ভুত কথা মা আর কখনও শোনেনি। সে জানে—বিধাতার নির্দেশেই মানুষ ধনী বা গরীব হয়। নিয়তির বিধান মেনে চলা ছাড়া কিছুই বলবার

নেই মানুষের। ভীত হয়ে মা বলে উঠল, তুই চোর-ডাকাত বা কোন খারাপ দলে যোগ দিস্‌নি তো, বাবা? তোর কথাগুলো তো ডাকাতের মতোর মনে হচ্ছে। আর গরীবের ধনী হবার অন্য উপায় নেই! বড়লোক হবার চেষ্টা করে ধরা পড়ে প্রাণটা হারানো কি ভালো, বাবা?

এ কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে যুবক বলল, কিছু বোঝনা তুমি, মা। শপথ নিয়েছি—এখন কোন কথা বলবোনা আমি। তবে তুমি জানবে একদিন। হ্যাঁ, সেদিন আমি ভুলবোনা তোমায়। কিন্তু সুধু তুমি! আমার সঙ্গে যারা যোগ দেয়নি, তাদের আমি কিছুই দোবনা। শেষের কথাগুলো সে এত জোরে বলল যে মা বুঝলো—সে তার দাদার কথাই বলছে। তার রাগ বাড়বে এই আশঙ্কায় ক্ষণকাল নীরব রইলো মা।

তবু, সে ছাড়তে পারলোনা তাকে। গাধার পিঠে বসে তার লোমশ চামড়াটি ধরে সে ভাবতে লাগলো—তার এই ছেলেটি সম্বন্ধে; গোপনে চেয়ে রইলো তার দিকে। ছেলেটি লাগাম হাতে নিয়ে তার আগে-আগে চললো। আবার সে গাইতে সুরু করলো অশ্রুতপূর্ব সেই গান—একটি উত্তেজনাপূর্ণ সংগীত—যার পদগুলো সে ঠিক অনুধাবন করতে পারছিলনা।

ছেলেটির জীবন সম্বন্ধে আরও কিছু জানবার ইচ্ছা হলো মার। হ্যাঁ, কোন উপায়ে গৃহের সঙ্গে আরো নিবিড়ভাবে বাঁধতে হবে তাকে। মা তার বিয়ে দেবে! ঘরে থাকবে তার স্ত্রী। তা'হলে প্রায়ই সে আসবে। হয়তো-বা স্ত্রীর জন্যই, সেখানে থাকবেও। সে খুঁজে নেবে সুন্দরী শান্ত-স্বভাবা একটি মেয়ে যাকে সে ভালবাসতে পারে। বড় ছেলের স্ত্রী গৃহকর্ম-নিপুণা। এই ছেলের জন্য সে আর এক রকমের একটি মেয়ে আনবে। একথা ভাবতেই একটু শান্ত হলো তার অন্তর। মনে হলো—এ-ই উত্তম উপায়। কথাটি চেপে রাখতে পারলোনা সে। বলল, দেখ বাবা, তোর বয়েস তো এখন কুড়ির বেশি—প্রায় একুশ হতে চললো। ভাবছি, শিগ্‌গিরই তোর বিয়ে দোব। সে খুব সুখের হবেনা কি?

কিন্তু কে জানে তরুণের মন? আধ-লজ্জিত ও আধ-তৃপ্তভাবে সে মৃদু হাসি হাসলো। থেমে মার দিকে ঘুরে বলল, তোমার মুখে একথা শোনবার অপেক্ষা করছিলাম আমি। মা মাত্রেরই মাথায়, বোধহয়, এ-চিন্তা থাকে।

"কম্‌রেড্‌-রা বলে— তাদের মা-বাবারও সব চেয়ে বড় কথাটি হলো, বিয়ে কর—বিয়ে কর—বিয়ে কর।

দেখ মা, আমি বিয়ে করবোনা। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি যদি আমার বিয়ে দাও, তা'হলে আর আমার মুখ দেখবেনা—আমি কখনও বাড়ি আসবোনা। ঘাড় ফিরিয়ে দ্রুততর গতিতে সে পথচলা সুরু করলো আবার। একটি কথা বলবার সাহস হলোনা মার। ছেলের এই উষ্মায় বিস্মিত ও ভীত হয়ে বসে রইলো মা। ছেলেটিও আর গান গাইলোনা।

আসন্ন ভবিষ্যতের চিন্তায় মা ভুলে গেল সব। সকাল থেকে যে-পথ ধরে তারা এসেছে, দুপুরের দিকে সে-পথ সরু—আরো সরু হয়ে এলো। তারা যখন ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তখন সেই উপত্যকার চতুষ্পার্শে, আকাশের নীচে গোলাকার, বক্রাকৃতি, নিষ্কম্প, তৃণ ও বাঁশে হরিদ্বর্ণ, নয়নাভিরাম পাহাড়গুলো অধিকতর সূক্ষ্মাগ্র, উন্নত ও শ্রেণীবদ্ধভাবে দেখা যাচ্ছিল। অবশেষে দুপুরে ভরে এলো। ঋজুভাবে নেমে এলো সূর্যের তাপ, শৈলপুঞ্জ অদৃশ্য হলো, তাদের জায়গায় উঠে দাঁড়ালো উন্মুক্ত, প্রস্তরময়, আকাশ-চুম্বী পর্বতমালা। ফাঁকা পাহাড়ের বালির রঙের উপরে সেদিনের আকাশখানি ছিল উজ্জ্বল, নির্মেঘ, গাঢ় নীল। তাই পাহাড়গুলোকে দেখাচ্ছিল আরো স্পষ্ট। বিশাল পাণ্ডুর পর্বতশ্রেণীর নীচ দিয়ে বেঁকে গেছে পথ। পাথরগুলো গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ নয়—বিচিত্র ফ্যাকাশে পাতলা রঙের। এতটুকু জল নেই কোথাও, সেখানে তাই কিছুই জন্মেনা। এমনি ঘুরে ঘুরে রাস্তাটি ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠে গেছে। দুপুরের দু'একঘণ্টা কাটবার পর তারা পাহাড়ের উপর একটি গভীর উপত্যকায় এসে পৌঁছলো। সেখানে পাথরের দেয়ালের চারদিক ঘিরে রয়েছে চতুষ্কোণ একটি পল্লী। কিছু জল আছে সেখানে। তার চারিদিকে রয়েছে মাঠের হরিৎ। মা ও ছেলে পল্লীটির প্রবেশ-পথে থেমে তাদের গন্তব্য-স্থানটির কথা জিগ্যেস করলো। একটি লোক পাহাড়ের আরো উঁচু একটি জায়গার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বলল, ঐ—ওখানে—যেখানে সবুজ শেষ হয়ে গেছে সেখানে—নীচের দিকটায় দু'টি ঘর আছে। ঐ হলো সবুজের শেষ। তার উপরে—সুধু পাহাড় আর আকাশ।

মা এতক্ষণ অবাক হয়ে দেখছিল—এই পর্বতমালা—বিচিত্র, ভয়াল তাদের

আকার,—বিবর্ণতা ও সবুজের অপ্রাচুর্য। উপত্যকায় সে কাটিয়েছে তার জীবন। সংলগ্ন এই পল্লী থেকে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে যেতে যেতে সে সবিস্ময়ে দেখলো—জায়গাটি কত গরীব, পাণ্ডুর পর্বতচূড়ায় মাঠগুলো কেমন ফাঁকা! ফসল তোলার দেরী নেই আর। কিন্তু, সব রকমের ফসলই অপ্রচুর। ছেলেটিকে বলল, জায়গাটা দেখে আমার ভালো লাগছেনা, বাবা। তোর বোনটির এখানে থাকতে হয়তো খুবই কষ্ট হচ্ছে। হ্যাঁরে, আমরা তা'হলে তাকে বাড়ি নিয়ে যাবো। হ্যাঁ, এখানে থাকা যদি তার পক্ষে কষ্ট-কর হয়ে থাকে, আমি হেঁটেই যাবো—গাধার পিঠের ওপর তুলে নোব ওকে। যে যা বলে বলুক্‌গে! তারা তো আমায় টাকা দেয়নি আর। আমি সুধু ওকে ফিরে চাইবো—এইমাত্র।

কোন উত্তর দিলনা যুবক। ক্ষুধার্ত ও শ্রান্ত হয়েছিল সে। সঙ্গে যে সামান্য ঠাণ্ডা খাবার এনেছিল তা'ই খেয়েছে তারা। তাই সে বোনের বাড়ি পৌঁছবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ভাবলো—সেখানেই তারা রাত্রি যাপন করবে। জোরে লাগাম টানলো সে। তা' সইতে না পেরে মা সাহস করে তাকে তিরস্কার করতে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে সেই বাড়িতে এসে পৌঁছলো তারা। পাহাড়ের গা ঘেঁসে রয়েছে দু'খানি ঘর। একটির দরজায় সেই কদাকার বৃদ্ধটি দাঁড়িয়ে ছিল। মা বুঝলো, এই ঘরটিতেই রয়েছে তার মেয়েটি। মাকে দেখে বৃদ্ধ এমনি ভঙ্গিতে চেয়ে রইলো যেন তার উপস্থিতি সে বিশ্বাস করতে পারছেনা। দৌড়ে ঘরে ঢুকলো সে। বাইরে এলো আরো ক'জন লোক—আর কালো, লম্বা একটি লোক। অদ্ভুত তার চাহনি। দু'জন স্ত্রীলোক ও একটি যুবকও এলো তারপর। এলোনা সুধু তার অন্ধ মেয়েটি!

গাধার পিঠের ওপর থেকে নেমে এগিয়ে এলো মা। নীরবে তাকিয়ে রইলো ওরা সবাই। মা পেছন ফিরে তাকালো। ভয় হলো তার। এমন দৃষ্টি সে দেখেনি কোনদিন। স্ত্রীলোকগুলোর চুল রুক্ষ, অবিন্যস্ত, উকুনে ভর্তি—মুখ শুষ্ক, রোদে পোড়া। পরণের পোষাক যেন কখনও ধোওয়া হয়নি। সবাই একই রকমের। সেখানে সমবেত হলো তারা। অপর বাড়িটি থেকে বেরিয়ে এলো দু'একটি রুগ্ন শিশু—জ্বরে পিঙ্গলবর্ণ, শুকনো মুখ, ঠোঁট

ফাটা, শরীর কাদা-ময়লা মাখা। সবাই নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো, তাকে কোন অভ্যর্থনা জানালোনা। পশুর মতো হিংস্র, আবেগহীন তাদের চোখগুলো। আতঙ্কে দীর্ণ হলো মার অন্তরখানি। ছুটে গিয়ে কেঁদে জিগ্যেস করলো, আমার মেয়ে কোথায়? তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ তোমরা? মা তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। যুবকটি গাধাটি ধরে সন্দেহাকুলভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

তারপর একটি স্ত্রীলোক বিমর্ষভাবে কথা পাড়লো। একে সেই কর্কশ উত্তর, দেশীয় ভাষা, তার উপর ভাঙ্গা—দাঁতের মধ্যে শব্দ আটকে গেল, কোনটি পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে এলোনা। সহজে তার কথা বোঝা গেলনা। বলল, তুমি এসে ভালই করেছ, বৌ। ও আজই মারা গেল। মা অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলো—মারা গেছে! সে আর কিছু বললোনা। তার বুকের স্পন্দন গেল থেমে। নিশ্বাস রুদ্ধ হলো, বাণী ফুটলোনা মুখে। ভিড় ঠেলে কুঁড়ে ঘরখানির ভিতর প্রবেশ করলো মা। সেখানে মাটিতে একটি জীর্ণ মাদুরের শয্যায় পড়ে রয়েছে তার অন্ধ মেয়েটি। সে শুয়ে আছে—নীরব, নিষ্প্রাণ। পরণে—বাড়ি থেকে আসবার সময় যে পোষাক পরেছিল সেই পোষাকটি, পরিষ্কার না হলেও ছিন্ন নয়। সেই নতুন জামাগুলোর চিহ্নমাত্রও নেই। ঘরে রয়েছে সুধু জঞ্জালস্তূপ আর দু'একখানি কাঠের বেঞ্চি। মাঠে দৌড়ে হাঁটু গেড়ে বসলো শয্যার পাশে, চেয়ে রইলো—তার স্থির বদনমণ্ডল, মুদ্রিত আঁখি দুটি ও চিরপরিচিত ছোট্ট মুখখানির দিকে। সে আর্তনাদ করে উঠলো হঠাৎ। মেয়েটির গায়ের উপর পড়ে তার হাত ধরে, জীর্ণ আচ্ছাদনখানি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে দেখলো—তার ছোট বাহু দুখানি; পায়ের পা'জামা সরিয়ে পরীক্ষা করলো—কোথাও কোন দাগ বা আঘাতের চিহ্ন রয়েছে কিনা। কিন্তু কিছু দেখা গেলনা। মেয়েটির কোমল ত্বক ও নরম হাড়গুলো যেমন ছিল ঠিক তেমনি রয়েছে। পাণ্ডুর শীর্ণ হয়ে গেছে সে। তবে, সে চিরদিনই শীর্ণকায়া, আর মৃত্যু বিবর্ণ। মা ঝুঁকে পড়লো, মেয়েটির ঠোঁট শুঁকে দেখলো বিষের গন্ধ আছে কিনা। কিন্তু মৃত্যুর ক্ষীণ বিমর্ষ ঘ্রাণ ছাড়া আর কোন গন্ধ পাওয়া গেলনা।

তবু, মা যেন বিশ্বাসই করতে পারলোনা—স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে মেয়েটির।

যারা নীরবে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছিল তাদের দিকে ফিরে তাকালো সে। সেই রুক্ষ মুখগুলোর একটিরও তার পরিচিত নয়। অশ্রু-প্লাবিত-নয়নে চিৎকার করে সে বলল, তোমরা আমার মেয়েটিকে মেরেছ—হ্যাঁ, তোমরাই! নইলে—বল, এত শিগ্‌গির কেমন করে ম'লো আমার মেয়েটি? সে তো সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় আমার কাছ থেকে এসেছিল!

জনৈকা দুষ্টা বৃদ্ধা—প্রথম দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তার উপর ঘৃণা জন্মেছে মার—দাঁত বার করে বলল, একটু বুঝে-সুঝে কথা বলো, বলছি। আমরা তাকে মেরেছি—এ-তো ছোট কথা নয়! আর—। রুক্ষকেশা, বিষণ্ণ স্ত্রীলোকটি চেঁচিয়ে উঠলো, মেয়েটির শরীর খুব দুর্বল ছিল। তাই, ঠান্ডা লেগেই তো সে মারা গেল! মাটিতে থু-থু ফেলে আবার উচ্চকণ্ঠে বলল, কী অপদার্থ মেয়েই-না ছিল ও! কাজ বলতে কোন কাজ জানতোনা। এমনকি, ঝর্ণা থেকে জলটি আনতে গিয়েও হোঁচট্ খেয়ে পড়ে যেতো কিংবা পথ ভুলে যেতো।

মা চেয়ে দেখলো—পাহাড়ের নীচে ছোট্ট জলাশয়ে যাবার সরু পথটি। বলল, ঐ রাস্তাটির কথাই তো বল্‌ছ? কেউ উত্তর দিলনা তার প্রশ্নের। মনের দুঃখে সে বলল, তোমরা তাকে মেরেছ—নিশ্চয়, রোজ মারধর করেছ আমার মেয়েটিকে। স্ত্রীলোকটি তক্ষুণি বলল, দেখনা, তার শরীরে কোন ক্ষত চিহ্ন পাও কিনা। কাছে যেতে দেরী হচ্ছিল বলে মাত্র একটি দিন আমার ছেলে ওকে মেরেছিল।

মা চোখ তুলে তাকালো একবার, দুর্বল ক্ষীণকণ্ঠে জিগ্যেস করল, কোথায় তোমার ছেলে?

ছেলেকে সামনের দিকে ঠেলে দিল ওরা। সেখানে সে দাঁড়ালো—কদাকার আহাম্মক একটি যুবক। মা দেখলো—সে প্রায় নির্বোধ। মৃত মেয়েটির উপর মাথা রেখে মা কাঁদলো। মেয়েটি এদের হাতে কী কষ্টই না পেয়েছে—ভাবতে কান্না এলো আরো বেশী। কাঁদতে কাঁদতে সেখানে যারা তাকে দেখছে তা'দের উপর রোষ পুঞ্জীত হচ্ছিল তার। সে কার স্পর্শ অনুভব করলো। চোখ তুলে দেখলো—তার ছেলে। ঝুঁকে পড়ে মার কানে কানে সে ব্যস্তভাবে বলল, মা আমরা বিপন্ন, এখানে না-থাকাই আমাদের উচিত। ও মরে গেছে,

এখন তুমি কী আর করতে পারবে? অতি বদ্ মনে হচ্ছে এদের। বলা যায়না—এরা আমাদের কী-না-কী করে। চল, তাড়াতাড়ি গাঁয়ে গিয়ে কিছু খাবার কিনে আজ রাত্তিরেই বাড়ির দিকে রওনা হই।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মা উঠলো। ফিরে দেখলো সে। সত্যিই তো, ওরা সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তার মনেও ভয় জাগলো। তাদের গুঞ্জন ও দৃষ্টি—কোনটিই ভাল লাগছিলনা তার। হ্যাঁ, ছেলেটির কথা তাকে ভাবতে হবে। তাকে তারা হত্যা করে করুক্, কিন্তু ছেলেটি রয়েছে যে!

মা আর একবার তার মৃত মেয়েটির দিকে ফিরে চাইলো, টেনে দিল তার গায়ের কাপড়টি, হাত দুখানি পাশে এনে রাখলো। তারপর সে বাইরে এলো। তখন অপরাহ্ণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাকে অপেক্ষাকৃত শান্ত ও গাধার পিঠে চড়তে উদ্যত দেখে ঐ বোকা ছেলেটির বাবা—এতক্ষণ নীরব ছিল লোকটি—বলল, দেখ ঠাকুরণ, যদি ভেবে থাক আমরা ভাল লোক নই—তবে এই দেখ, তোমার মেয়ের জন্য আমরা কেমন একটি কফিন এনেছি! এর দাম হয়েছে দশ টাকা। যদি ভাবতাম—কোন দাম নেই মেয়েটির, তা'হলে আমাদের জমানো সব ক'টি টাকা দিয়ে কি তার জন্য কফিন কিনে আনতাম?

মা দেখলো—দরজার পাশে সত্যিই একটি কফিন রয়েছে। কিন্তু সে জানে—বাজে কাঠের কাগজের মতো পাতলা এই বাক্সটির দাম কিছুতেই দশ টাকা হতে পারেনা। কপর্দকহীন ব্যক্তিও এমন বাক্স কিনে থাকে। ঠোঁট খুলে রোষভরে বলতে যাচ্ছিল সে, ঐ বাক্স? আমি আমার মেয়েকে যে টাকা দিয়েছিলাম সেই টাকাটা দিয়েও তো তার কফিন কেনা যেতো!—কিন্তু কথাগুলো বললোনা সে। দিনের আকাশে ঠাণ্ডা মেঘের আবির্ভাবের মতো মনে পড়লো—আজকে এই লোকগুলোকে তার ভয় করা দরকার। হ্যাঁ, এই লোক দু'টি দুষ্ট, স্ত্রীলোকগুলো রূঢ়—!

কিন্তু তার ছেলে পোষাকের খুঁট ধরে টেনে তাড়া দিচ্ছিল। মা স্থিরভাবে বলল, আমি এখন কিছু বলবোনা। মেয়ে আমার মরে গেছে। পৃথিবীর সব রোষ কিংবা কথায় তাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবেনা। একটু থেমে সে একবার সকলের দিকে চাইলো। তারপর বলল আবার, তোমরা দাঁড়িয়ে আছ স্বর্গের সামনে, দেবতাদের সামনে—তাঁরাই তোমাদের বিচার করবেন!

সে আরেকবার তাকালো তাদের মুখের দিকে। তারপর ফিরে গাধার পিঠে চড়লো। ছেলেটি সেই পাহাড়ী পথ দিয়ে দ্রুতবেগে গাধাটি চালাতে লাগলো। কম্পিতভাবে সে পেছন ফিরে দেখতে লাগলো—কেউ তাদের অনুসরণ করছে কিনা। মাকে বলল, যেখানে লোকজন আছে সেখানে না পৌছানো পর্যন্ত আমি থামবোনা, আমার বড় ভয় করছে!

॥ সতেরো ॥

রাত থাকতেই মার বাড়ির দরজার সামনে এসে গাধাটি থামলো। শোক ও অবসাদে বিকৃত-মস্তিষ্ক মা নীচে নেমে এলো। সারাটি পথ সে কেঁদেছে—কখনও জোরে, কখনও বা নীরবে। যুবকটি মার কান্নায় অধৈর্য হয়ে সকাতরে বলেছে, তোমার কান্না থামাও, মা, আমি যে আর সইতে পারছিনা।

ছেলেরই জন্য একটু শান্ত হয়ে সে কেঁদে উঠেছে আবার। ছেলেটি দাঁতে দাঁত চেপে মৃদু অথচ তীক্ষ্ন কণ্ঠে বলছে, যদি সেদিন আসতো—আমরা যদি এমনি গরীব না হ'তাম—গরীবেরা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য পেতো আর আত্মরক্ষা করতে পারতো—তা'হলে আমরা আমার বোনের মৃত্যুর জন্য মামলা করতে পারতাম। কিন্তু আমরা গরীব, দেশে সুবিচার নেই।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে মা বলে, সত্যি সুবিচারের জন্য খরচ করবার টাকা নেই আমাদের, মামলা করে তাই কোন লাভ হবেনা। তারপর আবার চোখের জলে ভেসে বলেছে, কিন্তু দুনিয়ার সমস্ত অর্থ, আর সুবিচারেও যে আমার অন্ধ মেয়েটিকে ফিরে আনা যাবেনা! যুবকটিও কেঁদেছে অবশেষে—বোনের বা মার জন্য ততটা নয়। সে কেঁদেছে পায়ের যন্ত্রণায়, আর অবসাদে—পৃথিবী তার কাছে বঙ্কিম!

এমনি করে তারা নিজের ঘরের দরজায় পৌছলো। গাধার পিঠ থেকে নেমেই মা তীব্রকণ্ঠে বড় ছেলেটিকে ডাকলো। সে ছুটে এলো। মা কেঁদে বলল, তোর বোন মারা গেছে বাবা! ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে সে মার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। মা বলল সেই কাহিনী। তার কণ্ঠস্বর শুনে ছুটে এলো সবাই, রাত্রির অন্ধকারে পাড়ার প্রায় প্রতিটি লোক সেখানে এসে দাঁড়িয়ে

শ্বনলো সেই ঘটনা। প্রায় ম্বৰ্ছিতভাবে গাধার পিঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ছেলেটি। মা কথা বলছে দেখে সেখান থেকে উঠে গিয়ে সে মাটিতে শ্বয়ে পড়লো শ্রান্তিতে ম্বহ্যমান হয়ে। সে খানিকক্ষণ নীরবে শ্বয়ে রইলো। মা কাঁদলো। সকলের দিকে জলভরা চোখে চেয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলল, ঐখানে থাকত আমার খ্বকী। সে মারা গেল। ধিক্ আমায়! আমি কেন যেতে দিয়েছিলাম তাকে? এই নিষ্ঠ্বর বৌমার জন্য না হলে আমি কখনও তাকে যেতে দিতাম না। একট্বকরো মাংসের জন্য, জ্বতোয় একটি সামান্য ফ্বল তোলার জন্য সে ঈর্ষা করতো তাকে। তাই তো আমার ভয় হয়েছিল, মেয়েটিও হয়েছিল আতঙ্কিত—যদি আমি মারা যাই! খ্বকী আমার কোনদিনই ইচ্ছে করে আমায় ছেড়ে যেতোনা। মেয়েটি আমার এই আগলে ছিল। তার সেই শিশ্ব-মনে স্বামী বা বিয়ের ভাবনা কি থাকতে পারে? দেখ বাবা, তোর বৌ-ই আমার এ সর্বনাশ করেছে—কী কুক্ষণেই না সে এসেছিল! এত নিষ্ঠ্বর বলে সে বন্ধ্যা, তা'তে সন্দেহ নেই।

সজল-চোখে মা বলে গেল এমনিভাবে সবাই শ্বনলো নীরবে, মধ্যে মধ্যে নিজেদের কথা জ্বড়ে দিয়ে তারা যখন ঘটনাটি জানলো তখন তারা তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সে যে সান্ত্বনা মানেনা। স্ত্রীকে অভিসম্পাত দিয়ে তার বন্ধ্যাত্ব সম্বন্ধে না-বলা পর্যন্ত বড় ছেলেটি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার বেশ শান্ত সমাহিতকণ্ঠে বলল, না মা, বোনকে ওখানে পাঠাতে বউ তোমায় বলেনি। তুমি নিজেই কাউকে কোন কথা না বলে সব ঠিক করে এত তাড়তাড়ি তাকে পাঠিয়েছিলে। আমরা অবাক হয়ে ভেবেছি—তুমি নিজে একবার জায়গাটি দেখেও এলেনা! তারপর তার জেঠার দিকে ফিরে বলল, আপনিও কি তা ভাবেননি? আপনার কি মনে নেই আপনাকে বলেছিলাম—মা এমনি তাড়তাড়ি করে কাজটা করেছে বলে আমরা অবাক হয়ে গেছি।

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে একট্বকরো খড় চিবোতে চিবোতে সে অনিচ্ছার সঙ্গে অস্পষ্ট ভাবে বলল, হ্যাঁ, একট্ব তাড়াতাড়ি! বড়-জা তার একটি নাতি কোলে করে দাঁড়িয়েছিল। দ্বঃখ করে সে বলল, সত্যি বোন্, তুই সব সময়ই তাড়াতাড়ি করিস্। কখনও কাউকে জিগ্যেস করিস্না—কাজটি করা উচিত কি অন্বচিত।

আমাদের জানবার, এমনি অনুমান করবার আগেই কাজ শেষ করে আমাদের মুখে সুধু তার সমর্থন শুনতে চাস্। তোর স্বভাব আজন্মই এমনি।

আজ রাত্রিতে মা নিন্দা সইতে পারলোনা। কুপিত রোষে গর্জন করে উঠলো সে। বড়-জার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ঐ ঢিলে লোকটির সংগে ঘর করতে অভ্যাস হয়ে গেছে তোমার। তাই, সেই তুলনায় আমাদের সকলকেই তোমার চট্‌পটে মনে হয়।

মনে হলো—যাদের মধ্যে আজন্ম এত সৌহার্দ রয়েছে, আজ তাদের দু'জনের তিক্ত বাক্য-বিনিময় হবে। সরল প্রকৃতি, শান্তিপ্রিয় ভাশুর দেখলো তার স্ত্রীর মুখখানি রক্তিম হয়ে উঠেছে—সে ও তীব্র কটু একটি উত্তর খুঁজছে। সে বলে উঠলো, হ্যাঁ-গো, চুপ করে শুধু শুনে যাও। দুঃখে ওর মাথার ঠিক নেই আজ। তারপর মুখের খড়টি আর একটু চিবিয়ে নিয়ে মৃদুভাবে বলল, সত্যিই আমি খুব ঢিলে—একথা আমি জন্মাবধি বহুবার শুনেছি। তুমি নিজেও তো একথা আমায় বলেছ, গিন্নী! হ্যাঁ, আমি ঢিলে বৈকি! সে তার চারদিকে প্রতিবেশীদের পানে তাকালো। একজন বলে উঠলো, হ্যাঁ, ওগো ভাল মানুষটি! তুমি অত্যন্ত ঢিলে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই —বুদ্ধিতে ঢিলে, কথায় ঢিলে।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে চিবানো খড়টি থু-থুর সংগে ফেলে দিয়ে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে আর একটি ধানের খড় টেনে নিয়ে সে বলল, হ্যাঁ।

ঝগড়া হলোনা তাই। কিন্তু মার মন শান্ত হলোনা। ভিড়ের মধ্যে দন্ডায়মানা সেই বিধবার উপর হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো। বিধবাটি হাঁ করে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। তাকে দেখে মার ক্ষোভ ও বেদনা গভীর মনস্তাপের সংগে মিশে যুগপৎ নতুন করে বেরিয়ে এলো। দৌড়ে বিধবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মা তার বড় মুখখানি দু'হাতে নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগলো, চুলের মুঠি ধরে টানতে লাগলো, চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে বলল, তুই জানতিস্ ঐ লোকগুলো কেমন, জানতিস্ ছেলেটা হাঁদা। সে-সব গোপন করে তুই বলেছিলি—আমাদের মতো সমভূমিতে তারা থাকে, আমায় তো বলিস্‌নি—সেই পাথরের রাস্তা বেয়ে আমার মেয়েকে তাদের জন্য জল আনতে উপরে-নীচে যেতে হবে। তুই-ই এর মূল। দিব্বি করছি আমি, এর একটা শোধ না

নিয়ে আমি ছাড়বোনা—কিছুতেই ছাড়বোনা।

সে সেই বিধবাকে মারলো। মার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী সে তার যৌবনেও ছিলনা। বড় ছেলে ছুটে গিয়ে তাদের ছাড়িয়ে দিল। ছোট ছেলে উঠে তার দাদার সংগে মিলে মাকে ধরে রাখলো। নিজের সম্মানের খাতিরে সেখানে থাকা বিধবাটির পক্ষে প্রয়োজন হলেও সে দূরে সরে গেল তাড়াতাড়ি। নইলে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কতদূর গড়াতো বলা যায়না। বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে বিধবা দেখলো—তাদের দু'জনের মাঝখানে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা তখনও ঠিক সেই অবস্থায়ই রয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে বলল, হ্যাঁ, কিন্তু তোমার ঐ অন্ধ মেয়েটিকে কোন্ ভাল লোকটি নিত, শুনি? তোমার উপকার করে শেষকালে এই প্রতিদান পেলাম। বুক চাপড়ে মুখের দাগগুলি দেখাতে দেখাতে বিলাপ করে সে আরও ভাল করে কোন্দলের আয়োজন করতে লাগলো।

কিন্তু জনতা তাকে সরিয়ে দেয়। ছেলেরা মাকে এক রকম জোর করে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল। সে তখনও কাঁদছিল। অবশেষে সে হায়রাণ হয়ে পড়লো। ছেলেরা তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখলো। পুত্রবধূ তার মুখ ধোবার জন্য এক ঘটি গরম জল নিয়ে এলো। ঝগড়াটা যখন চলছিল তখন সে জলটা ফোটাচ্ছিল। সে জলে গামছা ভিজিয়ে মার হাতমুখ মুছে দিল। তাকে গরম চা ঢেলে দিল, তার খাবার এনে রাখলো।

মা তারপর আস্তে আস্তে শান্ত হয়। কান্না কম্‌লে একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু চা খেয়ে সে খাবার খায়। চারদিকে চেয়ে বলল, ছোট খোকা কোথায়?

যুবক এগিয়ে এলো তখন। মা দেখলো—সে যেন কেমন বিবর্ণ ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে। প্রশান্ত প্রসন্ন দৃষ্টি আর নেই। মা তাকে টেনে তার পাশে বসালো। বলল, আজকের রাত্তিরটা এখানে আমার পাশে ঘুমো বাবা—এই বিছানায় ঘুমাতো তোর ছোট্ট বোনটি। আজ রাত্তিরে তার শয্যাটি আমি শূন্য রাখতে পারছিনা। ছেলেটি তাই করলো। শোবার সংগে সংগেই সে গভীর নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লো।

সারাটি ঘর নিঃশব্দ হয়ে গেল। তবু, মা ঘুমাতে পারেনা অনেকক্ষণ ধরে।

একেবারে শক্তিহীন হয়ে পড়েছে সে। দীর্ঘপথ গাধায় চড়ে যাবার ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছে দেহ, অন্তর হয়েছে অবসাদ-খিন্ন। সুধু সুপ্তিমগ্ন ছেলেটির গভীর নিশ্বাসই তাকে তৃপ্তি দিচ্ছিল। নবজাত স্নেহে ও চিন্তায় তার কথা মনে হলো মার ঃ আরও অনেক কিছু করতে হবে! ও-ই তো আমার শেষ অবলম্বন। ওর বিয়ে দিতে হবে, বাড়িতে একটি নতুন ঘর তৈরী করতে হবে! তার ও তার বৌয়ের জন্য একখানি আলাদা ঘর চাই, তারপর ছেলে-পিলে হ'লে—। হ্যাঁ, একটি বেশ ভালো, সুস্থ সবল মেয়ে আনতে হবে, যেন বাড়িতে ছেলেপিলে হয়।

মার মনে হয়—অন্যগত শিশু-সন্তানের এই স্বপ্নই তার ভবিষ্যৎ জীবনের একমাত্র আনন্দ।

কিন্তু এ আনন্দটুকুও দীর্ঘকাল স্থায়ী হলোনা। আবার সেই পুরানো রোগটি তাকে ধরলো। সে মৃতের মতো দুর্বল হয়ে গেল—এত দুর্বল যে কাঁদতেও পারেনা। অনেকদিন ধরে সে শয্যায় পড়ে রইলো। তার দেহ ও মন ক্ষত-বিক্ষত। বিলাপ বা আশা—কিছুরই শক্তি নেই আর তার সকল দুঃখ ও আনন্দটুকুও তাই স্থগিত রইলো। তার প্রতিবেশীরা, বড়-জা আরও অনেকে তার কাছে উপদেশ দিতে এলো। সবাই বলল, মেয়েটি তো অন্ধ ছিল। বিধির বিধান কেউ লঙ্ঘন করতে পারিনা আমরা। এ জীবনে কোন কিছুরই জন্য দুঃখ করা অনর্থক!

সেদিন বড়-জা মাকে বলল, তোমার সোনার চাঁদ ছেলেদের কথা একবার চিন্তা কর। ক্ষীণকণ্ঠে সে উত্তর দিল, হ্যাঁ, কিন্তু আমার বড় ছেলের বৌ বন্ধ্যা, আর ছোট ছেলেটি বিয়েই করবে না। বড়-জা সাগ্রহে বলল, বড় ছেলের বৌকে আরও দু'একবছর সময় দাও। দেখেছি—অনেক সময় সাত বছর নিঃসন্তান হয়ে থাকবার পর স্ত্রীলোক স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে সুসন্তান প্রসব করে। তাছাড়া, তোমার ছোট ছেলে হয়তো কাউকে ভালবাসে, তাই সে বিয়ে করছেনা। সেই মেয়েটিকে একবার দেখা দরকার—ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া যায় কিনা। হ্যাঁ, সত্যিই সে কারো প্রেমে পড়েছে—আজকালকার ছেলেরা এমন পড়েই থাকে। আমি জোর গলায় বলতে পারি—বিয়ে করবেনা এমন লোক পৃথিবীতে থাকতেই পারেনা। কিন্তু

মা ফিস্ ফিস্ করে বললে, তোমার কানটা একবার আমার ঠোঁটের কাছে কিন্তু মা ফিস্ ফিস্ করে বলল, তোমার কানটা একবার আমার ঠোঁটের কাছে আন তো, বোন্। তা-ই করলো বড় জা। মা তার কানে কানে বলল, দুঃখ আমার পিছু নিয়েছে, সবাই খারাপ হচ্ছে আমার। মাঝে মাঝে মনে হয়—দেবতারা বুঝি আমার পুরানো পাপের কথা জেনেছে, ঈশ্বর হয়তো আমায় নাতির মুখ দেখাবেনা।

একথা ভাবতেই সে চোখ বুজলো, নিমীলিত দুটি চোখের পাতা বেয়ে বড় বড় দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তার মনে পড়ে গেল সকল পাপের কথা —একমাত্র বড়-জা ছাড়া আর কেউ জানেনা, শুধু সেই পাপটি নয়। মনে পড়লো, কতবার সে বলেছে—সে বিধবা হয়েছে, কত চিঠি সে লিখিয়েছে, কত মিথ্যেই না বলছে। মিথ্যা-ভাষণকে সে পুরোপুরি পাপ মনে করেনা, এক আধটু মিথ্যে সবাই বলে থাকে—বিশেষ করে সম্মানের খাতিরে। কিন্তু, সে তার স্বামীর মিথ্যা মৃত্যুর কথা বলেছে—এই তো তার পাপ! মার মনে হলো—সে নিজেই যেন হাত বাড়িয়ে স্বামীর মরণ টেনে এনেছে, কেউ তাকে গ্রহণ করবে আশায় তার মৃত্যু সম্বন্ধে এই মিথ্যা প্রচার করেছে। সুস্থ অবস্থায় ভুলে-থাকা এমনি সব পুরানো পাপের কথা তার মনে পড়লো। আজ সে দুর্বল ও বেদনার্ত। সে কাউকে জানাতে পারবেনা একথা। এ দুঃখ নিজেকে সহ্য করতে হবে। পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে তার সুনাম যথেষ্ট। তাই তার বেদনা হলো চরমতম।

মার মনখানি এত দমে গেল যে শুধু ছোট ছেলেটিকে কাছে পাওয়া ছাড়া আর কিছুতেই সে আনন্দ পায়না। বড়ছেলের বৌ সযত্নে তার দেখা-শোনা করে, বেশ গরম গরম খাবার এনে দেয়, এমনকি দু'একমাইল হেঁটে গ্রামান্তর থেকে তার জন্য শুকনো দই কিনে আনে। মা সকল কাজে তার উপর নির্ভর করে, তবু পুত্রবধূকে দেখে সে তৃপ্তি পায়না। সে সাধ্যমত সতর্কতার সংগে মার সেবা করে, তবু মা প্রায়ই তাকে তিরস্কার করে' বলে,—তার হাত খুব ঠান্ডা, মুখখানি কেমন ফ্যাকাসে, আধ রুষ্ট ও শিশুসুলভ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে। বন্ধ্যাত্বের জন্য সে আর পুত্রবধূর দোষ দেয়না। সে-সম্বন্ধে কোন কথাই বলেনা। অস্পষ্টভাবে মনে হয়—হতে পারে তার নিজের

পাপই এর কারণ।

মা রোগশয্যা ছেড়ে উঠলো। শরতের অবসানে তার যন্ত্রণার উপশম হলো। সারাদিন সে রইলো নিরানন্দ, কিন্তু শান্ত। মেয়ের কথা ভাবতে পারলো, তার যন্ত্রণার তীব্রতা হ্রাস পেলো। আপনমনে বলল, ওদের কথাও সত্যি হতে পারে। হয়তো ভালোই হয়েছে—মেয়েটি মারা গেছে। মৃত্যুর চেয়েও খারাপ আরো অনেক জিনিসই-তো রয়েছে!

সে এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলো।

পাড়ার সকলে মিলে তাকে সাহায্য করলো। তার সামনে—এমনকি অনুপস্থিতিতেও কোথাও তার মেয়ের নাম উচ্চারণ করলোনা। অন্ধ একটি মেয়ের মধ্যে স্মরণ করবার মতো কিছুই নেই। আর, সর্বত্রই তার মতো অন্ধ মেয়ে রয়েছে। প্রথমে, সে কষ্ট পাবে ভেবে মার সামনে তারা মেয়ে সম্বন্ধে কিছু বলতো না, তারপর তাতে নতুন কিছুই নেই বলে সে-প্রসঙ্গ আর আলোচনাই করতোনা। তাছাড়া, মেয়েটির জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে। তাই অন্যপ্রসঙ্গ এসে পড়তো।

সেই বিধবা সন্তর্পণে একবার মার কাছে গেল, ভাবলো—একা তার কাছে ঘেঁসবেনা। কিন্তু মা যখন বিছানা থেকে উঠলো আর বিধবা দেখলো কেমন ক্ষীণ হয়ে গেছে মা—তখন প্রফুল্ল হয়ে তাকে আগের মতো সম্ভাষণ জানালো। মা অতীতের উপর যবনিকা টেনে দিল। তবু, মাঝে মাঝে অতীত মুখর হয়ে ওঠে তার অন্তরে।

= আঠারো =

সে-বছর বসন্তকালে ছোট ছেলেটি বাড়ি এসে বলল, ক'দিন বাড়িতে থাকতে এলাম, মা; জানিনা কদ্দিন—তবে অন্ততঃ যতদিন ফিরে যাবার ডাক না আসে। তাই মার মনে হলো, এবার বুঝি তার অন্তর এতটুকু তৃপ্ত হবে! কিন্তু মাকে আনন্দ প্রকাশ করতে দেখে ছেলে কোন উত্তর দিলনা, তেমন প্রফুল্ল দেখা গেলনা তাকে। একেবারে নীরব রইলো সে। আগের মতো সে গান গায়না বা নাচেনা, তেমনি নির্ভীকভাবে কথাও বলছিলনা। মার আশঙ্কা

হলো—হয়তো তার অসুখ করেছে কিংবা কোন একটা গোপন ব্যাপারে সে বিব্রত হয়ে পড়েছে। এ আশঙ্কার কথা বড়-জাকে জানালো। সে মৃদুভাবে বলল, ছেলে এখন বড় হচ্ছে কিনা। আচ্ছা, ওর এখন কত বয়স হোল? সে আমার পঞ্চম সন্তানের সমবয়সী, তাই না? আমার মেয়েটির বয়স এখন একুশ—বাইশের কাছাকাছি, চার বছর হলো তার বিয়ে হয়েছে। হ্যাঁ, একুশ বছরে ছেলে সাবালক হয়, তখন আর নাচ-গানে মেতে থাকা উচিত নয়। তবে আমার মনে পড়ে—শেষ বার যখন দেখি তখনও তোমার স্বামী নাচ-গান করত। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলল, হ্যাঁ। স্বামীর স্মৃতিটুকু যেন তার এই ছোট ছেলেটির সংগে মিশে অতি অস্পষ্ট হয়ে গেছে। সময় সময় মনে পড়লেও—তার মুখখানি সে আলাদাভাবে কল্পনা করতে পারেনা, চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছেলের মুখ-খানি।

ন'দিন পরে ছোট ছেলেটি যেমন তাড়াতাড়ি এসেছিল ঠিক তেমনি তাড়াতাড়ি আর প্রায় লুকিয়ে চলে গেল। কেউ জানতে পারলোনা—তার যাবার ডাক কেমন করে তার কাছে এসে পৌঁছলো। চামড়ার ছোট্ট ব্যাগটির মধ্যে তার ক'টি জামা পোষাক পুরে সে চলে গেল। তাকে যেতে দেখে মা দুঃখ করে বলল, আমি তো ভেবেছিলাম, তুই থাক্‌বি বলেই এসেছিস্‌, বাবা। ছেলে উত্তর দিল, হ্যাঁ মা, আবার আসবো আমি। বোধ হলো, মনে মনে সে যেন আনন্দিত, যাবার জন্য ব্যাকুল।

কিছুদিন থেকে সে বেশ প্রফুল্লেই আছে। অতর্কিতে আসে, আবার চলে যায়। এক-একদিন বগলে কাগজের তাড়া নিয়ে আসে, বাড়িতে থাকে। অলসভাবে দু'একদিন পাড়ার এখানে-ওখানে ঘুরে কাটায়, চায়ের দোকানে বসে বলে, দিনকাল খারাপ পড়েছে, সুবিচার নেই, এক মহা দিনে সবই এর চেয়ে ভালো হবে। সবাই পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, শোনে, ভাবে—তাতে কী হবে তাদের? তৈলাক্ত মাথা চুলকাতে চুলকাতে সরাইওলা মন্তব্য করে, কথাগুলো ডাকাতের কথার মতো ঠেকছে না কি! কিন্তু মা ও বড় ছেলেটির খাতিরে প্রতিবেশীরা কিছু বলেনা, ভাবে, সে এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক, বিয়ে করে সংসারী হলেই তার জ্ঞান আরো বাড়বে।

বাড়ি এসেও সে হয়তো চুপ করে বসে থাকে, কখনও দাদার কাজে সাহায্য

করতে এগিয়ে যায়। তখন দাদা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, ধন্যবাদ! তোমার সাহায্য ছাড়াই তো আমি এ কাজ করছি।

কিছুদিন থেকে বড় দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে সে। সে উদ্ধতভাবে দাদার দিকে চায়। কিন্তু ঝগড়া না করে মাটিতে থু-থু ফেলে ধীরে সহাস্যে বলে, আর তা-ই তুমি করবে, দাদা। তার মেজাজ এমনি শান্ত দেখে দাদা তার প্রতি ঘৃণায় ফেটে পড়ে, ইচ্ছে হয় তাকে চিরদিনের জন্য দূর হয়ে যেতে বলে। কিন্তু, নিজের ভাইকে একথা বললে পাড়াপড়শীরা তাকে ভাল বলবেনা।।

মা ছোটছেলের কোন দোষই দেখতে পায়না। সে তার কাছে বড় বড় কথা বলে, দাদার বিরুদ্ধে অনুযোগ করে ঃ এসব ছোট ছোট জমির মালিক—যাদের খাজনা দিতে হয়, এসব ক্ষুদ্র জীব যারা এত নগণ্য অথচ গর্বিত, তাদেরই জন্য আসছে সেই দিন; তখন সব জমি হবে সাধারণের সম্পত্তি, নিজের বলে কারো কিছু থাকবেনা।

শুধু প্রথমটা ছাড়া আর কোন কথাই বুঝতে পারেনা মা। চিন্তাকুলভাবে বলে, হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস, তোর দাদা আর তার বন্ধ্যা বৌ-টির মনেও খুব অহংকার। এই ছেলের প্রত্যেকটি কথা মার কাছে সারগর্ভ মনে হয়। তাই সে এখন তাকে এমনি করে আঁকড়ে ধরেছে। সে বাড়ি এলেই মার উৎসব লেগে যায়। সম্ভব হলে যে ক'টা দিন সে থাকে, সেই ক'টি দিনকে সে ছুটির দিন করে নিত, তার জন্য দু'একটি মুরগী মারতো, অন্যান্য দিনের চেয়ে ভালো রান্না করতো। কিন্তু সে তা পারে না। মুরগীগুলো এখন তার বড় ছেলের। দু'টি একটি মুরগী বাসা থেকে চুরি করে ছেলের জন্য এনে রাখা ছাড়া আর কিছুই সে করতে পারেনা। ছেলে এলে সেগুলো গরম জলে দিয়ে ছেলের জন্য একটু "সুপ্" করে দিতে পারে গোপনে, তার সঙ্গে উদ্বৃত্ত চিনিটুকু মিশিয়ে একটা খাদ্য রেঁধে দিতে পারে।

একটা ভাল জিনিষ পেলে, কিংবা সময় কাটাবার জন্য কোন প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে কারো কাছ থেকে একটি পীচ ফল কিংবা শুকনো খেঁজুর অথবা এক টুকরো কেক্ নয়তো অন্য কোন কিছু খেতে পেলে সে ছেলের জন্য রেখে দেয়।

এই সামান্য জিনিসগুলো যাতে নষ্ট হয়ে না যায়, সেদিকে নজর রাখতে তার

অনেকখানি সময় কেটে যায়। যতদিন সম্ভব ততদিন সে রেখে দেয় সেগুলো। ছেলে যখন আসতে দেরী করে আর জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম হয়, তখন সেগুলো তাকেই খেতে হয়। সেই জিনিসটি যদি তার প্রিয় হয়, তবু সে খেতে আনন্দ পায়না, আসল স্বাদটুকু গ্রহণ করতে পারেনা। যে-ড্রয়ারে সেই খাবারগুলো রাখে প্রায়ই সেটি খুলে আঙগুল দিয়ে সেখানকার ছোট্ট ভাণ্ডারটি উল্টে-পাল্টে দেখে, ভাবে—সে আসছেনা। সে নেই এখানে। আমার যদি একটি নাতি থাকতো—ছেলে না এলেও খাবারটা নাতিকে খাওয়াতে পারতাম। ছেলে না এলে আমার কাছে যে আর কেউ থাকেনা! মা রোজ অনেকক্ষণ ধরে বসে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে তাকে দেখবার আকুল আকাঙ্ক্ষায়, কারো জামার কোণা দেখা গেলেই যথাসম্ভব ক্ষিপ্র গতিতে দৌড়ে যয়। ছেলে এসেছে দেখলেই তার মসৃণ হাতখানি নিজের শুকনো হাতের মধ্যে টেনে নেয়। তাকে ঘরে নিয়ে যায়, পুত্রবধূ তারই জন্য যে চা রেখেছে তা ঢেলে দেয়, খুসী হয়ে ভাণ্ডার থেকে সেই গচ্ছিত খাবার বার করে দিয়ে সস্নেহে তার দিকে চেয়ে থাকে। ছেলেটি সব চেয়ে ভালো খাবারটি বেছে নেয়। কখনও সে নাক সিঁটকে বলে, কেক্‌টি খেলে অসুখ করবে মা, কখনও বা বলে, চালের গুঁড়োর এমনি শুকনো কেক্‌ আমার ভালো লাগেনা।

মা তখন সখেদে জিগ্যেস করে, খুবই শুকনো হয়ে গেছে বুঝি, বাবা? আমি ভেবেছিলাম—এটা তোর ভালো লাগবে। ছেলে না খেলে জিনিসটা নষ্ট না করে মা নিজে খেয়ে ফেলে। জিনিসটা ছেলের পছন্দ হলোনা বলে দুঃখ জাগে মনে।

ছেলের যা একটু খাওয়া হলে মা তার কথা শুনতে বসে। মার সকল প্রশ্নের জবাব সে খোলাখুলিভাবে দেয়না। বেশি পীড়াপীড়ি করলে চলে যাবার ব্যস্ততা দেখায়। মা তাই শিখেছে—ছেলেকে কিছু জিগ্যেস না করা, আর ছেলেও শিখেছে কেমন করে মাকে নিবৃত্ত রাখতে হয়। বুড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে মা সহজেই সব কিছু ভুলে যায়, তাকে ভুলিয়ে রাখা আরো সহজে। মাকে ভোলাবার জন্য সে বলে—তার নিজের চোখে-দেখা অদ্ভুত সব ঘটনার কথা ঃ এক সাপুড়ে একটি সাপকে তার গলার উপর উঠতে দিয়ে আবার লেজ ধরে টেনে নামিয়ে এনেছে। একটি স্ত্রীলোক তার দুমাথাওলা ছেলেকে

এক এক পয়সা নিয়ে সকলকে দেখিয়েছে। শহরের দ্রষ্টব্য এমনি আরো সব বিচিত্র দৃশ্যের কথা সে বলে।
তার কথায় বৃদ্ধা মা আনন্দ বোধ করে। তাই সে চলে গেলেই কাঁদে। এসব তাজ্জব কাহিনী সে তার ছেলে ও পুত্রবধূকে না বলে পারেনা।
সেদিন তার বড় ছেলে মাঠ থেকে ফিরে একটি মাটির গামলার উপর ঝুঁকে পড়ে গা ধুচ্ছিল। তখন মা তাকে এমনি একটি কাহিনী বলতে গেল। ভিজে মুখে তাকিয়ে সে তিক্তভাবে বলল, ও তোমায় খাওয়ায়না, তোমার কিছুই করেনা, ভিখিরির মত দু'একটা টাকা ছুঁড়ে দেয়—এইমাত্র। এখানে সে আসে, খায়, নিড়ানীতে কিংবা লাঙলে কোনদিন হাতই লাগায়না, বসে বসে তোমায় এসব গল্প শোনায়। সে তোমার কাছে বেশি—
মুখ নীচু করে সে অবার সশব্দে গা ধোয়া আরম্ভ করে, শোনেনা—উত্তরে মা কি বলতে চায়।
কিন্তু তার ছোট ছেলেটি সম্বন্ধে সে সুধু এইটুকু মাত্র জানে। সে জানে, তার দেহখানি নমনীয়, সুন্দর; সোনার মতো তার গায়ের রং—শহুরেদেরই এমনি রং হয়ে থাকে, ঘন পিঙ্গল তার বর্ণ পাড়াগেঁয়েদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। সে জানে, কেমন করে ছোট্ট তার আঙুলগুলোতে নখ গজালো। সে জানে, তার দাঁতগুলো শাদা, চুল কালো, তৈলাক্ত—চক্‌চকে, আকর্ণলম্বিত। জানে, তার কোঁকড়ানো চুলগুলো সে কেমন করে মাথা নেড়ে চোখের উপর থেকে সরায়।
হ্যাঁ, মা জানে—ভালোবাসে তার সহজ হাসি, দৃপ্ত দুটি আঁখি। সে ভালবাসে—অর্থের প্রতি ছেলের ঔদাসীন্য। কটিবন্ধে যা থাকে সবই সে মাকে দেয় বার করে। নিজের কাছে না থাকলে মার কাছে চায়। ছেলের কাছ থেকে নেবার চেয়ে তার হাতে গুঁজে দিতেই মা ভালবাসে বেশি। ছেলে তাকে যা দেয় সবই সে রেখে দেয়। প্রয়োজন মত আবার তাকে দিয়ে দেয়। সে জানে—তার ছোট্ট ভাণ্ডারটির এই হ'ল সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার।

= উনিশ =

একদিন আসবে বলেছিল, সেদিন সে এলোনা। আর—সে যে নিশ্চয় আসবে একথাও মা বুঝলো কেমন করে? মাত্র তিন দিন আগে সে গোপনে রাত্রিবেলা এসেছিল মাঠের রাস্তা ধরে, গ্রামের ভিতর দিয়ে নয়। এসে দরজায় মৃদু আঘাত করেছিল। ডাকাত ভেবে দরজা খুলতে ভয় পেয়েছিল মা। সে প্রায় চিৎকার করছিল আর কি! এমন সময় শুনলো ছেলের কণ্ঠস্বর। নীচু-সুরে সে ঘন ঘন ডাকছিল। ভাগ্যিস, শয্যার পাশে মুরগীগুলো ছিল। তাদের পাখার ঝাপটানিতে বড় ছেলে ও তার স্ত্রীর কানে সেই ডাক পৌঁছলো না।

মা তাড়াতাড়ি উঠলো। গায়ে জামা টেনে দিয়ে, হাতড়ে মোমবাতি খুঁজে নিয়ে ধীরে ধীরে দরজা খুললো। সে জানতো—এমনি করে, এত রাত্রিতে নিশ্চয় কোন একটা গোপন কাজে সে এসেছে। আরও দু'জন যুবক ছিল তার সঙ্গে। ক'দিন ধরে সে যেমন কালো পোষাক পরছিল, ঠিক তেমনিই তাদের পোষাক। তাদের সঙ্গে ছিল কাগজ ও দড়ি দিয়ে মোড়া একটি বড় পুঁটলি। মা হাতে আলো নিয়ে দোর খুলতেই, ছেলে আলোটা নিবিয়ে দিল। আকাশের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় বাতি ছাড়াও বেশ দেখা যাচ্ছিল। ছেলেকে দেখে খুসী হয়ে মা অস্পষ্ট হর্ষধ্বনি করলো। ছেলে ফিস্ ফিস্ করে বলল, দেখ মা, আমার একটা জিনিস তোমার বিছানার নিচে শীতের জামা কাপড়ের সঙ্গে রাখতে হবে। কাউকে বলোনা, কেউ যেন জানতে না পারে ওটা এখানে আছে! আমি এসেই আবার জিনিসটা নিয়ে যাবো।

একথা শুনে মার মন কেমন যেন শঙ্কাকুল হলো। চোখ দুটি মেলে গম্ভীর ভাবে চুপি চুপি বলল, এ কোন খারাপ জিনিস তো নয়, বাবা! আর কারো জিনিস আনিস্নি তো!

তৎক্ষণাৎ সে সহজভাবে বলল, না—না, মা—দিব্যি করে বলছি—ডাকাতি করে কিছুই আনিনি আমি। সস্তায় পেয়ে কতকগুলো ভেড়ার চামড়া কিনে আনলাম। কিন্তু এজন্য, দাদা সব তাতে যেমন দেয় তেমনি, আমার দোষ দেবে। এগুলো আর কোথাও রাখবার যায়গাও নেই। খুব সস্তায় কিনেছি। শীতে

তোমার কোটের জন্য এর একটা দোব, এবার শীতে আমরা সবাই ভালো পোষাক পরবো।

গভীর আনন্দ অনুভব করলো মা। বিশ্বাস করলো—সে ডাকাতি করেনি। ছেলের সঙ্গে সামান্য একটা গোপন ব্যাপারের অংশভাগিনী হওয়া তো তার পক্ষে আনন্দের। বলল, আমার বিশ্বাস কর্, বাবা! আমার ঘরে এমন অনেক জিনিস আছে, যার কথা তোর দাদা ও বৌদি জানেনা।

লোক দুটো পুঁটলিটি ঘরের ভিতর এনে নিঃশব্দে বিছানার নীচে রাখলো। মুরগীগুলো একবার ডেকে উঠে তাকালো, মোষটি জেগে রোমন্থন করতে লাগলো। ছেলে কিন্তু বাড়িতে রইলোনা। তার ব্যস্ততা দেখে মা বলল, আমি এটা নিরাপদে রেখে দোব। কিন্তু জিনিসগুলো কি বাতাসে রাখতে হবেনা, বা রোদে দিতে হবেনা—যাতে ঘুণ না লাগে—

সে তেমনিভাবে বলল, এ তো দু'একদিনের জন্য, মা। আমরা একখানি বড় ঘরে উঠে যাচ্ছি। তখন আমার নিজের একটা আলাদা ঘর হবে, অনেক জায়গা থাকবে সেখানে।

অনেক জায়গার কথা শুনে মার মনে জেগে উঠলো—ছেলের বিয়ের কথা। একথাটি যে সর্বদাই তার মনখানি ঘিরে রয়েছে! সে তাকে টেনে ঐ দু'টি লোকের কাছ থেকে একটু দূরে নিয়ে গেল, তার দিকে চাইলো মিনতিভরা দৃষ্টিতে। এই জিনিসটাই মার ভালো লাগেনা—ছেলে বিয়ে করতে রাজী নয়। মা জানে, রক্তের উত্তাপ কেমন, জানে—এই ছেলের মধ্যে রয়েছে তার নিজের যৌবনে যেমন ছিল তেমনি উত্তাপের চিহ্ন। সে জানে, যে-কোন উপায়ে এ উত্তাপের নিবৃত্তি প্রয়োজন, এ তাপ নষ্ট হতে দেওয়াই তার আপত্তি। স্বাস্থ্যবতী একটি কুমারীর সঙ্গে তার বিয়ে হলে ভালো হয়, তাহলে পৌত্রাদি হবে তার।

এখন সে ব্যস্ত—চলে যাবার জন্য ব্যস্ত, দরজার অদূরে ছায়ায় দু'টি লোক অপেক্ষমান। তবু, মা ছেলের হাতের উপর নিজের হাতখানি রেখে অনুনয়ের সুরে অনুচ্চকণ্ঠে বলল, কিন্তু বাবা, তোর যদি এত জায়গা হয়, তাহলে তোর জন্যে একবারে সেরা একটি মেয়ে খুঁজে নেব আমি। তোর নিজের যদি কেউ জানা থাকে, তা'ও আমায় বল্। আমি বড়জাকে বলবো, সে যেন সম্বন্ধ ঠিক

করে দেয়। যাকে তোর পছন্দ, তাকে যদি আমারও পছন্দ হয়—তোকে বাধা দোবনা আমি।

যুবক ঘাড় নেড়ে চোখের উপর থেকে লম্বা চুলগুলো সরিয়ে নিয়ে দরজার দিকে চাইলো, মার হাতটি ছাড়াবার চেষ্টা করলো। কিন্তু মা তার হাতখানি জোরে ধরে রাখলো। সানুনয়ে বলল আবার, কেন আমি নাতির মুখ দেখতে পাবোনা? তোর বৌদিটা বন্ধ্যা, তুই ছাড়া আর কেউ আমায় নাতি কোলে করাতে পারবেনা। তুই ঠিক্ তোর বাবার মতো। আমি বেশ জানি—সে কেমন ছিল।

নীরবে হাসলো যুবক। চোখের উপর থেকে তার ঝক্‌ঝকে কেশরাজি সরিয়ে অর্ধবিস্মিতভাবে বলল, তোমার মতো বৃদ্ধারা সুধু বিয়ে আর সন্তানের জন্ম ছাড়া আর কোন কিছুরই চিন্তা করেনা। আমরা—আধুনিক যুবকেরা ও-সব ভাবনা ছেড়ে দিয়েছি।......তিনদিনের মধ্যেই, মা—

টান দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে সেই লোক দুটির সঙ্গে চলে গেল ক্ষীণালোক মাঠের উপর দিয়ে।

তিনদিন চলে গেল। সে এলোনা।

আরও তিনটি দিন এলো, গেল।

গেল—আরও তিনটি দিন!

মা ভীত হলো। ভাবলো, ছেলের কোন বিপদ হয়েছে। কিন্তু এখন, এই শেষ বছরে, সে আর শহরে যায়নি। তাই, সে অপেক্ষা করতে লাগলো। খিটখিটে হয়ে উঠ্‌ল সে। পাছে তার পুত্রবধূ পর্দা সরিয়ে বিছানার নিচে ঐ পুঁটলিটি দেখে ফেলে—এই ভয়ে আর কাউকে নিজের আতঙ্কের কারণ জানাবার সাহস হলোনা।

সেদিন রাত্রিতে শুয়ে ছিল সে। মনখানি ছিল গভীর চিন্তায় আকুল। বিছানা থেকে উঠে মোমবাতি জ্বালিয়ে ঝুঁকে পড়ে পর্দা সরিয়ে সে একবার বিছানার নিচে দেখলো। সেখানেই রয়েছে পুরু কাগজে মোড়া জিনিসগুলো—বেশ বড় চৌকো করে শণের দড়ি দিয়ে বাঁধা। টিপে দেখলো, ভিতরে শক্ত কি একটা জিনিস রয়েছে—ভেড়ার চামড়া নয়, নিশ্চয়। আপনমনে বলল, ভেড়ার চামড়া হলে খুলে রোদে দেওয়া দরকার। কোনমতে ঘুণ ঢুকলেই দামী

চামড়াগুলো নষ্ট করে ফেলবে। কিন্তু পুঁটলিটি খুলবার সাহস হলো না, সেখানেই রইলো সেটা।

তবু, এলোনা তার ছেলে।

একমাস গেল কেটে। মা প্রায় আত্মহারা হয়ে উঠলো। মনের ভয় খানিকটা লাঘব করবার মতো একটি ঘটনা ঘটল। নইলে সে একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়তো।—তার পুত্রবধূ সন্তান-সম্ভবা! এখন সে বিভোর হয়ে আছে সেই স্বপ্নে। সুদীর্ঘ শৈথিল্যের পর নারী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে তার কর্তব্য সম্পাদন করেছে!

মা সেদিন ঘরের দরজায় বসেছিল। বড় ছেলে গর্বভরে তার কাছে গিয়ে মৃদু হাস্যে বলল, তোমার নাতি হবে, মা! দীর্ঘদিনের গভীর ধ্যান ভেঙে গেল মার। সে চোখ দুটি ছোট করে তার দিকে চাইলো। একটু খিট্‌খিটে মেজাজে বলল, বোকার মতো কথা বলিস্ তুই! তোর বৌ তো পাথরের মতো ঠাণ্ডা, শুকনো। জানিনা, আমার ছোট ছেলেটি কোথায় আছে, কী করছে। সে বিয়ে করবে না, বিয়ে না করেই থাকবে।

বড় ছেলেটি একটু কেশে নিল, তারপর খোলাখুলিভাবে বলল, তোমার পুত্র-বধূ সন্তান-সম্ভবা।

মা প্রথমে বিশ্বাস করলোনা সে-কথা। বড় ছেলের দিকে একবার চেয়ে চিৎকার করে উঠে দাঁড়ালো সে, না—না, আমি কখনও তা বিশ্বাস করবো না! কিন্তু ছেলের মুখ দেখে মা বুঝলো, কথাটি সত্য। সে উঠে তাড়াতাড়ি হেঁসেলে ঢুকলো। দেখলো, পুত্রবধূ পেঁয়াজ কাটছে। তার দিকে চেয়ে সে বলল, এতদিনে তা'হলে তোমার কিছু হলো? মৃদু ঘাড় নেড়ে পুত্রবধূ তার কাজ করতে থাকলো। তার বিবর্ণ মুখখানি লাল্‌চে হয়ে উঠলো।

মা বুঝলো, খবরটা সত্যি। জিগ্যেস করল, কবে জানলে? যুবতী পুত্রবধূ উত্তর দিল, একমাসেরও কিছু বেশি হবে!

একথা তাকে বলা হয়নি বলে মা রুষ্ট হয়ে উঠলো। মা তার পোষাকটি আছ্‌ড়ে বলল, আমায় বলনি কেন? এমনি একটি খবরের জন্য এই দীর্ঘকাল আশায়, বেদনায়, তৃষ্ণায় কে করেছে প্রতীক্ষা? একমাস! তোমার মতো এমন নিষ্ঠুর স্ত্রীলোক না হয়ে যদি অন্য কেউ হ'তো তা'হলে জানবার প্রথম

দিনেই আমায় এ খবরটি দিত।

হাতের ছুরিটা নামিয়ে পুত্রবধূ সতর্কতার সঙ্গে বলল, বলিনি, সুধু এই ভেবে যে—যদি আমার ভুল হয়ে থাকে, তাতে তোমার মনে আরো বেশি কষ্ট হবে।

কিন্তু মা তা মানবে কেন? থু-থু ফেলে সে বলল, বেশ—বুঝলাম; কিন্তু আমার নিজের তো এতগুলো ছেলেপিলে হয়েছে, আমি কি বুঝতে পারতাম না—তুমি সত্যিই ভুল করেছ কিনা! তা নয়; তুমি মনে কর আমি শিশু, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বোকা হয়ে গেছি। জানি—তোমার মনের কথা আমি জানি। হ্যাঁ—তোমার প্রতিটি কাজে তা' প্রকাশ পায়।

পুত্রবধূ কোন উত্তর দিল না। মলিন ঠোঁট দুটো কামড়ে রেখে সে টেবিলের উপর রাখা মাটির পাত্র থেকে চা ঢেলে নিল, তারপর মাকে ডেকে দেয়ালের ওদিকে নিয়ে গেল।

মা বসে থাকতে পারলো না, চেপে রাখতে পারলো না এমনি একটা সুসংবাদ। ভাশুর ও বড়-জার কাছে গিয়ে খবরটি জানতে হবে। ওরা এখন বাড়িতেই আছে। ছেলেরাই এখন তাদের সব কাজকর্ম করে—তিনজন কাজ করে মাঠে, আর সবাই বিদেশে রোজগার করতে গেছে। তবু, ভাশুর যতটুকু পারে করে, সর্বদাই একটা-না-একটা কাজে ব্যস্ত থাকে সে। তবে আগের মতো কাজ আর করতে পারে না। তার স্ত্রী নাত্‌নাতনীদের কান্নায় জেগে না ওঠা পর্যন্ত ঘুমিয়েই কাটায় সারাদিন।

মা সেখানে গেল, নির্মমভাবে জাগিয়ে তুললো বড়-জাকে। চিৎকার করে বলল—তারই উদ্দেশ্যে, এবার থেকে আর তুমি ঠাকুমা হয়ে থাকতে পারবে না। ক'টা মাস যেতে দাও, আমারও নাতি হচ্ছে।

বড়-জা ধীরে-সুস্থে প্রকৃতিস্থ হলো, মুচকি হেসে ঘুমে শুকিয়ে-যাওয়া ঠোঁট দুটি জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিল। তারপর ছোট চোখ দুটি খুলে বলল, তাই নাকি, বোন্? ছোট ছেলের বিয়ে হচ্ছে বুঝি?

মার মনখানি বিমর্ষ হলো এতটুকু। বলল, না না, তা' নয়।

এখন গুটিপোকার রেশম ছাড়বার সময়। তাই, ভাশুর একটি বাঁশের বেঞ্চিতে বসে রেশম ছাড়াবার জন্য খড়ের দড়ি পাকাচ্ছিল। সে তেমনিভাবে বলল,

তা'হলে কি তোমার বড়ছেলের বৌ?

আনন্দ ফিরে এলো মার। খুসীভরে বলল, হ্যাঁ! আনন্দ প্রকাশ করবার জন্য সে সেখানেই বসে পড়লো। কিন্তু, সে দেখাবেনা—খুব বেশী খুসী হয়েছে সে! তাই আনন্দ গোপন করে অনুযোগের সুরে বলল, বড্ড দেরী হয়ে গেছে। এই দীর্ঘ আটটি বছর আমি অপেক্ষা করেছি। বড়লোক হলে আমি আবার ছেলের বিয়ে দিতাম। তবু, ভেবেছিলাম—বড়ছেলের দ্বিতীয়বার বিয়ে দেবার আগে ছোট ছেলেটির বিয়ে দোব। আজকাল সুন্দরী—এমনকি একটু ভালো অঞ্চলের দ্বিতীয়পক্ষের—মেয়ে পেতেও বেশ টাকা খরচ করতে হয়। আমার ছেলের বৌটি সব কিছুতেই একেবারে ঢিমে, তার মেজাজ আমার মতো রাগী নয়—সাপের মতো ঠাণ্ডা।

ভাশুর সত্যি কথাই লে। সে বলল—সাপের মতো খল নয়, কিন্তু। সে তার কাজকর্ম সর্বদা বেশ ভালোভাবেই করে আস্ছে। আগে তোমার পুকুরে পাতিহাঁস ছিল না—এখন হয়েছে, ষাঁড়টির জুড়ি মিলিয়ে দিয়েছে সে, তোমাদের সেই বাছুরটি হয়েছে, মুরগীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে—সারা বছর অগুণ্তি বিক্রি করেও দশ বারোটা সব সময় থাকে।

ঈর্ষা হলো মার। তবু বলল, না, খল নয়। কিন্তু—

বড়-জা হাই তুলে সদয়-কণ্ঠে বলল, ওর রক্ত তোমার মত গরম নয়, কিন্তু বেশ সতেজ। তোমার যখন অসুখটা থাকেনা, তুমি এদিক-ওদিক চলা-ফেরা কর, তখন আমি অবাক হয়ে যাই—তোমার চলার বেগ দেখে। আজকাল আমি তো শুধু বেঞ্চি থেকে টেবিলে আর টেবিল থেকে বিছানায় ছাড়া আর কোথাও যেতে পারি না। মার প্রশংসা করে ভাশুর বলল, আমি তো এখন আগের অর্ধেকও খেতে পারি না। এখানে বসে দেখি, তুমি বার বার খাবার পাত্রটি ভরিয়ে দেবার জন্য ডাকাডাকি করছ।

মা সন্তুষ্ট হলো এই প্রশংসায়। সৌজন্যের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ আমি আগের মতোই খেতে পারি, তিন চার বাটি এখনও খাই। খুব বেশি শক্ত জিনিস না হলে আমি খেতে পারি। সামনের দাঁতগুলো পড়ে গেছে কিনা! অসুখটা না থাকলে আমি বেশ সুখেই থাকি।

বড়-জা বলল, বুড়ো শরীরটা সত্যিই ভালো। সে ঘুমিয়ে নিল একটু।

জেগে উঠে মাকে সেখানে দেখে ঘুমন্ত হাসির সঙ্গে বলল, বলছ—একটা নাতি? আমাদের সাত-সাতটি নাত্-নাতনি হয়েছে—তা, আর বেশী কি? আবার শান্তভাবে ঘুমালো সে।......

ছোট ছেলে ফিরে না আসায় মার শূন্য দিনগুলো এই সুসংবাদে উঠলো ভরে। এই নতুন আনন্দ তার প্রতীক্ষার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করলো। মনে হলো, একদিন না একদিন তাকে আসতেই হবে। এই ধারণাকে সে সেখানেই আটকে রাখলো।

কিন্তু এ তো অবিমিশ্র আনন্দ নয়! মা ভাবলো—তার জীবনের আরো সব আনন্দের মতো এর মধ্যেও কোথায় গলদ রয়েছে, সুযোগ পেলেই তা' ব্যর্থ করে দেবে তার সব প্রফুল্লতা। যে-সন্তানের জন্ম হবে—সে যদি মেয়ে হয়? একথা মনে হতেই অস্ফুটভাবে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল,—হ্যাঁ, যদি মেয়ে হয়—তবে হবে আমার এই পোড়া অদৃষ্টেরই জন্য।

এই মানসিক উদ্বেগে তার ইচ্ছা হলো—একবার সেই জাগ্রত ঠাকুরের কাছে ধন্না দেয়। ওঁকে যদি একখানি নতুন লাল কাপড়, এক জোড়া নতুন জুতো কিংবা এমনি একটা কিছু ঘুষ দিয়েও শিশুটিকে ছেলে করা যেতো! কিন্তু সাহস হলো না তার। যদি তার সেই পুরাণো পাপের কথা ঠাকুরের মনে পড়ে যায়? ভয় হলো—এত দুঃখ সত্ত্বেও যদি আজো তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হয়ে থাকে, যদি ঠাকুর তাকে দেখেন—আর তার মুখে নাতির কথা শোনেন, তবে সেই কথাটি তাঁর মনে পড়বে, পেটের মধ্যে ঢুকে তিনি হয়তো ভ্রূণটিকে হত্যা করে ফলবেন। গভীর বেদনার সঙ্গে সে স্থির করলো, আমার না যাওয়া আর দেখা না দেওয়াই ভালো। যদি আমি দূরে থাকি, দেবতাকে না জানাই—শিশুটি আসছে, তা'হলে আমার কথা তাঁর মনেই উঠবে না। আমি তো অনেকদিন কোন ঠাকুরের কাছে যাইনি। এতো একটা নশ্বর জীবনের জন্ম—আমার নাতির নয়। আমি শুধু আশা করি—জাতক একটি ছেলে হোক্।

চঞ্চল, বিমর্ষ হলো সে, ভাবলো—শিশু আনন্দের বটে, তবু সে বদনার নবতম অগ্রদূত। প্রত্যেকটি শিশুই এমনি। শিশুটি তো মৃত, বিকলাঙ্গ, নির্বোধ, অন্ধ, অথবা একটি মেয়ে কিংবা এমন একটা কিছু হতে পারে। জীব

—হত্যার শক্তিসম্পন্ন দেব-দেবীর উপর ঘৃণা হলো তার। আপনমনে বলল, আমার পাপটুকুর জন্য আমি কি যথেষ্ট শাস্তি পাইনি? কে ভেবেছিল—আমার সেদিনকার কাজের কথা দেবতা জানতে পাবেন? কিন্তু নিশ্চয় তাঁর চোখ ঢেকে রাখা সত্ত্বেও সেই ভাঙা মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁর আশে-পাশে অনুষ্ঠিত পাপের গন্ধ পেয়েছিলেন, আর দেবীকে তা জানিয়েছিলেন। বেশ তো, আমি পাপিষ্ঠা! যদি প্রয়োজন হয়—দেব-দেবীর কাছ থেকে দূরে সরে থাকবো। জানি না, যে প্রায়শ্চিত্ত আমি করছি তার চেয়ে বেশি কী আর করা যায়? আমি জোর করে বলতে পারি—আমার জীবনের সুখ-দুঃখের পরিমাপ করলে তাঁরা দেখবেন, দুঃখই নিক্তিকে পাথরের মতো নীচের দিকে নামিয়ে এনেছে, আমার সামান্য সুখ একটি চোরকাঁটার চেয়ে বেশি হবে না। সেই অবাঞ্ছিত সন্তানটি আমি ধারণ করিনি, আমার অন্ধ মেয়েটিকে অন্ধ অবস্থায় মারা যেতে দেখেছি। বেদনায় কি প্রায়শ্চিত্ত হয় না? আজীবন শুধু দুঃখেই কেটেছে, দুঃখের সংগে দারিদ্রও রয়েছে মিশে। কিন্তু ন্যায়-বিচার জানেন না দেবতারা। তাই সে বিষণ্নভাবে ভাবল, এখন তার দুটি দুঃখ—নাতিটা যদি পূর্ণাংগ ও সুস্থ না হয় কিংবা মেয়ে হয়, আর যদি তার ছোট ছেলের জন্য প্রতীক্ষা নিষ্ফল হয়? এখন কখনও কখনও মনে হয়—তার সারাটি জীবনই যেন গড়ে উঠেছে প্রতীক্ষায়। সে প্রতীক্ষা করেছে— তার স্বামীর, সে আর এলোই না। এখন তার প্রতীক্ষা—পুত্র ও পৌত্রের। এই তো তার নগণ্য জীবন!

তবু আশা মনে। শহর থেকে কেউ ঘুরে এলে সে জিগ্যেস করে, আজ আমার ছেলেকে দেখেছ কোথাও? পাড়ায় এ-বাড়ি ও-বাড়ি গিয়ে অনুসন্ধান করে, তোমরা কি কেউ আজ শহরে গিয়েছিলে? কেউ শহরে গিয়েছিল বললে আবার তাকে জিগ্যেস করে, আমার ছেলে—ছোট ছেলের সংগে দেখা হয়েছিল কি? তার প্রত্যাশাভরা দিনগুলিতে পাড়ার স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এই প্রশ্ন শুনতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদেরই একটি গাছের ডাল কেটে তার ছেলে তাকে একটি লাঠি তৈয়ারী করে দিয়েছে। লাঠির উপর ভর করে মা কম্পিত-কণ্ঠে জিগ্যেস করে, আজ আমার ছেলেকে দেখেছ তোমরা কেউ? তারা তার দিকে চায়, দয়ার্দ্রকণ্ঠে বলে, না, মা। আমরা তো যাই বাজারে। সেখানে তাকে

দেখবো কেমন করে? আর—তুমিই তো বলেছ, সে এখন বই পড়ে দিন কাটায়!

ভেঙে যায় তার আশা। সে ফিরে যায়, দুর্বল হয়ে আসে কণ্ঠস্বর। অস্পষ্ট-ভাবে বলে, জানি না—হয়তো সে অন্য কোথাও বই নিয়ে পড়ে আছে। উচ্চ হাস্যে ওরা বলে, যদি কখনও বইর দোকানের সামনে দিয়ে যাই তো একবার উঁকি মেরে দেখবো—সে গদিতে রয়েছে কিনা!

তাই মা বাড়ি ফিরে প্রতীক্ষা করে। ভাবে—ভেড়ার চামড়াগুলোতে ঘুণ ধরলো কিনা।

অনেকদিন কেটে গেল। খবর এলো অবশেষে সকাল বেলা।

খাওয়ার পর হাতে লম্বা নলটি নিয়ে অন্যান্য দিনের মতো সে দরজায় বসে-ছিল। বসে বসে দেখছিল—সকালের সূর্য গোল পাহাড়ের উপর কেমন করে উঠছে। শরতের এই হিমেল সকালে সে সূর্য-কিরণের অপেক্ষা করছিল। সহসা উঠান পার হয়ে এলো ভাশুরের বড় ছেলেটি। মার বড় ছেলে দাঁড়িয়ে স্যাণ্ডেলের চর্মবন্ধনীটি বাঁধছিল, পরবার সময় সেটি ছিঁড়ে গিয়ে-ছিল। তার কাছে গিয়ে ভাশু-পো ফিস্ ফিস্ করে কি বলল। অবাক হয়ে গেল মা। সকালে ঘুম থেকে উঠে মা ওকে সহরে যেতে দেখেছিল। সে আজন্ম প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করে। নতুন কাটা ঘাস নিয়ে তাকে শহরে যেতে দেখেছিল মা। এত শিগ্গির সে আবার ফিরে এসেছে। মা তাকে ডেকে জিগ্যেস করতে যাচ্ছিল—এত শিগগির তার ঘাসটা বিক্রী হয়ে গেল নাকি? দেখলো তার বড় ছেলে মাথা তুলে চেয়ে সভয়ে বলে উঠলো, আমার ভাই?

মার প্রখর শ্রবণে সেই ধ্বনি বাজলো। সে তো কালা নয় মোটেই। তাড়াতাড়ি জিগ্যেস করলো, কি হয়েছে ছোট খোকার? ওরা দু'জনে গম্ভীরভাবে ও গভীর মনোযোগের সঙ্গে আলাপ করছিল ও পরস্পর পরস্পরের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাইছিল। তর্ সইলো না মার। সে উঠে এলো তাদের কাছে, মাটিতে লাঠিটি গুঁজে বলল, আমার ছেলের খবর বল!

ভাশুরপো বিনাবাক্যব্যয়ে চলে গেল। একটু থমকে বড় ছেলে বলল, একটা গোলমাল হয়েছে মা, জানিনা—কিন্তু মা, আমায় একবার শহরে যেতেই হবে, তারপর তোমায় বলবো।

কিন্তু মা তাকে ছাড়লোনা। তার গায়ে ধরে আরও উচ্চকণ্ঠে বলল, আমায় না বলে কিছুতেই যেতে পারবি না।

তার চিৎকার শুনে পুত্রবধূ এসে দাঁড়িয়ে শুনলো। বলল, বল না, নইলে রাগে উনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

অগত্যা, ছেলে ধীরে ধীরে বলল, জ্যাঠাতো ভাই বলল—সে আজ আরও অনেক গুলো লোকের সঙ্গে আমার ভাইকে দেখেছে। তার হাতে দুটো শণের দড়ি দিয়ে পিঠমোড়া বাঁধা, পরণের কাপড় ছেঁড়া। জ্যাঠাতো ভাই যেখানে ঘাস বিক্রী করতে গিয়েছিল সেই বাজারের পাশ দিয়ে সে দল বেঁধে যাচ্ছিল। কুড়ি তিরিশ জনের একটি লম্বা সারি। ও যখন তাকে দেখে তখন সে চোখ ফিরিয়ে ছিল। তাদের সঙ্গে যে পাহারাওলারা ছিল তাদের জিগ্যেস করতেই ওরা বলেছে, ওরা কম্যুনিষ্ট্, ওদের জেলে নেওয়া হচ্ছে—কালই মেরে ফেলা হবে।

তিনজনে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। বৃদ্ধা মার চোয়াল কাঁপতে লাগলো। সে একবার ছেলে, আবার বৌয়ের মুখের দিকে চেয়ে বলল, কম্যুনিষ্ট্! কথাটি আমি শুনেছি, কিন্তু জানিনা, তা' কি। ছেলে ধীরে বলল, সে-কথা আমি জ্যাঠাতো ভাইকে জিগ্যেস করেছি, সে পাহারাওলাকে জিগ্যেস করে ছিল। পাহারাওলা নাকি হোঃ হোঃ করে হেসে তাকে বলেছে, এক রকমের ডাকাত—আজকাল বেরিয়েছে।

মার মনে পড়লো বিছানার নীচে বহুদিন লুকিয়ে-রাখা পুঁটলিটির কথা। সে আর্তনাদ করতে লাগলো। মাথার ওপর কোটটি ছুঁড়ে দিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, সেদিন যদি আমি জানতে পারতাম! উঃ, তা'হলে আমার বিছানার নীচে যে পুঁটলিটি রয়েছে—সেটি ও ডাকাতি করে এনেছে।

একথা শুনে ছেলে ও ছেলের বৌ মাকে ধরলো, তাকালো চারদিকে, তাকে আগলে ঘরের ভেতর নিয়ে জিজ্ঞেস করলো—কিসের কথা বলছ, মা?

পুত্রবধূ পর্দা সরিয়ে স্বামীর দিকে তাকালো। সে এলো। পুটলিটি দেখিয়ে দিয়ে মা বলল, জানি না এর ভিতর কি আছে। কিন্তু সেদিন রাত্রিবেলা সে এটি এনেছিল, আমায় বলেছিল যেন দু'একদিন লুকিয়ে রাখি। কিন্তু সে এলোনা—আর এলোনা।

ছেলে উঠে গিয়ে আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে আগল লাগালো, তার স্ত্রী জানালার উপর একটি জামা ঝুলিয়ে রাখলো, তারপর দুজনে মিলে পুঁটলিটি বার করে দড়ি খুললো।

সেদিকে চেয়ে অনুচ্চকণ্ঠে মা বলল, ও বলেছিল—ওগুলো ভেড়ার চামড়া। কিন্তু তারা দু'জনেই নীরব রইলো, বিশ্বাস করলো না মার কথা। জিনিসটা অন্য কিছু হবে। বেশ ভারী ও উপরের দিকটা শক্ত দেখে অনেকটা আশা হলো—সোনাই হবে!

পুঁটলিটা খুলে দেখা গেল—কতগুলো বই। অনেক—অনেকগুলো বই—সবগুলোই ছোট, কালো কালিতে ছাপা, আর অনেকগুলো কাগজ—কোনটি চিত্রিত—রক্ত ও মৃত্যুর বিচিত্রময় দৃশ্য! দানবেরা ক্ষুদ্রকায় লোকগুলোকে প্রহার করছে অথবা ছুরি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করছে। বইগুলো দেখেই তিনজনেই হাঁ করে একে অন্যের মুখের পানে তাকালো, বুঝতে পারলোনা কী এর অর্থ, কালিতে ছাপা কতকগুলো কাগজ চুরি করে লুকিয়ে রাখার কী প্রয়োজন?

নিবিষ্টভাবে চেয়ে দেখলো তারা। কিন্তু তাৎপর্য নির্ণয় করতে পারলো না কেউ, একটি বর্ণও পড়তে পারলো না। লোকের বুকে ছুরিকাঘাত করা হচ্ছে আর তারা মরছে, মানুষের দেহ টুকরো টুকরো হয়েছে! এসব জিনিস খারাপ। ডাকাতেরাই এমনি ভয়ংকর ঘৃণ্য কাজ করে—সুধু এটুকু ছাড়া ছবিগুলোর আর কোন অর্থই বুঝলো না তারা। তিনজনেই হলো শঙ্কিত। ছেলের জন্য আশঙ্কা হলো মার। অপর দুজনের ভয় হলো—পাছে কেউ একথা জেনে ফেলে। ছেলে বলল, রাত না হওয়া পর্যন্ত এগুলো বেঁধে সেখানেই রেখে দাও, রাত্তিরে হেঁসেলে নিয়ে পুড়ে ফেলা যাবে।

পুত্রবধূটি আরো সাবধানী। সে বলল, না, সবগুলো এক সংগে জ্বালানো যাবে না, তা'হলে ধোঁয়া দেখে লোকে সন্দেহ করবে। ধীরে ধীরে এক একটি করে পোড়াতে হবে—যেন ঘাস পুড়িয়ে রান্না করছি।

বৃদ্ধা মা কান দিল না এ কথায়। সে বুঝতে পেরেছে—তার ছেলে খারাপ দলে পড়েছে। ছেলেকে বলল, দেখ্ বাবা, তোর ছোট ভাইটির জন্য কী করতে পারিস্, কেমন করে ওকে খুঁজে বার করবি? অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে বলল, আমি

জানি সে কোথায়। জ্যাঠাতো ভাই বলেছে—ওকে নিয়ে গেছে দক্ষিণদিকের 'গেট'-এর কাছে একটি জেলে। সেখানেই আছে বধ্যভূমি।

অতর্কিতে মার দৃষ্টি বীভৎস হয়ে উঠলো। ভয় পেয়ে ছেলে তার স্ত্রীকে চিৎকার করে ডাকলো। দু'জনে বৃদ্ধাকে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে রাখলো। শুয়ে হাঁপাতে লাগলো সে। ছেলের জন্য আতঙ্কে মাটির মতো বিবর্ণ হয়ে গেছে তার মুখখানি। হাঁফাতে হাঁফাতে চুপিসারে বলল, দেখ্ বাবা, তুই কি যাবি না? তোর ভাই—

বড় ছেলেটি নিজের ভয় ছাড়লো। মার উপর দয়া হলো তার। বলল, হ্যাঁ মা, এই যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি।

সে কাপড়-চোপড় বদলে নিয়ে জুতো পরলো। সময় যেন কাটছে না। অসহ্য হলো মার। ছেলে তৈরী হয়ে এলো। মা তাকে ডাকলো। তার ঘাড়টি নুইয়ে ধরে কানে কানে বলল, টাকার জন্য ভাবিস্‌নি, বাবা! সত্যিই সে যদি জেলে থাকে তাকে বাইরে আনতে টাকা খরচ করতে হবে। টাকাতে এ কাজ সম্ভব, বাবা! টাকা দিয়ে কেউ জেল থেকে ছাড়া পায়নি—এমন জেল আছে বলে তো শুনিনি কখনও। ঐখানে ঐ গর্তটির মধ্যে কটি টাকা আছে। টাকাগুলো ওরই জন্যে রেখেছিলাম। সেগুলো সব খরচ করে ফেল্—যা কিছু আছে আমাদের—সবই ব্যয় কর্ ছেলের মুখের কোন পরিবর্তন হলো না। সে তার স্ত্রীর দিকে তাকালো। মার দিকে চেয়ে বলল, শুধু তোমারই জন্য—আমি যথাসাধ্য করবো। মা চিৎকার করে বলল, আমার জন্য কি যায় আসে? আমি এখন বুড়ো হয়েছি, মরণের জন্য তৈরী হয়ে আছি—করতে হবে ওরই জন্য! ছেলে চলে গেল তার জ্যাঠাতো ভায়ের কাছে। সে দেখেছে সেই দৃশ্য। তারা দু'জনে মিলে শহরে দিকে চললো। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া মা কী আর করবে? তবু, এ যে তার জীবনের সব চেয়ে বেদনাময় প্রতীক্ষা! সে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারছে না, অথচ উঠলেই মূর্ছিতা হয়ে পড়বে। বৃদ্ধার দৃষ্টি ও প্রলাপ আর তার জীর্ণ হাঁটু চাপড়ানো দেখে পুত্রবধূ ভয় পেয়ে গেল। তাই সে ভাশুর ও বড়-জাকে ডেকে পাঠালো। তারা এলো গম্ভীরভাবে। এক-সঙ্গে বসল তিনটি বৃদ্ধ।

ওদের উপস্থিততে মা সত্যিই এতটুকু সান্ত্বনা অনুভব করলো। তাদের কাছে

সে সব কথা বলতে পারে। কাঁদতে কাঁদতে বার বার বলল, আমি যদি পাপ করে থাকি তো তার শাস্তিও কি পাই নি? যদি পাপ করে থাকি—কেন আমি মরছি না, আর আমার মরণে পাপের শেষ হচ্ছে না? কেন, একে একে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে সব—এমন কি আমার নাতিটাও? না, নাতির মুখ আমি দেখতে পাবো না, আর আমার মরণও হবে না! এ বেদনায় সে রুদ্ধ হয়ে উঠলো। চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, পাপ করেনি এমন পুণ্যাত্মা স্ত্রীলোক কে আছে? তবে, আমিই সব দুঃখ পাবো কেন?

বৃদ্ধা তার এই বেদনায় আরো উচ্চৈঃস্বরে কান্না সুরু করবে—এই ভয়ে বড়-জা বলল, নিশ্চয় আমাদের সবারই পাপ আছে। পাপ-পুণ্য দিয়েই যদি আমাদের বিচার করা হোত, তা'হলে আমাদের কারো সন্তান হতো না। আমার ছেলেও নাতিদের দেখ। কিন্তু আমি নিজেই তো এক বুড়ো পাপী, কোনদিন দেবালয়ের কাছেও যাই না, যাইনিও। তখন এক সন্ন্যাসিনী আমার কাছে এসে বলতো, ছেলে-পিলে নিয়ে মশ্‌গুল হয়ে থাকলে চলবে না, পরলোকের কাজ করতে হবে! এখন বুড়ো হয়েছি, এখনও অনেকে এসে বলে, সময় থাকতে থাকতে মোক্ষ-লাভের উপায়টা শেখা দরকার। আমি বলি, এখন আমার আর কিছু শেখার বয়স নেই, যেমন আছি তেমনিতেই যদি স্বর্গলাভ সম্ভব না হয়,—না-ই বা হোল? বড়-জা সম্বিৎহারা মাকে এমনি ভাবে সান্ত্বনা দিল। ভাশুর বলল, কি খবর পাওয়া যায় দেখ। এমনও হতে পারে—তোমার দুঃখের কোন কারণই থাকবে না, ওরা টাকা খরচ করে ওকে ছাড়িয়েও তো আনতে পারে! তাছাড়া, ওর তো ভুল হতে পারে—যাকে বেঁধে নেওয়া হয়েছে সে তোমার ছেলে নাও হতে পারে।

বড়-জা আর এক কাজ করলো। বাড়ির ভেতর গিয়ে পুত্রবধূকে তার নিজের কাজে পাঠিয়ে দিল—যেন সে মার কথা শুনতে না পায়। আজকের এই মুহূর্তে এই দীনা বৃদ্ধা বলুক্—যা সে বলতে চায়। সুদীর্ঘ নীরবতার পর এ যে মর্মান্তিক!

তারা ঐ লোক দুটির প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় রইলো। একা অপেক্ষা করার চেয়ে তিনজনে একসঙ্গে প্রতীক্ষায় থাকা সহজ।

সন্ধ্যা হয়ে এলো, তবু তারা ফিরে এলো না। মা শয্যা থেকে নিজেকে টেনে

তুললো। অপরাহ্ণ শেষ হতেই বাইরে এসে উইলো গাছের তলায় বসলো। তার পাশে বসলো ভাশুর ও বড়-জা। তিনটি বৃদ্ধ বসে রইলো গাঁয়ের পথটির দিকে। সুধু বড়-জা মাঝে মাঝে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিল। দুঃখও তাকে এই তন্দ্রা থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

সূর্য অস্তমিত-প্রায়। মা দেখলো—ওরা ফিরে আসছে। দাঁড়িয়ে লাঠিতে ভর করে চোখের উপর হাত দিয়ে সোনালি সান্ধ্য-সূর্যকে প্রতিরোধ করে সে বলে উঠল, ঐ ওরা আসছে! খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাস্তায় নেমে এলো সে। তার চিৎকার ও ছুটোছুটিতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলা সবাই। গাঁয়ের সকলেই জানতো এ কাহিনী। ছেলেটির যদি শাস্তি হয়—তা'হলে ওরা-ও জড়িয়ে পড়বে—এই ভয়ে প্রকাশ্যে মার বাড়িতে আসবার সাহস ছিল না কারো। সারা-দিন তারা নিজেদের কাজে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে, "জেল" ও রাষ্ট্রপালের কথা শুনে গাঁয়ের লোকেরা ভয় পায়। তারাও তেমনি ঔৎসুক্যে ও ভয়ে ভয়ে রয়েছে। তারা বাইরে এলো, দূর থেকে গলা বাড়িয়ে রইলো চারদিকে, কী হয় দেখবার আগ্রহে চেয়ে রইলো। ভাশুরও উঠে মার পিছু পিছু গেল। বড়-জারও যাবার ইচ্ছা হলো, কিন্তু নেহাৎ প্রয়োজন না হলে সে হাঁটেনা। ভাবল, একটু পরেই তো সব শুনবে। তার বিশ্বাস—শেষকালে ভালোটাই হবে নিশ্চয়। সুতরাং সে চুপ করে বেঞ্চির উপর বসে অপেক্ষা করতে লাগলো।

দৌড়ে গেল মা, ছেলের বাহুতে ভর দিয়ে জিগ্যেস করলো, আমার ছোট ছেলের খবর কী?

প্রশ্ন করে সে তাদের দুজনের মুখের দিকে চাইলো। অনুভব করলো—তাদের মুখে যেন অশুভ লেখা রয়েছে। তারা দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। ছেলেটি গম্ভীরভাবে বলল, ও এখন জেলে আছে, মা। আবার তারা চাইলো একে অন্যের মুখের পানে। জ্যাঠাতো ভায়ের ছেলে মাথা চুলকে বাইরের দিকে তাকালো নির্বোধের মতো। সে যেন কোন কথা পেলোনা খুঁজে। ছেলেটি আবার বলল, ওকে হয়তো বাঁচানো গেলনা।—আরো চব্বিশ-জনের সঙ্গে কাল সকালেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

"মৃত্যু!"—চিৎকার করে উঠল মা। আবার বলে উঠলো, "মৃত্যু!"

ছেলে ও বৌ ধরে না রাখলে সে পড়েই যেতো। দু'জনে ধরাধরি করে তাকে

পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে আসনে বসালো। সে কাঁদতে লাগলো, আর্তনাদ করতে লাগলো, শুকনো বুক চাপড়াতে লাগলো, বড়ছেলেকে অভিযুক্ত করে চেঁচিয়ে উঠলো, তোরা নিশ্চয় টাকা দিতে চাস্‌নি। তোকে বলেছিলাম—আমার কাছেও কিছু টাকা রয়েছে, তা-ও নেহাৎ কম নয়। যে বিয়াল্লিশ টাকা সে আমায় দিয়েছিল সেই টাকাগুলো তো আমার কাছে রয়েছে।

ছেলেটি নতশিরে দাঁড়িয়ে রইলো, তাঁর ঠোঁট ও ভুরু বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগলো। বৃদ্ধা সরোষে তার গায়ে থু-থু দিয়ে বলল, ঐ টাকার একটি কপর্দকও তুই পাবিনা। সে যদি না বাঁচে, ও-টাকা তোর হবেনা। সেই টাকা নদীতে ফেলে দিয়ে আসবো।

ভাশুরপো মাকে শান্ত করবার জন্য তার ছেলের পক্ষ সমর্থন করে মুখখানি কুণ্ঠিত করে বলল, ওর দোষ নেই, কাকিমা। তোমার ওই টাকার দ্বিগুণ দিতে চেয়েছিল সে। তার ভায়ের জন্য সে একশো টাকা দিতে চেয়েছে, জেলের ছোট—বড় যারই সঙ্গে দেখা হয়েছে তাদের সকলকে ঘুষ দিতে চেষ্টা করেছে,—এমনকি টাকাটাও দেখিয়েছে পর্যন্ত। কিন্তু ওরা তোমার ছোট ছেলেটিকে একবার দেখতেও দিলেনা।

উচ্চকণ্ঠে মা বলল, যথেষ্ট টাকা দিতে সে চায়নি। জেলের কোন্ পাহারাদারকে টাকা দিয়ে বশ করা যায়না? যে যাই বলুক্‌না কেন, এখনই আমার টাকাটা তুলে নিয়ে আমি ছেলেকে খুঁজে বাড়ি নিয়ে আসবো। সে আমায় ছেড়ে যাবেনা আর।

ওরা দুজনে একে অপরের মুখের দিকে চাইলো। ছেলের মুখখানি যেন আবার তার পক্ষ হয়ে কিছু বলবার জন্য জ্যাঠাতো-ভাইকে নীরবে অনুরোধ জানালো। তাই সে বলল, দেখ কাকিমা, ওরা তোমায়ও তাকে দেখতে দেবেনা। টাকা দেখানো সত্ত্বেও ওরা আমাদের সেখানে ঘেঁষতে দেয়নি। তারা বলল, তার অপরাধের জন্য রাষ্ট্রপাল তার উপর নাকি অত্যন্ত ক্ষেপে গেছে। সে-নাকি এক নিষিদ্ধ নতুন অপরাধ! মা সগর্বে বলে উঠলো, আমার ছেলে কোন অপরাধ করেনি। সে তার লাঠিটি নাড়লো। নিশ্চয়, ওর কোন শত্রু ওকে জেলে বেঁধে রাখবার জন্য আমাদের চেয়ে বেশী টাকা দিয়েছে! দেখলো, তার চারদিকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে জনতা চক্ষু স্থির করে সংবাদ গিলছে। তাদের

উদ্দেশ্যে মা বলল, তোমরা দেখেছ কোনদিন—আমার ছেলেকে কোন খারাপ কাজ করতে?

ওরা নির্বাকভাবে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকালো। তাদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দেখে হতাশ হয়ে পড়লো মা। অশ্রু-বিসর্জন করতে লাগলো সে। আবার তাদের বলল, বুঝেছি, তোমরা তাকে ঘৃণা কর—তার চেহারা সুন্দর, আর তোমাদের সব কালো কালো ছেলের চেয়ে সে ভালো বলে তোমাদের ঈর্ষা। যে তোমাদের চেয়ে ভালো তাদের তোমরা ঘৃণা কর।

সে সেখান থেকে কাঁদতে কাঁদতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ি ফিরে চললো।

মা বাড়ি ফিরে এলো। ভাশুর, বড়জা ও তাদের ছেলেমেয়েরা ছাড়া আর কেউ কাছে রইলোনা। চোখ মুছে একটু শান্ত অথচ উত্তেজিতভাবে মা তার ছেলেকে বলল, অনর্থক সময় নষ্ট হচ্ছে। আমায় সব খুলে বল্। এখনো আমরা ওকে বাঁচাতে পারি। রাতটা রয়েছে এখনও,—ওর আসল অপরাধটা কি? সর্বস্ব খরচ করেও আমরা তাকে রক্ষা করবো।

ছেলে ও ছেলের বৌ একে অন্যের মুখের পানে তাকালো একবার। তাদের দৃষ্টি খারাপ নয়, তবু যেন তাদের সহিষ্ণুতার অবসান ঘটেছে। ছেলেটি বলল, অপরাধটি সত্যিই কি,—আমি জানিনা। তোমায় তো বলেছি—সে একজন "কম্যুনিষ্ট"। এ নতুন শব্দটি এখন প্রায়ই শুনি, এর মানে মনে হয় —যেন এক রকম ডাকাতের দল। বন্দুক বগলে করে জেলে যে রক্ষীটি দাঁড়িয়ে থাকে তাকে জিগ্যেস করেছি। সে বলেছে, কী সে—? —কেন? কম্যুনিষ্ট মানে—যে তোমার জমিটি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। তার সংগীদের সঙ্গে তাই তাকেও মরতে হবে, বুঝলে? এই হলো তার অপরাধ!

শক্ত হয়ে মা কথাটি শুনলো। শুকিয়ে-যাওয়া চোখের জলে উজ্জ্বল তার মুখখানির উপর মোমবাতির আলো পড়লো। অবাক হয়ে গেল সে। কম্পিত স্বরকে স্থির করবার চেষ্টা করে বলল, আমার মনে হয়না—সে এমন হতে পারে। এমন কথা বলতেও তো আমি তাকে কখনও দেখিনি। এমনি অপরাধের কথা আমি কখনও শুনিনি। নরহত্যা, লুণ্ঠন ও মা-বাবাকে খেতে না দেওয়া অপরাধ হতে পারে। কিন্তু জমি কেমন করে লুঠে নেওয়া যায়?

সে কি কাপড়ের মত গুটিয়ে নেওয়া যায়, না কোথাও লুকিয়ে রাখা যায়? ছেলে হাত দুটো জানুর মধ্যে দিয়ে ঘাড় নিচু করে বেঞ্চির উপর বসেছিল। সে বলল, আমি জানিনা, মা। তখনও তার গায়ে জামা পরা ছিল। জামা পরা অভ্যাস নয় তার, তাই কোণটি কোমরবন্ধের সঙ্গে এ'টে দিয়েছিল। সেটি আরও শক্ত করে গ'ুজে সে ধীরে ধীরে বলল, আরও কত কথাই যে বলছে সবাই—জানিনা! শহরের এখানে-ওখানে সবাই বলছিল—কাল একসঙ্গে এতগুলো লোককে হত্যা করা হবে, কালকের দিনটি সকলের ছুটির দিন। আরও কি-কি বলছিল—না?

জ্যাঠতুতো ভাই চিবুক চুলকে ঢোক গিলে ঘরের সবগুলো লোকের মুখের দিকে একবার চেয়ে নিল। বলল, শহরের লোকগুলো কত কথাই না বলেছে। আর বেশি জিগ্যেস করার সাহস হয়নি আমাদের। বেশি কিছু বলতে গেলেই জেলের রক্ষীরা আমাদের জিগ্যেস করেছে, তা'হলে তোমরাও কি তাদের দলে? ওদের প্রাণদণ্ড হচ্ছে—তাতে তোমাদের কি? সাহস করে বলতে পারিনি—তাদের মধ্যে রয়েছে—আমাদের ভাই। বড় জেলারের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে গোপনে আলাপ করার জন্য তাঁকে কিছু টাকাও দিয়েছি আমরা। তিনি তাঁর ঘরের পেছনে জেলের এক কোণায় আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে বলেছি—আমরা সাদাসিধা গেঁয়ো লোক, সামান্য জমি-জমা মাত্র আছে। বলেছি—যাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হচ্ছে তাদের একজন আমাদের দূর আত্মীয়, আমাদের বংশের কোন লোক জল্লাদের হাতে মরেনি, তাই দেখছি—সম্মানের খাতিরে খুব বেশি টাকা খরচ না করে যদি তাকে রক্ষা করা যায়! তিনি টাকাটি পকেটে রেখে ছেলেটির চেহারা কেমন জিগ্যেস করলেন। ভায়ের কথা বললে আমাদের বললেন, তোমরা যে-ছেলেটার কথা বলছ—তাকে হয়তো আমি চিনেছি। জেলের মধ্যে খুব অস্বস্তি বোধ করছে সে। আমার বিশ্বাস, তার পাশে যদি ঐ নির্ভীক তরুণীটি না থাকতো, তা'হলে সে যা জানে সবই বলে ফেলতো। এমন সাহসী মেয়ে আমি দেখিনি। ওই মেয়েটিই তাকে প্রেরণা দিচ্ছে। মরণকে ভয় করেনা এমন কঠিন ও সাহসী অনেকেই হয়ে থাকে। ছেলেটি কিন্তু ভয় পেয়েছে। সে হয়তো জানেই না—কী সে করছে, কিংবা কেন মরছে। ছেলেটাকে সরল, গেঁয়ো

বলে মনে হয়। মিথ্যে আশা দিয়ে ওরা তাকে দিয়ে হুকুম তামিল করিয়েছে। আমার বিশ্বাস, কতগুলো বই বিলি করবার সময় ওকে গ্রেপ্তার করা হয়—এই তার অপরাধ। সেই বইগুলোতে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে উল্টে দিয়ে সকলের মধ্যে সমানভাবে সব জমি ও টাকা বিলি করে দেওয়া ইত্যাদি সব খারাপ কথা লেখা ছিল।

বড় ছেলের দিকে চেয়ে মা কেঁদে উঠলো আবার, আমি জানতাম, আমাদের জমির ভাগ ওকে দেওয়া আমাদের উচিত ছিল। শুধু তাই নয়, আরও কিছু জমি খাজনায় নিয়ে তাকে ভাগ করে দেওয়াটাই ছিল আমাদের কর্তব্য। কিন্তু না—, আমার এই ছেলে আর তার বৌ নিজেই রাখবে সব, ওকে কিছু দিতে ঈর্ষা হয় তাদের!

বড় ছেলে উত্তর দিতে মুখ খুললো। কিন্তু বৃদ্ধ ভাশুর শান্তভাবে বলল, কথা বলোনা, বাবা। তোমার মা তোমায় দোষ দিয়ে শান্তি পাক্। আমরা সবাই তোমাকে ও তোমার ভাইকে জানি। মাঠের কাজে কিংবা কোথাও কোন পরিশ্রমের কাজ করতে সে কেমন ঘৃণা বোধ করতো—তা'ও আমাদের অজানা নেই।

ছেলে তাই চুপ করে রইলো। শেষে জ্যেঠতাতো ভাই বলল, আমরা তখন জেলারকে জিগ্যেস করলাম, ওকে ছাড়িয়ে আনতে কত টাকা দরকার। ঘাড় নেড়ে তিনি উত্তর দিলেন, বন্দী নিজে যদি কোন উচ্চপদস্থ লোক কিংবা বড়-লোকের ছেলে হ'ত, তা'হলে টাকা খরচ করে তাকে মুক্ত করা যেতো। কিন্তু ও হচ্ছে এক গেঁয়ো ছোক্‌রা, ওর জন্য কে এ কাজ করে বিপদে পড়বে? ওকে মরতেই হবে।

মা চিৎকার করে উঠলো, তা'হলে সে মরবে—তার কারণ—সে আমার ছেলে, আর আমি গরীব, তাই? আমাদের নিজেদের জমি রয়েছে। আমরা তার মুক্তির জন্য সেই জমি বিক্রি করে ফেলবো। আজ রাতেই ওটা বিক্রি করবো, পাড়ার মধ্যে এমন লোক আছে—

জমির কথা তুলতেই বড় ছেলে বলল, তা'হলে আমরা বাঁচবো কি করে? এমনিতেই আমাদের চলেনা, তার উপর যদি এই নতুন চড়া হারে খাজনায় জমি নিতে হয়, তবে আমরা যে পথের ভিখিরী হয়ে বসবো। একটি মাত্র জমি

আছে—আমি সেটা বিক্রি করবোনা। না,—জমিটি আমারই, আমি সেটা বেচবোনা।

মলিন মুখখানি বিরস করে তার স্ত্রী সেখানে বসে শুনছিল। সর্বদা যেমন বলে তেমনি বলল, আমার পেটের ছেলেটির কথাও তো এখন ভাবতে হবে!

ছেলে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, হ্যাঁ, আমিও তো তার কথাই ভাবছি!

বৃদ্ধা মা নীরব হলো তখন। খানিকক্ষণ সে কাঁদলো। তারপর সেই রাত্রিতে তাদের মধ্যে যতো কথা হলো, তার উত্তর হলো—সুধু সেই একটি।

সারাটি রাত বসে রইলো তারা। ভোরের আলো অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠ্লো। মা কোথা থেকে এক অত্যাশ্চর্য শক্তি সঞ্চয় করলো। বলল, আমি নিজেই যাবো, আবার শহরে যাবো আমি। মরবার জন্য যখন সে বাইরে আসবে তখন তাকে দেখবো। তার হাত ধরে অনুনয় করে বারণ করলো তারা। ছেলে বলল, আমি গিয়ে তাকে নিয়ে আসবো পরে। সে-দৃশ্য দেখলে তুমি নিজেও মারা যাবে, মা। কিন্তু মা বলল, কী হবে আমি ম'লে?

সে মুখ ধুয়ে মাথার ক'টি ধুসর কেশ আঁচড়ালো, শহরে যাবার সময় যেমন পরে, ঠিক তেমনি, পরিষ্কার একটি কোট পরলো। সহজসুরে বলল, ভাশুরের গাধাটি নিয়ে আয়গে। গাধাটি নিতে দেবে তো আমায়? নিরুপায়, বিমর্ষ-ভাবে ভাশুর বলল, ওঃ—হ্যাঁ—

ভাশুরের ছেলে ও বড় ছেলে দু'জনে গিয়ে গাধাটি এনে মাকে গাধার উপর বসালো। তারা চললো—তার পাশে-পাশে। পথ চলবার মতো ভোরের আলো ফোটেনি তখনও। তাই, ছেলেটি হাতে একটি লণ্ঠন নিল।

দুর্বল বাক্যহারা মার দু'চোখে অশ্রু ঝরছে অবিরল। সে জানেনা—গাধার পিঠে বসে থাকা ছাড়া আর কি সে করছে। ঘাড় নিচু করে রইলো সে, একবার তাকালোনা ভোরের পানে। চেয়ে রইলো—অন্ধকারে অস্পষ্ট, মলিন, ধূলিময় পথের দিকে। এই বেদনার ক্ষণে তার সঙ্গী দু'জনও নীরব রইলো। বাঁকা পথ ধরে তারা চললো দক্ষিণ দিকে। কিন্তু তখনও খুব সকাল, তাই দক্ষিণের প্রবেশপথ ছিল বন্ধ।

সেখানে অনেক লোক অপেক্ষা করছিল। গ্রামাঞ্চলে এই বিরাট হত্যার কথা প্রচারিত হয়েছে। তাই, গ্রামবাসীরা ছেলেপিলে নিয়ে এই দৃশ্য উপ-

ভোগ করবার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ঢুকলো। গাধার পিঠে বসে মা ও ঐ দুটি লোকও দেয়ালের সম্মুখে সেই বধ্যভূমির দিকে গেল। এক বিরাট জনতা ঠাঁসাঠাঁসি করে সেখানে অপেক্ষা করছিল—নীরবে ভাবছিল মৃত্যুর এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের কথা। ছোট ছেলেমেয়েরা না-দেখা, নাম-না-জানা ভয়ে তাদের মা-বাবাকে আঁকড়ে ধরে আছে। শিশুরা চেঁচালো, চুপ করলো আবার। নীরব জনতা ক্ষুধার্তভাবে অপেক্ষমান, ঈপ্সিত এক বীভৎস দৃশ্যকে প্রত্যক্ষ করবার বিচিত্র আনন্দ ও ঘৃণায় তাদের অন্তর পরিপূর্ণ!

কিন্তু মা ও তার সঙ্গী দুজন সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালোনা। মা চুপি চুপি বলল, চল, আমরা জেলের দরজায় গিয়ে দাঁড়াই। তখনও সে মনে এ আশাই পোষণ করছিল—সে যখন তার ছেলেকে দেখবে তখনই আশ্চর্য একটা কিছু হবে, তাকে রক্ষা করবার একটা উপায় হবে!

ছেলে গাধাটিকে জেলের দিকে নিয়ে গেল। মাথায় ভাঙা কাঁচ লাগানো উঁচু দেয়াল-সংলগ্ন দরজার পাশে অপেক্ষা করতে লাগলো তারা। সেখানে এক সান্ত্রী শুয়েছিল, তার পাশে মিট্‌মিট্‌ করে একটি লণ্ঠন জ্বলছিল, মোমবাতি থেকে রক্তের মতো লাল গলিত চর্বি স্তূপাকার হয়েছিল তার ভেতর। ভোরের ঠান্ডা দম্‌কা হাওয়া ফোঁটা ফোঁটা গলে-পড়া দীপশিখাটি নিবিয়ে দিল। সেখানে ধূলিলিপ্ত পথে অপেক্ষা করতে লাগলো তারা তিনজন। মা গাধার পিঠে থেকে নেমে দাঁড়িয়ে রইলো। সহসা তারা পায়ের শব্দ শুনতে পেলো—অনেকগুলো লোকের পায়ের শব্দ—পাথরের উপর দিয়ে যুগপৎ অগ্রসর হবার শব্দ! স্পষ্ট আদেশ শোনা গেল—"দরজা খোল।"

সান্ত্রী উঠলো, সোজা হয়ে পথের পাশে দাঁড়ালো। কাঁধে ঝুলানো হাতিয়ার শক্ত করে ধরে দরজাগুলো খুলে দিল।

এবার মা চোখ মেলে তার ছেলেকে খুঁজলো। অনেকগুলো লোক এলো। একটি যুবকের সঙ্গে বাঁধা আর একটি যুবক—জোড়া-জোড়া, দড়ি দিয়ে হাত বাঁধা—আবার আগের দু'জনের সঙ্গে পেছনের দু'জন! মনে হলো—ওরা সবাই যুবক, কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন যুবতীও রয়েছে। তাদের মেয়ে বলে চেনা কঠিন, চুল ছোট করে ছাঁটা, পরনে পুরুষের পোষাক। কাছে গিয়ে না

দেখলে চেনবার উপায় নেই। তাদের বুক অপরিসর, পাছা সরু, যুবকের মতো রুক্ষ ও সাহসদৃপ্ত তাদের মুখ।

মা প্রতিটি মুখের দিকে চাইলো। হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো ছেলের উপর। হ্যাঁ, ঐ সে নতশিরে অগ্রসর হচ্ছে। একটি যুবতীর সঙ্গে সে হাতে হাতে শক্ত করে বাঁধা।

মা ছুটে এগিয়ে গেল। পায়ের তলায় পড়ে তাদের ধরে চিৎকার করে উঠলো —বাবা! সে দেখলো—তার মুখখানি মলিনতম, ঠোঁট দুটি মাটির মতো শাদা, চোখ বিবর্ণ। মাকে দেখে সে আরো মলিন হয়ে গেল। মেয়েটির সঙ্গে বাঁধা না থাকলে সে মাটিতে পড়ে যেতো। মেয়েটি তাকে টেনে রাখলো, পড়তে দিলনা—সে তাকে থামতেও দেবেনা। শুষ্ককেশা বৃদ্ধাকে পায়ের তলায় পড়তে দেখে সে হো হো করে হাসলো—নির্ভীকতম, আনন্দহীন হাসি। উচ্চ, তীব্রকণ্ঠে বলল, কমরেড্, মনে কর—তোমার মা নেই, বাবা নেই, সুধু আমাদের আদর্শ ছাড়া তোমার প্রিয় আর কিছু নেই!

সে তাকে টেনে নিয়ে চললো।

একটি রক্ষী তেড়ে এসে মাকে তুলে নিয়ে রাস্তার এক পাশে ছুঁড়ে ফেললো। সে সেখানে পড়ে রইলো ধুলায়। তারপর লোকগুলো সব মার্চ করে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল—সেই দক্ষিণের প্রবেশপথের দিকে। হঠাৎ তারা একটি উত্তেজনাপূর্ণ সংগীত ধরলো, গান করতে করতে মরণের মুখে এগিয়ে চললো।......

ছেলে ও ভাশুরপো মাকে তুলবার চেষ্টা করলো। মা তাকে উঠাতে দিলনা তাদের। সে কাঁদতে কাঁদতে সেখানে ধুলায় ধুসর হয়ে রইলো, মুগ্ধ হয়ে শুনলো সেই বিচিত্র সংগীত, অর্থ বুঝলোনা—সুধু চোখের জলে ভাসলো।

কিন্তু, সে বেশিক্ষণ কাঁদতে পারলনা। জেলের দরজা থেকে একজন রক্ষী এসে নিষ্ঠুরভাবে বন্দুকের গুঁতো দিয়ে গর্জন করে উঠলো, দূর হয়ে যা এখান থেকে, বুড়ো মাগী!

লোক দুটি ভয় পেলো। তারা জোর করে মাকে হাঁটিয়ে এনে গাধার উপর বসিয়ে দিল। তারপর ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে ফিরলো। দক্ষিণদিকের প্রবেশপথে পৌছবার আগে একটি দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা

করলো তারা।

এক তুমুল কোলাহল শোনা গেল। ওরা দুজনে পরস্পর পরস্পরের পানে চাইলো, আর চাইলো বৃদ্ধা মার দিকে। মা ঐ কোলাহল শুনতে পেয়েছে আর তার মানে বুঝেছে—এমন কোন লক্ষণই দেখা গেলনা। গাধার পিঠের উপর ঝুঁকে পড়ে সে তার পায়ের তলায় ধুলোর দিকে চেয়ে ছিল।

কোলাহল শুনে তারা চলতে শুরু করলো। ছত্রভঙ্গ জনতা বিচিত্র ধ্বনি তুলে এগিয়ে চলেছে। তাদের সঙ্গে দেখা হলো এদের। লোক দুটি কিছুই বললোনা। সেই লোকটির কথা মা শুনেছে মনে হলোনা। লোকটি বলল, খুব প্রফুল্লভাবে বীরের মতো তারা মৃত্যু বরণ করেছে! যে শেষ পর্যন্ত গান গেয়েছিল সেই সাহসী মেয়েটিকে দেখেছ? যখন তার মুণ্ডুটি গড়িয়ে পড়লো তখনও বোধ হয় সে এক সেকেণ্ড্ ধরে গান গেয়েছিল, নয় কি?

আর একজন বলল, সেই ছেলেটাকে দেখেছিলে—যার লাল খুন এতদূর গড়িয়ে একেবারে জল্লাদের পায়ের কাছে এসেছিল—আর জল্লাদ তাকে অভিশাপ দিচ্ছিল?

কেউ হাসছিল, কারো মুখ রক্তিম, কারো মুখ মলিন। মা ও লোক দু'টি নগরীর প্রবেশ-পথে এলো। সেখানে একটি যুবক দাঁড়িয়েছিল, নরম মাটির মতো শাদা তার মুখখানি। সে একপাশে ফিরে দেয়ালে হেলান দিয়ে বমি করলো।

এসব দেখেশুনেও মা একটি কথা বললোনা। সে জানে—তার ছেলে এখন মৃত। টাকায় বা আর কিছুতেই কোন ফল হবেনা। তিরস্কারে, এমনকি শাস্তিতেও কোন লাভ নেই। তবু, সে এখন সুধু বাড়ি ফিরে পুরানো সেই কবরটায় গিয়ে অশ্রুপাত করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।

গভীর দুঃখে তার মনে হলো—অন্যান্য স্ত্রীলোকদের মতো তার প্রিয়জনের কোন কবর নেই—যেখানে বসে সে কাঁদতে পারে। তাই, মনের দুঃখ লাঘব করবার জন্য তাকে খুঁজে নিতে হবে এমনি কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির সমাধি। কিন্তু এ দুঃখও শেষ হয়ে গেল আজ। এখন সে শুধু অশ্রুপাত করে বেদনার ভার কমাতে চায়।

সে ঘরের দরজায় এসে গাধার পিঠ থেকে নামলো। বড় ছেলেকে বলল,

আমায় পাড়ার পেছনটায় নিয়ে চল্‌—একটু কাঁদতে হবে আমার।
বড়জা সেখানে ছিল, সে শুনলো সব। সমবেদনায় তার জরাগ্রস্ত শিরটি নেড়ে জাগা দিয়ে মার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল, অভাগিনীকে একটু কাঁদতে দাও—এতেই তাকে সব চেয়ে বেশি দয়া করা হবে।
ছেলে মাকে নীরবে সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে গেল। ঘাসের উপর আরো কয়েক মুঠো ঘাস বিছিয়ে দিয়ে জায়গাটাকে নরম করলো। মা বসলো। তারপর কবরের উপর মাথাটি হেলান দিয়ে হিংস্রভাবে তার দিকে চেয়ে বলল, তুই চলে যা, কিছুক্ষণ আমায় একা থাকতে দে—আমায় কাঁদতে দে! তাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে বলল, চলে যা আমার কাছ থেকে, না কাঁদলে আমি মারা যাবো!
মাকে সেখানে একা ফেলে যাবার ইচ্ছা ছিলনা তার। যাবার সময় বলে গেল, একটু পরেই তোমায় নিতে আসবো, মা।......
সেখানে বসে মা দেখলো—অলস দিনটি উজ্জ্বল হয়েছে। সারাটি জায়গা জুড়ে নতুন সোনালি সূর্য উঠেছে,—যেন কোথাও কেউ মরেনি। মাঠে মাঠে পরিপূর্ণ পিঙ্গলপত্র পাকা ফসল, দিগন্তব্যাপী পিঙ্গল সূর্যকিরণ। মা বসে রইলো—যেন তার বেদনা চোখের জল হয়ে বেরিয়ে আসে, ভাঙা মন শান্ত হয়। ভাবলো—তার সারাটি জীবন—আর তার মৃত পরিজনদের কথা। সহজেই দুঃখ জাগলো মনে—এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে নির্ভর করে থাকার মতো ভালো কিছুর মাত্রা এত কম বলে। সে রাগ করলোনা, দুঃখকে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করলোনা, অন্তর ভরে দুঃখকে জাগতে দিল, নিজেকে মাটির সঙ্গে দলিত হ'তে দিল, বেদনাকে গ্রহণ করলো পরিপূর্ণভাবে। আকাশের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বেদনায় বলে উঠলো, এই কি প্রায়শ্চিত্ত? এখনও কি আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়নি?
চোখের জলের ধারা নেমে এলো। সে তার শুভ্রকেশ শিরটি কবরের উপর জঙ্গলের দিকে নিচু করে রাখলো। তারপর সে কাঁদলো।
সেই উজ্জ্বল প্রভাতে সে সুধু কাঁদলো—আর কাঁদলো। মনে পড়লো—তার ছোট-বড় সব দুঃখের কাহিনী—কেমন করে তার স্বামী তার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেল, মনে পড়লো—এখন তাকে তার এই কান্না থেকে উঠিয়ে ঘরে নিয়ে

যাবার কোন লোক নেই। চোখের সামনে ভেসে উঠলো—সেই হিংস্র মেয়েটির সংগে বন্ধ অবস্থায় কেমন দেখাচ্ছিল তার ছেলেটিকে। নিজের সারাটি জীবনের জন্য সে কাঁদলো।

তখনও সে কাঁদছিল। বড় ছেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে আসতে লাগলো। রৌদ্র-রাঙা মাঠের উপর দিয়ে সে দৌড়াচ্ছিল। ছুটতে ছুটতে সে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করছিল, মাকে উদ্দেশ্য করে কি বলছিল। কিন্তু দুঃখের বিভ্রান্তির মধ্যে মা তার কথা শুনলোনা। মুখখানি তুলে মা শুনলো, ছেলে বলছে—মা, ছেলে হয়েছে—তোমার নাতি,—মা!

তখন সে শুনতে পেলো এ ডাক—সারাটি জীবন যেমন শুনে এসেছে তেমনি স্পষ্ট। অজ্ঞাতে তার অশ্রু রুদ্ধ হলো। উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছেলের দিকে এগিয়ে গেল সে। ব্যাকুলভাবে বলল, কখন, কখন রে? উচ্ছ্বসিত হাস্যে ছেলে বলল, এইতো, এখন—এইমাত্র—একটি ছেলে—ইয়া বড়। ঠিক এক বছরের ছেলের মতো চিৎকার করছে। এমন আর দেখিনি আমি।

ছেলের বাহুর উপর হাতখানি রেখে মা একটু হাসলো, কাঁদলোও একটু। তার গায়ের উপর ভর করে মা তার শীর্ণ পা দু'খানি দ্রুত চালিয়ে নিল। আত্মবিস্মৃত হলো সে।

দু'জনে বাড়ি ফিরে এলো। যেখানে নতুন মা শয্যায় শুয়ে আছে, সেই ঘরে গেল মা। খবর শুনে পাড়ার সব স্ত্রীলোক সেখানে ভিড় করেছে, এমনকি সেই বিধবাটিও এসেছে। সে সকলের চেয়ে বৃদ্ধা—সম্পূর্ণ কালা, দেহখানি বয়সের দ্বিগুণ বেঁকে গেছে। তবু তাকে আসতেই হবে! মাকে দেখে সে প্যাঁক্-প্যাঁক্ করে বলল, তুমি বড় ভাগ্যবতী, বৌ। আমি ভেবেছিলাম—তোমার সৌভাগ্যের শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু এই তো তোমার নাতি হোল, আর আমি—এমনি পোড়াকপাল আমার—নিজের এই কলঙ্কখানি ছাড়া আর কিছুই নেই!

কিন্তু বৃদ্ধা মা একটি কথাও বললোনা, তাকালোনা কারো পানে। ঘরে ঢুকে শয্যার কাছে গিয়ে নিচের দিকে দেখলো। শিশুটি শুয়ে ছিল সেখানে—একটি ছেলে—মুখ খুলে চিৎকার করছে, তার বাবা যেমন বলেছে ঠিক তেমনিভাবে। সুন্দর স্বাস্থ্যবান একটি শিশু। মা নিচু হয়ে তাকে তুললো,

দু'হাতে তুলে ধরে নতুন জীবনে উষ্ণ সবল শিশুটির স্পর্শ অনুভব করলো। তার আপাদমস্তক পরীক্ষা করে দেখলো, হাসলো, আবার দেখলো। অবশেষে ঘরের মধ্যে খুঁজতে লাগলো বড়-জাকে। সেখানেই ছিল সে। তার নাত-নাতনিরা তামাসা দেখছিল তাকে জড়িয়ে ধরে। সে যে মুখখানি খুঁজছিল সেটি খুঁজে পেয়ে শিশুটিকে তুলে ধরলো উপরের দিকে—ভুলে গেল ঘরের ভিতর রয়েছে আরও অনেকে। কেঁদে কেঁদে তার চোখ দুটো ফুলে উঠেছে। তবু হাসতে হাসতে উচ্চৈঃস্বরে মা বলল—দেখ্ বোন, দেখ্—নিজেকে যতটা পাপী ভেবেছিলাম, আমি তত পাপী নই,—দেখ্—এই দেখ্ আমার নাতি!

—শেষ—